যুগান্তের যবনিকা পারে

আশাপূর্ণা দেবী

বিমলারঞ্জন প্রকাশন
৮/১সি, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

শীতের স্থির গঙ্গা, ঈষৎ শীর্ণও, কিন্তু বড় নির্মল। ভর দুপুরের রোদ ওই নির্মল জলধারার মৃদু মৃদু তরঙ্গের উপর যেন আলোর ঝিলিক হানছে।

এই গঙ্গার উপর একখানি প্রাসাদতুল্য বাড়ি সগর্বে আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। গঙ্গাবক্ষের নৌকারোহীরা ওর দিকে তাকিয়ে একবার তারিফ না করে পারে না।

গঙ্গার দিকটি বাড়ির পিছন দিক। মা গঙ্গা যেন এদের খিড়কির পুকুর। আর এই গৃহের প্রতি তিনি যেন চিরপ্রসন্না। এদের তিন পুরুষ ধরে এই গৃহের কোল দিয়ে বহে চলেছেন, কিন্তু কোনোদিন উত্তাল হয়ে উঠে পাড় ভাঙেননি, ঘাটের সিঁড়ি খসিয়ে নিয়ে যাননি।

বাগান সংলগ্ন ঘাটের শ্বেতমর্মরনির্মিত সিঁড়িগুলি 'কাল'কে অস্বীকার করে গঙ্গাগর্ভ থেকে অনেক ধাপ উঠে বাড়ির চত্বরে গিয়ে পৌঁছেছে মজবুত বনেদের স্বাক্ষর বহন করে।

এ অঞ্চলে রায়চৌধুরীদের ঘাট স্থানীয়দের বিশেষ আকর্ষণীয় স্নানের ঘাট!

এখন সে ঘাট জনবিরল। স্নানার্থীদের কলকণ্ঠ শোনা যাচ্ছে না। সাদা ধবধবে সিঁড়িগুলি দুধে ধোওয়া রূপ নিয়ে স্থির হয়ে পড়ে আছে।

মাঝে মাঝে কোনো খেয়া নৌকার গতায়াতের আলোড়নে সিঁড়ির পায়ের কাছে মৃদু মৃদু ঢেউ গড়িয়ে আসছে।

এই ঘাটেই নৌকোটা এসে বাঁধলো।

এই সাবেকী গড়নের বিশাল বাড়িটির তিনতলায় ছাদের আলসের কার্নিশগুলো এত চওড়া যে বুক দিয়ে পড়ে মাথা ঝুঁকিয়ে চেষ্টা করলেও, নীচের ঘাটটা কিছু দেখা যায় না।

বার কয়েক সেই বৃথা চেষ্টা করে নবদুর্গা এখন দূরলক্ষ্যে গঙ্গার প্রবাহিত ধারার দিকে তাকিয়ে দেখছে। সকাল থেকে সকলের অলক্ষ্যে বার তিনেক ছাদে ঘুরে গেছে, আবার এখন ভরদুপুরে চলে এসেছে চুপি চুপি।

যদিও কালটা শীতকাল, তবুও এখন এ সময় রোদ পোহাতে ছাদে আসার অজুহাতটা হাস্যকর, তথাপি নবদুর্গা মনের মধ্যে ওই হাস্যকর অজুহাতটাই লালন করছে সকাল থেকে, ছাদে ওঠার কারণ দর্শাতে। নবদুর্গার মনে পড়ছে না গঙ্গাতীরবর্তী এই বাড়িখানার অন্য তিন পাশে মস্ত মস্ত খোলামেলা বাগান, আর বাড়িটার দোতলার চারিদিক জাফরি দালান আর বারান্দায় ঘেরা। রোদের জন্যে ছাদে উঠতে হয় শুধু আচারের পাথরের, আমসত্ত্বর কুলোর, আর বড়ির ডালার।

মানুষের সে দরকার হয় না।

কিন্তু নবদুর্গা যে ছাদে না উঠে থাকতে পারছে না। আজই তো শুক্কুরবার। শুক্কুরবারই যে মানুষটার আসবার কথা। অথচ কথাটা নিয়ে কারো সঙ্গে আলোচনা করাও চলছে না, কে জানে আর কারো কাছে বলে গেছেন; না শুধুই নবদুর্গার কাছে?

তাই যদি ঘটে থাকে, তাহলে সেটা প্রকাশ হয়ে যাওয়া যে বড় লজ্জার কথা। নবদুর্গা যে তাহলে কারো কাছে মুখ দেখাতে পারবে না। আবার পাঁচজনের সামনে বার বার দোতলায় গঙ্গার ধারের জাফরি দালানে গিয়ে দাঁড়ানোও মুশকিল। তাতেও তো সন্দেহের উদয় হতে পারে লোকের। মনে মনে বললো নবদুর্গা, কেন যে ছাই এই 'শুক্কুরবার' কথাটা বলে গেলেন! না বলে গেলে তো এমন শয্যেকণ্টকী অবস্থা হতো না আমার।....যাই, আবার নেমেই যাই।

মনে করেও আবার একটু ইতস্ততঃ করে গঙ্গার দিকে দূরলক্ষ্যে তাকাতেই চমকে উঠলো নবদুর্গা, একটা নৌকা আসছে না?....হ্যাঁ হ্যাঁ, আসছেই তো। এই দিকে এই বাড়ির দিকে।

বুকটা ধড়াস ধড়াস করে উঠলো তার। হঠাৎ দু'হাত জোড় করে

কপালে ঠেকালো, কে জানে কার উদ্দেশ্যে। হয়তো মা গঙ্গার, হয়তো বা গৃহ-বিগ্রহ বীরেশ্বর শিবের, হয়তো গ্রামদেবতা সর্বময়ী কালীর। অথবা হয়তো সব ক'জনের উদ্দেশ্যেই।

তারপর আস্তে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসে।...কোনোমতে একবার নেমে পড়ে পাঁচজনের সঙ্গে মিশে যেতে পারলেই নিশ্চিন্ত। বাইরের লোক তো আর বুকের ভিতরকার ধুকপুকুনিটা দেখতে পাবে না। তবু ধরা পড়ার ভয়ে নেমে এসেই একটা কাজে হাত লাগায়। যদিও এখন ভরতপুর এবং বাড়িতে কাজ করবার লোকের অভাবও নেই, অগুনতি লোক আছে কাজ করবার, তবু 'মানুষের সংসারে', মেয়েমানুষের কাজের আবার অভাব থাকে না কি ?...পানের বাটাটা নামিয়ে বিকেলের জন্যে পান-পাতাগুলোর বোঁটা ছিঁড়ে চিরে চিরে রাখলেও তো কাজ খানিকটা এগিয়ে থাকে। অবসর সময় তাই তো করে মেয়েমানুষ।

সেই কাজটাই নিয়ে বসলো তাড়াতাড়ি নবদুর্গা।

কিন্তু শুভঙ্করী ?

শুভঙ্করী কি ওই শুক্কুরবারের খবরটা জানতেন না ? না কি তিনি তাঁর স্বভাবগত আত্মস্থতায় উদ্বেল হৃদয়ভার আপনার মধ্যে সংহত রেখেছেন ?

ঘটনা যাই হোক, শুভঙ্করীকে তাঁর নিত্য পরিচিত ভূমিকাতেই দেখা যাচ্ছে। রান্নাবাড়ির এলাকাতেই ঘুরছিলেন তিনি তখন লোকজনের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা ঠিকমত আছে কিনা তার তদারকী করতে। এই কাজটি শুভঙ্করী নিজে না করে স্বস্তি পান না। জানেন রান্নাবাড়ির ভারপ্রাপ্ত যাঁরা, তাঁরা সবসময় সর্বজীবে সমভাব দেখান না। কিন্তু এটি যে তিনি বুঝতে পারেন, তা অবশ্য বুঝতে দেন না, যেন নিজেই এ সব না দেখে থাকতে পারেন না এমনভাবে ঘোরেন।

সহসা একজন দাসী ছুটে এসে খবর দিলো, 'মাগো, বাবুর নৌকো এলো—'

শুভঙ্করী তার মুখের দিকে একটু তাকিয়ে মৃদু হেসে বললেন, 'শুধু নৌকো এলো ?'

এই দাসীটা নতুন, শুভঙ্করীকে এখনো ভাল করে চেনে না, তাই বলে ওঠে, 'দুগ্‌গা দুগ্‌গা ! ই কি কথার ছিরি মা তোমার ? শুদু নৌকো আসবে কেন ? বাবু এয়েলেন।'

'তবু ভালো—'

বলে শুভঙ্করী হাসি চেপে ফিরে দাঁড়িয়ে রাঁধুনীকে বলেন, 'হয়ে যাবে বললে চলবে না বামুন মাসী, ডাল তোমায় আর এক বোগ্‌নো চড়াতেই হবে। বরং ভাজা কলাইয়ের ডাল চড়াও, শীগ্‌গির হয়ে যাবে।'

রাঁধুনী পরাণের ঠাকুমা ব্যাজার গলায় বলে, 'নিত্যিই তোমার ঘরে বাড়তি নোক বৌমা, হ্যানো দিন দেখলাম না যে দশ বিশটা বাড়তি লোক পাত পাড়ছে না। এমন উড়ুনচণ্ডে কাণ্ডয় কুবেরের ধন উড়ে যায়।'

শুভঙ্করী একটু হেসে বলেন, 'কুবেরের ধন-সম্পত্তির হিসেবটা বুঝি তোমায় কেউ দিয়ে গেছে মাসী ? তা আমার তো সেটা জানা নেই। আমি জানি এটা কুবেরের মায়ের ঘর-সংসার, আর তাঁর ইচ্ছেতেই মানুষের পাত পড়ে। লোকই লক্ষ্মী বামুন মাসী, লোক দেখে ব্যাজার হতে নেই।'

বামুন মাসী আরো বিরক্ত গলায় বলে, 'আমার আবার ব্যাজার হওয়া হয়ি ! তোমার ভাত তুমি ছড়াবে, তাতে কার কি। তবে অপ্‌চো নষ্ট দেখলে গা করকর করে, তাই বলা !'

'এই দেখো, মানুষ খেলে কি সেটা অপচো নষ্ট হলো মাসী ?'

'তবে আর কি, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের লোককে ডেকে এনে এনে খাওয়াও।' বলে বামুন মাসী বড় একটা পিতলের হাঁড়ি উনুনে চাপিয়ে কাঠ ঠেলে দিয়ে রান্নাঘরের দেয়ালের ধারের টানা লম্বা মেটে বেদির উপর যে সারি সারি মাটির জালা বসানো আছে তার একটার মুখের ঢাকা খুলে বাটি ডুবিয়ে ডুবিয়ে ডাল বার করে নিতে থাকে।

শুভঙ্করী একটু হাসেন, তারপর বলেন, 'তুমি বেচারি সকাল থেকে খাটছো, পদর বৌকে একটু ডাকিয়ে আনাও না মাসী ! সে খানিকটা লাগুক।'

বামুন মেয়ে এখন ঠিকরে ওঠে। 'আমার খাটুনির জন্যে আমি কিছু বলতে আসিনি বৌমা, গতর আমার সুখে থাক. ভগবানের ইচ্ছেয় এই বামনী এখনো পাহাড় ভাঙতে পারে। তোমার ভালর জন্যেই বলা।'

শুভঙ্করী ব্যস্ত গলায় বলেন,—'আহা, সে কি আর আমি না বুঝি ? তবে মানুষের ঘরেই তো মানুষ পাত পাড়তে আসে মাসী ! জীবজন্তুর ঘরে তো আর জীবজন্তুরা নেমন্তন্ন খেতে যায় না ? যাক্, মাছে যদি তোমার কম পড়ে, ওবেলার জন্যে যে ভাজা মাছ রেখেছো, রেঁধে ফেলো। ওবেলা আবার বিষ্টুকে খবর দিলেই হবে।'

'ভালো, ওই দুলেগুলোর জন্যে আবার মাছও চাই' বলে বামুন মেয়ে ডালের হাঁড়িতে খটখট করে কাঠি দিতে থাকে।

এটা রাগের প্রকাশ।

শুভঙ্করী মনে মনে হেসে বলেন, 'ডাল চড়াতে না চড়াতে কাঠি দিলে 'সীটে' হয়ে যাবে না গো মাসী ?'

বামুনমাসী আরো বীর বিক্রমে কাঠিতে পাক দিতে দিতে বলে, 'জন্ম গেলো ডালে কাঠি দিয়ে দিয়ে, এখন আর নতুন করে শেকার বয়েস নেই বৌমা ! সিটে হলে হবে। তোমার দুলে বাগদি কুটুম্বুদের দাঁতের গোড়া এমন অশক্ত নয় যে চিবুতে পারবে না।'

শুভঙ্করী বোঝেন, এতখানি বেলায় রান্না সারা হয়ে আসার সময় সময় আবার আট দশটা লোকের রান্না করতে হবে শুনে বামুন মেয়ের মেজাজ খাপ্পা হয়ে গেছে, কিন্তু উপায় কি ? লোকগুলো সেই চাতরা থেকে এসেছে, আর এসে পৌঁছেছে একেবারে ভরদুপুরে, এখন কি আর শুধু গুড় মুড়ি জলপানি ঠেকিয়ে বিদায় দেওয়া যায় ? অবিশ্যি এসেছে ওরা নিজেদের দরকারেই, কাজের চেষ্টায়। তাহলেও মানুষ বলে কথা।

শুভঙ্করী এখন বামুনমাসীর হৃদয়ের সূক্ষ্মতন্ত্রীতে ঘা দিয়ে মিহি সুর বার করবার চেষ্টায় বলেন, 'পরাণকে দেখছিনে কেন? পাঠশালা থেকে ফেরেনি?'

পাঠশালাটা হচ্ছে সকাল থেকে দুপুর অবধি, এতোক্ষণে আসার কথা।

শুভঙ্করীর মুখে পরাণের নাম শুনে পরাণের ঠাকুমা বোধকরি একটু নরম হয়, তবে কথা কয় ঠিকরে উঠেই। শুধু বিরূপতার পাত্র বদল হয়। বলে ওঠে, 'নাতি যে আমার তেমনি গুণের বৌমা, তাই পাঠশালা থেকে ফিরেই ঠাকুমার পায়ে পায়ে ফিরবে। দেখো গে যাও তোমার পেছন বাগানে কোথায় কোন্ গাছের ডালে হনুমানের মতন ঝুলছে।'

তারপর আবার বলে ওঠে, 'তা হরিমতি যে বলে গেল বাবুর নৌকো এয়েছে, তার কি হলো? এই সময়ই তোমার রাজ্যির লোকের খোঁজ নেওয়ার দরকার পড়লো?'

শুভঙ্করী মৃদু হেসে বলেন, 'নৌকো যখন এসেছে, তখন নৌকোর মানুষরা ঠিকই নেমেছে, বাড়িও ঢুকেছে।'

'ঢুকেছে বলেই নিচ্চিন্দি?'

বামুন মেয়ে বিরক্তির গলায় বলে, 'মানুষটা ক'দিন পরে ঘরে এলো, এগুয়ে গে দেকতে হবে না, সে আচে কেমন, তার কী নাগবে না নাগবে।'

শুভঙ্করী বলেন, 'সে কি আর আমাদের কাউকে দেখতে হয় বামুন-মাসী? ওনার ভজাই তো সব দেখে।'

বামুনমাসী প্রায় শাসনের ভঙ্গিতে বলে, 'দেখে বলেই গা ছেড়ে বসে থাকতে হবে বৌমা? নিজের কোর্তোব্য নেই? কিছু না হোক, এতোদিন পরে ঘরে ফিরে মানুষের পরিবারের মুখটাও তো দেখতে ইচ্ছে করে? ভজা থাকলেই হল?'

শুভঙ্করীর সঙ্গে কথাবার্তায় এই বামুনমাসীর ভঙ্গিটা ঠিক শাশুড়ী-

ননদের মত। শাসনবাক্য, হিতবাক্য, পরামর্শবাণী, সদুপদেশ কিছুরই অভাব নেই। অন্য সবাই এর জন্যে শুভঙ্করীকে আড়ালে সমালোচনা করতে ছাড়ে না। মাইনে করা লোকের এত দুঃসাহস!

সমালোচনা যারা করে তাদের মধ্যে শুধুই যে মাইনে করার দলই আছে তাও তো নয়, শাশুড়ী-ননদ জাতীয়ারাও তো রয়েছেন। হয়তো দূর সম্পর্কের, হয়তো ডালে-পালায়, তবু আত্মীয় তো? 'গুরুজন'ও বটে।....তাঁরা গালে হাত দিয়ে বলেন, 'বলিহারী মাগীর বুকের পাটা? আমাদের তো সামনে দাঁড়ালেই বাক্যি হরে যায়।'

অবশ্য এ কথাটা ঠিক সত্যি নয়। বাক্যি তাঁদের হরে যায় না, বাক্যি উপছেই পড়ে, কিন্তু সে শুধু তোয়াজি বাক্য। খোসামোদের প্রতিযোগিতা চালান তাঁরা। যেটা নাকি শুভঙ্করীর হাড়ের বিষ। তা সে বোধ তাঁদের থাকলে তো? ওঁরা জানেন অন্নদাতা-আশ্রয়দাতা, এঁদের নৈবেদ্য সাজাতে হয় তোষামোদের সম্ভারে।

না হলে বিবেককে বুঝ দেবেন কী করে? যা পাচ্ছেন, তার পরিবর্তে কিছু দেবার তো নেই তাঁদের।....হাত পা কোলে নিয়ে বসে অবিশ্যি থাকেন না তাঁরা, গেরস্তর সংসারে কাজ কিছু না কিছু জুটিয়ে ফেলা যায়ই, কিন্তু সেটা যে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর, সেও তো নিজেদের চোখ এড়ায় না। মাইনে করা লোকও তো ঘুরছে এক কুড়ি। এঁরা যা করেন, সেটা শুধু নিরামিষ হেঁসেলকে কেন্দ্র করে। যেটা একান্তই তাঁদের নিজস্ব। দু-একজন অবশ্য ঠাকুরঘরের দিকটা দেখেন।

বাড়ি সংলগ্ন ঠাকুর বাড়িতে গৃহদেবতা বীরেশ্বর শিব তো আছেনই, তাঁর সঙ্গে সাঙ্গোপাঙ্গোরও অভাব নেই। বলা যায় শৈব শাক্ত বৈষ্ণবের এক মিলনক্ষেত্র এটি। যিনি যখন এসে জুটেছেন। অতএব এ একটা বিশেষ কর্মক্ষেত্র। তবু ঠাকুরদালান মুছতেও ঝি আছে, আছে পুজোর বাসন মাজতে। একটি বালক ব্রাহ্মণ-সন্তান আছে, সে আরতির গোছ করে রাখে, মূল ঠাকুরঘরটি পরিষ্কার করে, ফুল তোলে, কাঁসর বাজায়।

এতগুলো লোকজন রাখা যে শুভঙ্করীরই দুর্মতি এ কথাও তাঁরা আড়ালে বলে থাকেন এবং এত বাড়াবাড়িতে যে রাজার রাজত্বও ক্ষয় হয় এ মন্তব্য করেন।

কিন্তু এতগুলো লোকজন পোষাটা কি সত্যিই শুভঙ্করীর বাড়াবাড়ি বিলাসিতা মাত্র? স্বামীর পয়সার অহংকার?

পোষা শব্দটার কি অন্য অর্থ নেই? সেই অর্থেই তো পোষ্য একে একে বেড়েই চলেছে। কোন্ সংসারে আবার 'বড়ি দিউনী' 'আচার বরুনী' থাকে মাইনে করা বাড়িতে এতগুলো মেয়েমানুষ থাকতে? তারা কখনো কেউ বলেছে, 'আমরা ও সব পারব না।'

না, তা কেউ বলেনি সত্যি, কিন্তু সামান্যতমও আত্মীয়তার দাবি যাদের নেই, তাদের পোষণ করবার যুক্তি কোথায়? একটা উপলক্ষ্য তো আবিষ্কার করতেই হবে। শুধু শুধু মাসোহারা দিয়ে মর্যাদাহানি করবেন কেন মানুষের?

তা এ সব নিগূঢ় তত্ত্ব তো কাউকে বোঝাতে বসেন না শুভঙ্করী। তাই ওঁর ব্যবহারের মধ্যে অহঙ্কারের গন্ধ পান এঁরা, পান অমিতব্যয়িতার বদভ্যাসের অভ্যাস, যাঁরা এ দেয়ালে ও দেয়ালে ফিসফিসিয়ে সমালোচনা করতে বসেন।

কিন্তু 'পরানের ঠাকুমা' বা বামুনমাসী এঁদের দলে নেই। তার বুকের পাটা প্রবল। সে অনায়াসে মনিব গিন্নীকে কর্তব্য শেখাতে আসে। অবলীলায় বলে ওঠে, 'ভজা আছে বলে নিচ্চিন্দি? ক'দিন পরে ঘরে এলো মানুষটা, পরিবারের মুখটাও তো দেখতে ইচ্ছে করে?'

অথচ লোকটা অধিক পুরনোও নয়।

ছেলের বৌটা হঠাৎ মরে গিয়ে জোয়ান ছেলেটা গেল বিগড়ে, 'যজমান ঘর' ছেড়ে দিয়ে গেল রিষড়ের চটকলে কাজ করতে। সেখানে নেশা ভাঙ শিখে, রোজগারের পয়সা উড়িয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দেয়। পরাণ নামের যে একটা ছেলে আছে তার, অতএব তার দায়িত্বও আছে, সে কথা গায়েই মাখে না। তদবধি পরাণের ঠাকুমা এ বাড়ির হেঁসেলে

এসে ঢুকেছে। রান্নায় তার বরাবরের সুনাম। গতরও আছে। পাড়ায় যজ্ঞি লাগলে অথবা বড় মাপে ঠাকুরের ভোগ দিতে হলে বামুন-গিন্নীর ডাক পড়তো। গরিব সে বরাবরই। এ সব বাবদ টাকাটা সিকেটা, অথবা একজোড়া থান কি বড় করে একটা 'সিধে' জুটতো বলে মহোৎসাহেই সে ডাকে সাড়া দিতো। কিন্তু 'মাঝে মাঝে'র আয়ে বারো মাস চলে না। পরাণও ক্রমশঃ ডাগর হচ্ছে অর্থাৎ 'ভাল মত খাইয়ে' হয়ে উঠছে। কাজেই ক্রমশঃ পরাণের ঠাকুমা নামটা কায়েম হবে, পরাণের ঠাকুমার এই দাস্যবৃত্তি।...তবে বৃত্তিটা যে তার দাসত্বের, সে কথা মোটেই মানতে চায় না। বুড়ি ওই বেহিসেবী শুভঙ্করীকে শাসন করে।

প্রশ্রয় আছে বৈকি।

নচেৎ ওর প্রশ্নে 'ছোটমুখে বড়কথা' বলে রেগে না উঠে কিনা শুভঙ্করী হেসে ফেলে বলেন, 'তা, সে ইচ্ছে পূরণেরই বা অভাব কী?'

হাতের হাতাখানা ঠক করে মাটিতে ফেলে তীব্র গলায় বলে ওঠে, 'তাই ভাল। সেখানেই সাধ বাসনা সব মিটুক, তুমি বসে কপাল ঠোকো। নিজের হাতে খাল কেটে কুমীর এনেচো য্যাখন, ত্যাখন আর বলবার কী আচে?'

শুভঙ্করী এখন একটু গম্ভীর হন, তবে হাসেনও। গম্ভীর হাসি হেসে বলেন, 'কপাল ঠুকতে যাবো কী দুঃখে বামুনমাসী, কপাল কী এত সস্তা?'

'জানি নে মা' বলে বামুনগিন্নী একখানা মস্ত বড় ভিজে গামছা দিয়ে উনুনে বসানো পেতলের হাণ্ডাটা নামিয়ে উনুনের কাঠ টেনে আঁচ কমিয়ে দেয়।

কিন্তু উনুন বোধকরি আজ নিভতে নারাজ, তাই আবার এক ঢেউ এসে আছড়ে পড়ে।

ঠিক এই সময় একজন ছুটে এসে বলে, 'বাবুর নৌকোর মাঝিরা পাঁচ ছ'জন খাবে, বাবু বলে পাঠালো।'

শুভঙ্করী মনে মনে একটু হাসলেন। এই বলে পাঠানোটা যে ছলমাত্র, তা আর তাঁর বুঝতে বাকী থাকে না। তবু উদ্বেল হন না, আত্মস্থভাবেই বলেন, 'ওই শুনলে তো বামুন মাসী! আমি পদর বৌকে কি যোগীনের মাকে ডেকে পাঠাচ্ছি, তারা কেউ এসে এবার হেঁসেল সামলাক। তোমার তো মানুষের শরীর। কত পারবে?'

হঠাৎ চোখে জল এসে যায় বামুনগিন্নীর। তারও যে মানুষের শরীর, এই কথাটা এই একটা মানুষ ছাড়া জগতে আর কেউ বলে না। তবে চোখের জলকে সে পড়তে দেয় না। এই মাত্তর ঘরের মানুষ ঘরে এলো, এখন এ সব কেন? অলক্ষণ হবে না। কষ্টে সামলে বলে, 'ও সব ব্যালায় আর কাজ নেই বৌমা! আমি না পেরে উঠি, নিজেই কাউকে ডেকে নেবো। তুমি যাও তো—ভজা বলে ছেড়ে না দিয়ে তোমার কোত্যব্য তুমি করোগে। এতই য্যাখন পারছি, বাকী পাঁচ-সাতটার জন্যেও পারবো।'

শুভঙ্করী এখন যেন অগত্যাই রান্নাবাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন।

কিন্তু বেরিয়ে এসেই কি দোতলায় উঠে যান? তা যাওয়া যায় না। বিদেশ প্রত্যাগত 'স্বামী সন্দর্শনে যাচ্ছি' ভাবলেই নবোঢ়ার লজ্জা এসে চেপে ধরে। অথবা হয়তো নবোঢ়ার বেশীই। বয়সের মর্যাদা আর এক ধরনের লজ্জা এনে দেয়।

গৃহিণী শুভঙ্করীর মধ্যে সেই লজ্জার বাধা। দাস-দাসী গুরুজন পরিজন, পরিজনের মধ্যে কমবয়সী মেয়ে বৌয়েরও অভাব নেই! এদের সামনে দিয়ে যাওয়া তো। কারুর চোখে যেন ধরা না পড়ে যায়, শুভঙ্করী নামের ওই স্থির আত্মস্থ গৃহিণী নারীটির মধ্যেও চাঞ্চল্যের ঢেউ।

অতএব অকারণেই নীচের তলার এদিক ওদিক ঘোরেন, খিড়কির দরজায় দাঁড়িয়ে গঙ্গার ঘাটটা দেখেন, একজন দাসীকে জিগ্যেস করেন মাঝিদের জলপানি দেওয়া হয়েছে কিনা····তারপর আস্তে আস্তে সিঁড়িতে পা রেখে রেখে দোতলায় উঠে আসেন।

সময়টা এমনিতেই একটু ঝিমঝিমে হবার কথা, ছোট ছেলেদের নাওয়া-খাওয়ার পাট চুকেছে, কমবয়সী ঝি বৌদেরও এ বাড়িতে বেআন্দাজী বেলা করার পাট নেই। গিন্নীরা নিরামিষ হেঁসেলের মধ্যে নিমজ্জিত। তা ছাড়াও বাড়ির কর্তার আবির্ভাব সংবাদে সংসার আরো নিথর মূর্তি ধারণ করেছে, কারণ ছুটোছুটি, হাঁক-ডাক, উচ্চস্বরে কথা, এ সব সোমনাথ পছন্দ করেন না। তাঁকে নিয়ে ব্যস্ততা তো আদৌ নয়।

তাঁর প্রকৃতিতেই মৃদুতা।

তাই বাড়ির ঘাটে নৌকো ভিড়িয়েও ডাক হাঁক করলেন না সোমনাথ, শান্ত গম্ভীর ভাবে মাঝিদের নির্দেশ দিয়ে ধীর পায়ে নেমে এলেন নৌকো থেকে।···কর্তার মৃদুতায় মাঝিরাও মৃদুবাক্, নচেৎ অন্যত্র ঘাটে নৌকো ভিড়োবার সময় মাঝিদের উচ্চরোল তো ভিন্‌পাড়া থেকে শোনা যায়।

নামবার আগে পায়ের জুতো খুলে নৌকোর পাটাতনের উপর ফেলে রেখে সোমনাথ নীচু হয়ে গঙ্গা থেকে একটু জল অঞ্জলীতে নিয়ে মাথায় ছিটিয়ে দুধশাদা মার্বেল পাথরের সিঁড়িতে রক্তাভ শাদা নিটোল সুগঠন পা ফেলে ফেলে উঠে এলেন চত্বরে।

মাথায় গঙ্গাস্পর্শ করবার সময় তিন আঙুলের তিনটি আঙটিতে রোদের ঝিলিক লেগে যেন বিদ্যুৎ হানলো। তাঁর দীর্ঘোন্নত সুগৌর সুকান্তি মূর্তির দিকে তাকিয়ে মাঝিগুলো যেন তদ্‌গত হলো। এ অঞ্চলে দেবনাথ রায়চৌধুরীর নাতি, ভবনাথ রায়চৌধুরীর ছেলে সোমনাথ রায়চৌধুরীর মত সুপুরুষ বর্তমানে আর আছে কিনা সন্দেহ। একদা ছিলেন, স্বয়ং দেবনাথই ছিলেন, যাঁর কান্তি দেখেই নামকরণ হয়েছিল।···ভবনাথ তেমনটি ছিলেন না। পৌত্র সোমনাথ পিতামহের রূপ পেয়েছে।

ভারপ্রাপ্ত ভৃত্য ভজা প্রভুর স্নান ইত্যাদির প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সমেত ব্যাগটা হাতে নিয়ে প্রভুর ধীর গতির সঙ্গে পা মিলিয়ে পিছু পিছু উঠে যায়। নীচের তলায় যে ঘরটি সোমনাথের কিছুটা ব্যবহারের

জন্য নির্দিষ্ট থাকে, সেইখানে নামিয়ে রেখে গরুড় অবতারের মত দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে।

সোমনাথ এ ঘরের খাটের উপর বসে ওর দিকে চেয়ে বলেন, 'প্রাতঃ স্নানটা তো যথারীতিই করেছিলাম, তবু লোভ হচ্ছিল আর একবার মা গঙ্গার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ি, কিন্তু থাক, দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, বিলম্ব হয়ে যাবে। নেমে পড়লে তো আর সহজে উঠতে ইচ্ছে করবে না। তুই আমার ধুতি মেরজাই বার করে রেখে স্নান করে নিগে যা। আমি শুধু হাত মুখ প্রক্ষালন করে প্রস্তুত হয়ে নিই।'

হাত মুখ প্রক্ষালনও অবশ্য গঙ্গাতেই। এটি সোমনাথের বরাবরের অভ্যাস। বাড়ির মধ্যে তোলা জলে কিছু করায় ওঁর তৃপ্তি হয় না।.... এই সময় একজন চাকরকে ডেকে বলেন, 'ভিতরে বলে আয়, মাঝিরা বোধহয় পাঁচ ছয় জন হবে।'

এইটুকুই নির্দেশ, ওতেই বোঝানো হলো ওরা খাবে। এর থেকে বেশী বলাটা গ্রাম্যতা।

কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল দোতলায় প্রকাণ্ড চওড়া দালানে উঠে এসেছেন সোমনাথ, আর ছোট বড় মাঝারি ঘোমটা না ঘোমটা, কুচোকাচা ইত্যাদির একটি বিরাট বাহিনীর পদধূলি গ্রহণের ঠ্যালা সামলাচ্ছেন।

কদিন মাত্র পরে এসেছেন, আঙুল গুনলে ন' দিন। তবু যেতে আসতে প্রণামের ঠ্যালা সোমনাথকে সামলাতেই হচ্ছে। মৃদু গম্ভীর কণ্ঠে 'থাক থাক' বলে যতই পিছিয়ে যান, কেউ এ অধিকার ছাড়তে রাজী নয়।

সোমনাথ যে এদের সবাইকে ঠিক মত চিনতেই পারছেন তা বলা যাবে না, বিশেষ করে ঘোমটা দেওয়াদের। তারা অবশ্য পা ছুঁয়ে পদধূলি নিচ্ছে না, মাটিতে মাথা ঠেকিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে তাদের, কারণ সোমনাথ তাদের কারো মামাশ্বশুর, কারো দূর সম্পর্কের ভাসুর অথবা খুড়শ্বশুর।

নেহাৎ কুচোকাচাদেরও চেনা শক্ত। তারা হামা টানতে টানতে কবে কখন যে দাঁড়িয়ে ওঠে, আর কবে কখন যে সেই দাঁড়ানোর সূত্রে পৃথিবীর মাটিতে দাঁড়িয়ে পড়ে, বোঝা শক্ত।

এই চওড়া দালানের দু'ধারে সারি সারি ঘর, এই সব ঘরেই এই সব আত্মীয় অনাত্মীয় আশ্রিত অভ্যাগতদের আস্তানা।

এ দালান পার হয়ে একটা বাঁক নিয়ে অন্য আর একটি অপেক্ষাকৃত সরু দালানে গিয়ে পড়ে, আর একবার বাঁক নিলে তবে গৃহকর্তার খাশমহল।

গঙ্গামুখী চওড়া বারান্দার গা ঘেঁষে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড খান তিনেক ঘর সোমনাথের নিজের ব্যবহারের।....সেই নিজের মহলটির ওধারে আলাদা একটি সিঁড়ি আছে মহলের মালিকের নিজস্ব ব্যবহারের জন্য। তাতে এদিকের ওই বিরাট দালানখানা পার হবার পরিশ্রমটা বাঁচে, কিন্তু বাড়ি ছেড়ে বাইরে ঘুরে এলে সোমনাথ ইচ্ছে করেই বড় সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসেন। হয়তো গৃহকর্তার অনুপস্থিতিতে বাড়ির অবস্থার কোনো তারতম্য হয় কিনা তা পর্যবেক্ষণ করার ইচ্ছেয়, হয়তো বা এমনিই বাড়ির সবটা দেখতে ইচ্ছেয় কে জানে। খুব সম্ভব শেষেরটাই।

অবশ্য শুভঙ্করীর প্রখর দৃষ্টির সামনে অবস্থার তারতম্য হবার কথা নয়।

প্রথমেই পালা চুকতে সোমনাথ নিজের মহলে এসে প্রবেশ করলেন।....

প্রথম ঘরখানার অনেকটা বৈঠকখানার চেহারা। ঘরের মাঝখানে প্রায় ঘরজোড়া সাদা ধবধবে চাদর পাতা ফরাস, তার উপর লাল শালুমোড়া অনেকগুলি ছোট ছোট হৃষ্টপুষ্ট তাকিয়া, চারিদিকে সাজানো। দেয়ালের ধারে ধারে টানা লম্বা বেঞ্চ, তাদের উপর মাফিকসই মাপের এক ধরনের মিহি কাঠির মাদুর বিছানো।....

দেয়ালে দেয়ালে জোড়া জোড়া বড় বড় অয়েলপেন্টিং ঝোলানো। না, নিসর্গ চিত্র-টিত্র নয়, সবই পূর্বপুরুষদের প্রতিকৃতি। দুজন মহিলার ছবিও দেখা যাচ্ছে। একজনের ভারী জরির কাজকরা বেনারসী শাড়ি পরা চেহারা, সর্বাঙ্গে ভারী ভারী অলঙ্কার, নাকে নথ, মাথায় আধ ঘোমটা এবং গায়ে থ্রি-কোয়ার্টার হাতা জ্যাকেট। জ্যাকেটের উপর গাঢ় বেগুনী রংটা বুঝিয়ে দিচ্ছে জিনিসটা দামী মখমলে তৈরী। হাত দুটি কোলে জড় করা।

অপর জনের গায়ে জামার বালাই নেই বলেই মনে হয়, তবে তার জন্যে লজ্জা পাবারও কিছু নেই, সর্বাঙ্গ মোড়া আছে সিল্কের নামাবলীতে। হাতে হরিনামের ঝোলা, পরনে গরদের থান, চুল ছোট করে ছাঁটা।

এঁরা হচ্ছেন সোমনাথের মা আর ঠাকুমা। বাকী সবই সোমনাথের বাবার জ্যাঠামশাইয়েব ঠাকুর্দার, এবং কোনো কোনো অকালমৃত বালকের। যাদের পরনে মখমলের লংকোট আর পায়জামা, তাদের বর্ডারে জরির কল্কাদার কাজ, মাথায় মুসলমানী ধরনের জরির কাজের টুপি, পায়ে নাগরা।

এই সব ছবি বাড়ির এদিকে ওদিকে ছড়ানো ছিটানো ছিল, সোমনাথই তাদের সাফ সুতরো করে নিজের এই বসবার ঘরের দেওয়ালে টাঙিয়েছেন।

এ ঘর থেকে ভিতরে ঢুকে গেলে শয়নঘর। বনেদী ঘরে যেমনটি দেখা যায় ঠিক তেমনটিই সাজসজ্জা। চওড়া নকশাদার বাজু সম্বলিত উঁচু পালঙ্ক, পালঙ্কে ওঠার জন্য চৌকো গড়নের মার্বেল পাথরের ছোট ভারী চৌকি। পালঙ্কের সামনাসামনি মেজেয় ঈষৎ বিবর্ণ হয়ে যাওয়া খানিকটা পর্য্যন্ত গালচে পাতা, দেয়ালের ধারে প্রকাণ্ড দাঁড়ানো আর্শি, খাটের বাজুর মতই কারুকার্য শোভিত দেরাজ আলমারি। তার সামনের কার্নিশে নানাবিধ পুতুল সাজানো। এদিকের দেয়ালে একখানি মাঝারি মাপের গোলটেবিল, তার উপর কুরুশ কাঠিতে

বোনা সাদা লেশের ঢাকনি।

আর্শির উপরও ওই একই রকমের লেশের পর্দা। দরজা জানলায় পর্দার ভঙ্গিতে দু'ধারে বাঁধন দিয়ে ঝোলানো। তবে জানলা দরজায় পর্দা নেই। খোলা বারান্দা পথে গঙ্গার খোলা হাওয়া ঘরের মধ্যে দৌরাত্মি করে বেড়াচ্ছে দুরন্ত ছেলের মত। তার দৌরাত্মিতে পালঙ্কে পাতা বিছানার চাদরের কোণ উড়ছে, উড়ছে বালিশের ওয়াড়ের ঝালর। পালঙ্কের ছত্রিতে গুটিয়ে তুলে রাখা মশারিকেও কাঁপিয়ে ছাড়ছে সে।

ঘরে কেউ নেই।

যেন বিরাট একটা শূন্যতার প্রতীক হিসেবে নিজেকে নিয়ে বসে আছে সে।

পায়ে পরা হরিণের চামড়ার চটি জোড়াটা ঘরের বাইরে দরজার কাছে পাপোষের উপর ছেড়ে রেখে ঘরে ঢুকলেন সোমনাথ। চারিদিকে তাকালেন একবার। টেবিলটার উপর কী রয়েছে দেখলেন।

নতুন কিছু না, সোমনাথেরই সদা ব্যবহৃত খান-কয়েক বই, দোয়াত কলম, পানের ডিবে, মসলার রেকাবি। বড় পরিচিত, বড় পুরনো দৃশ্য।....আর্শির সামনে এসে দাঁড়ালেন একবার।....সেও যেন নিতান্ত পরিচিত।

সোমনাথের বাইশ বছর বয়েসেও এই বৃহৎ আর্শিটিতে যেমন চেহারার ছাপ পড়তো, এখন এই বেয়াল্লিশ বছর বয়েসেও সেই একই ছাপ। বয়েসে ভাঁটা পড়ে এলেও রূপে ভাটা পড়ে নি। শুধু আপাততঃ এখন কিঞ্চিৎ ঘরোয়া ভাব। কলকাতায় যাত্রাকালে যখন এই আর্শির সামনে দাঁড়িয়ে দেখেছিলেন তখন সাজসজ্জা ছিল ফুলবাবুর মত।....মাটিতে কোঁচা লুটনো চুনট করা মিহি চন্দ্রকোণার ধুতি, গায়ে তেমনি মিহি চিকনের কাজ করা ডাইনে বোতাম আদ্দির চুড়িদার, তার উপর গিলে কোঁচানো ফরাসডাঙার উড়ুনি।....ঘন কালো কেশ সুবিন্যস্ত, পায়ে বার্ণিশ করা পম্পসু।

এখনও যদিও ধুতি চুনট করাই, কিন্তু অমন মাটিতে লুটনো নয়,

আর গায়ে শুধু মেরজাই।....হাত মুখ ধোবার সময় গঙ্গায় ডোবানো ভিজে হাত চুলের ফাঁকে ফাঁকে দিয়ে মাথাকে ঈষৎ ভেজানোর জন্যে চুল কিছুটা অবিন্যস্ত।

আর্শির সামনে থেকে সরে এলেন সোমনাথ, তৃতীয় ঘরটার দরজায় এসে দাঁড়ালেন। এ ঘরও একই রকমের শার্সি খড়খড়ি দেওয়া জানলাদার মস্ত ঘর, তবে সাজসজ্জায় কিছু ঘাটতি আছে। দেরাজ আলমারি আলনা আর্শি বাক্স প্যাটরায় রীতিমত ভারাক্রান্ত।....খুব সম্ভব এটি মালিক মালিকানীর সাজঘর।

এ ঘরও মানুষবর্জিত।

সোমনাথের মুখে মৃদু একটু হাসি ফুটে উঠলো, সোমনাথ এখন এসে বিছানায় উঠে বসলেন। গড়গড়া খাওয়ার অভ্যাস নেই সোমনাথের। তাই একা থাকার সময়টা বেশী একাকীত্ব বোধ করেন।

বেশীক্ষণ অবশ্য একা থাকতে হলো না, পাশের দিকের একটা ভেজানো দরজা ঠেলে বেশ কিছুটা ঘোমটা টেনে নবদুর্গা ঘরে ঢুকলো, হাতে সরপোষ ঢাকা পাথরের গ্লাসে বেলের সরবৎ। বোঝা গেল সেই নিজস্ব সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসেছে। সোমনাথ গ্লাসটা হাতে নেবার আগে হেসে বললেন, 'তবু ভাল যে মনে পড়েছে লোকটার তেষ্টা পেতে পারে!'

যদিও স্বভাবগত ভাবে গলার স্বর গম্ভীর, তবে সুরে সরসতার আমেজ, চোখের তারায় কৌতুকের ঝিলিক।....'তেষ্টা' শব্দটি এমন সুরের মোড়কে ধরে দিলেন যে তার মধ্যে যেন অন্য আর একটি অর্থ নিহিত।

নবদুর্গা শুধু একটু অস্ফুটে 'বাঃ আমি বুঝি—' বলে গ্লাসটা এগিয়ে ধরলো।

সোমনাথ তেমনি হেসে বললেন, 'শরবৎটা কে দিচ্ছে, সেটা না জেনে খাই কী করে? দেখতে হবে তো মানুষটা কে?

নবদুর্গা হেসে ফেলে ঘোমটাটা একটু ছোট করে বলে, 'আহা! কে না কে বুঝি শরবৎ দিতে আসবে?'

'আসতেও পারে। পাড়ার লোকের কারো প্রাণে মায়া মমতার উদয় হতে পারে।'

'পাড়ার লোক? ভারী সাধ্যি!' বলে হেসে ফেলে নবদুর্গা।....এবার ঘোমটার অনেকখানিটাই নেমে যায়, ফোটা ফুলের মত একখানি মুখ যেন পাতার আড়াল থেকে প্রকাশ হয়ে পড়ে দর্শককে আচমকা চমকে দিয়ে।....ফুলের মতই কোমল লাবণ্যময় উজ্জ্বল, তবে গোলাপ বা পদ্মের সঙ্গে তুলনা করা যায় না, রঙে ঘাটতি আছে। রং ঈষৎ শ্যামলা। কিন্তু মুখশ্রী অতুলনীয়, চোখের বাহার দেখবার মত।

তবু নবদুর্গা ওই দীর্ঘোন্নত দেহ রূপবান পুরুষের কাছে নিজেকে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর মনে করে। নবদুর্গার ব্যবহারে সেই কুণ্ঠা। স্পষ্ট সহজ ভাবে যেন তাকাতে পারে না ওই মানুষটার দিকে। কথা বলে সাবধানে 'তুমি' 'আপনি' প্রশ্ন বাঁচিয়ে।

'তুমি' বলতে [illegible] মধ্যে থেকে আসে না, আর 'আপনি' বললে ও পক্ষ থেকে আসে বাধা। তবে পরোক্ষে 'আপনি'ই বলে।

সোমনাথ [illegible] হাত [illegible] যেনো ঈষৎ কাছে টেনে নিয়ে বলেন, '[illegible] এলাম।'

নবদুর্গা বলে, '[illegible] শুনলাম।—'

'তুমি বললে, আমি [illegible]।'

নবদুর্গা সকৌতুকে দুই চোখ তুলে তাকায়, কথা বলে না।

সোমনাথ বলেন, 'আর দুটো দিন থেকে এলে অবশ্য কাজ মিটিয়েই আসা হতো। যাক পরে হবে। আসা যাওয়া তো আছেই।'

নবদুর্গা তার সেই দেখবার মত চোখ দুটি এখন নামিয়েই রেখে কুণ্ঠিত গলায় বলে, 'মিছামিছি আমার জন্যে কাজ বাকী রেখে—'

সোমনাথ মৃদু হেসে বলেন, 'তোমার জন্যে কেন, আমারই জন্যে। মিছেমিছি নয়, সত্যি সত্যি। তোমার আর থাকতে মন লাগলো না।'

'মন লাগল না!'

মন লাগল না।

কার জন্যে এই মন না লাগা? তুচ্ছাতিতুচ্ছ এই নবদুর্গার জন্যে? ভাবতে গেলে বিশ্বাস হয় না। নবদুর্গা যেন মনে মনে একবার কেঁপে উঠলো।

নবদুর্গা আস্তে বললো, 'শরবৎটা হাতেই ধরা থাকবে?'

সোমনাথ এখন গ্লাসে চুমুক দিয়ে আস্তে 'আঃ' শব্দ করে বলেন, 'এ সময় পাকা বেল পেলে কোথায়?'

নবদুর্গা মাথা নেড়ে বলে, 'জানি না।'....

সত্যিই জানে না বেচারা। এ সময় যে পাকা বেল দুর্লভ, তাই জানে কিনা সন্দেহ।

'শরবৎ তৈরি করে আনলে, আর জিনিসটা কোথাকার জানলে না?' বললেন সোমনাথ।

নবদুর্গা নতমুখে বলে, 'আমি তো তৈরি করিনি, দিদি আমার হাতে পাঠিয়ে দিলেন।'

সোমনাথের মুখের উপর দিয়ে সহসা যেন একটা মেঘ ভেসে গেল। সোমনাথের চোখের তারায় বিষণ্ণতা।....কিন্তু তখনি সেটুকু সামলে নিয়ে মৃদু গম্ভীর হেসে বলেন, 'তোমার দিদিটি বেশ 'চালাক মেয়ে'। সবই বকলমে সারতে চান।'

নবদুর্গা অপ্রতিভ হলো।

কেন হলো, তা সে নিজেও জানে না। কারণে অকারণে অপ্রতিভ হওয়াই তার স্বভাব। যেন এ সংসারে তার যথার্থ কোনো ন্যায্য পাওনা নেই, যা কিছু পায়, কারো করুণায়।

সোমনাথ এটা বোঝেন বৈকি। সোমনাথ বেদনাবোধ করেন। সোমনাথ সেই অদৃশ্য করুণাময়ীকে করুণাময়ী না বলে বলেন চালাক মেয়ে। সোমনাথ ওই অপ্রতিভ মুখটার দিকে তাকিয়ে সহৃদয় গলায় বলেন, 'এভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে কতক্ষণ? উঠে বোসো।' বলে বাঁ হাতটা বাড়িয়ে তাকে ঈষৎ টেনে আনেন।

পালঙ্কটা উঁচু, সহজে বসে পড়া যায় না। উঠে বসবার জন্যে নীচে

পাতা আছে যে শ্বেত পাথরে মোড়া ছোট জলচৌকিটা নবদুর্গা একবার সেটার দিকে তাকিয়ে অস্ফুট গলায় বলে, 'দাঁড়িয়ে থাকলেই বা।'

সোমনাথের গম্ভীর গড়নের মুখে একটু হাসির বিদ্যুৎ খেলে যায়। নবদুর্গার পিঠে আস্তে একটা হাত রেখে বলেন, 'এরকম ভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে 'পরস্ত্রী পরস্ত্রী' লাগে।'

নবদুর্গা লজ্জায় লাল হয়ে বলে, 'যাঃ।'

'যাঃ কেন, সত্যিই। এসো, উঠে বোসো।'

অগত্যাই নবদুর্গাকে পালঙ্কে উঠে বসতে হয়। অবশ্য সেই চৌকির সাহায্যে। শ্বেত পাথরের চৌকির উপর আলতা পরা সুগঠিত পা দু'খানি যেন লক্ষ্মীর চরণের মত লাগে।

বসে পড়ে যেন ভয়ঙ্কর একটা কাজ করে ফেলেছে এইভাবে দীর্ঘ একটি নিশ্বাস ফেলে।

সোমনাথ চকিত হলো।

দীর্ঘশ্বাস!

এই মাটির প্রতিমার মধ্যেও কি তাহলে কিছু অনুভূতির খেলা আছে? এযাবৎকাল দেখে আসছেন, ওই 'মাটির প্রতিমা' ছাড়া তো আর কিছু মনে হয় না।....তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর আনত মুখের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'কী হল?'

'কই? কী হবে?'

'মনে হলো যেন একটি দুঃখের নিশ্বাস ফেললে!'

নবদুর্গাও চকিত হয়ে বলে ওঠে, 'ওমা, সে কি! দুঃখের হতে যাবে কেন?'

এই আচমকা ব্যস্ততায় নবদুর্গার গলার স্বর একটু স্পষ্ট আর স্বাভাবিক হয়। দেখা যায় তার মুখ সৌন্দর্যে যে লাবণ্যলেখা, কণ্ঠস্বরেও তা বর্তমান।

সেই লাবণ্যমণ্ডিত গলায় কথাটা শেষ করে নবদুর্গা, 'সুখের।'

'সুখের!' সোমনাথ হেসে ফেলে বলেন, 'তাই বুঝি? সুখেও যে

নিশ্বাস পড়ে তা জানতাম না।····তা সেই সুখশ্বাসটি পড়বার মত এমন কি সুখের ঘটনা ঘটলো?'

নবদুর্গা বলে, 'বাঃ! সুখ নয়? এই যে বসে আছি। এটা বুঝি কম সুখ?' স্বভাব বহির্ভূত ভাবেই এতগুলো কথা বলে ফেলে নবদুর্গা। বোধকরি 'দুঃখ' শব্দটাকেই একেবারে মুছে ফেলতে।

এখন শীতের মধ্যাহ্নে ঘুঘুর একটানা ঘুমের মাদকতা ভরা করুণ তান নেই, শুধু দূরে কোথায় যেন কোনো রাজপথ থেকে ভেসে আসছে পালকি বেহারাদের বিলীয়মান একটানা শ্রান্তধ্বনি—হুম্ ব্রো····হুম্ ব্রো। শেষটা ঘুঘুরই মত।

পথ পার হয়ে গেলেও যেন শব্দটা কানে বাজে অথবা মনের মধ্যে কোথাও। যেন বাতাসের স্তরে স্তরে ছাড়িয়ে দিয়ে যায় শব্দের তরঙ্গ।

কে জানে এই ভর দুপুরে কে চলেছে পাল্‌কিতে। কোনো নববধূ? চলেছে পতিগৃহ থেকে পিতৃগৃহে? তার হৃদয় উত্থিত উদ্বেল তরঙ্গ পাল্‌কি বেহারাদের ওই অর্থহীন ধ্বনির সঙ্গে যুক্ত হয়ে বাতাসকে তরঙ্গিত করছে।····অথবা যাত্রা তার পিতৃগৃহ থেকে পতিগৃহের দিকেই। ····তাই বিচ্ছেদ ব্যাকুল বালিকাচিত্তের ভীত শঙ্কিত নিঃশ্বাস বাতাসকে ভারাক্রান্ত করে তুলে ওই ধ্বনিকে মন্থর করে তুলছে।···অথবা কে জানে কোনো রাজকর্মচারী···চলেছে দরকারি কাজে। বাতাসে তার ব্যস্ততার ভাব, জানালাপথে উন্মুক্ত গঙ্গার স্রোতে।

অন্যমনা ভাবে সেই দিকে তাকিয়ে সোমনাথ নিজ মনেই বলেন, 'পাল্‌কিতে কে যাচ্ছে! চরণ কবরেজ কি গ্রামের বাইরে কোথাও যাচ্ছেন? না কি সেরেস্তার কেউ?'

নবদুর্গাও তাকিয়ে আছে গঙ্গার মৃদু তরঙ্গভঙ্গের দিকে। এখন আস্তে বলে, 'কোনো বউও তো যেতে পারে বাপের বাড়ী কি শ্বশুরবাড়ি।'

সোমনাথ বলেন, 'তা পারে বটে! ও চিন্তাটা আমার মাথায় চট করে খেলেনি। আচ্ছা, বাজি ধরি এসো—'

নবদুর্গা থতমত খেয়ে বলে, 'কী ধরি ?'

'বাজি।....অর্থাৎ তোমার কথা ঠিক হলে তুমি জিতে গিয়ে আমার কাছে কিছু দাবি করবে, আর আমার কথা ঠিক হলে আমি জিতে গিয়ে তোমার কাছে কিছু আদায় করবো।...এখন আমার মনে হচ্ছে চরণ কবিরাজ, কি সেরেস্তার লোক, তোমার হচ্ছে 'নতুন বৌ'।'

এহেন অভিনব প্রস্তাবে নবদুর্গা প্রায় শব্দ করে হেসে ফেলে বলে, 'এ মা! এ যে আমাদের ছোটকালের খেলা। আমি আর সই পণ ধরতাম—তোর কথা ঠিক হলে তুই এই পাবি, আমার কথা ঠিক হলে—' থেমে যায়। কথা শেষ করতে পারে না।

সোমনাথ হেসে বলেন, 'বেশ তো, না হয় বুড়ো কালেই একবার ছোটকালের খেলা খেললে—এখন বল, কার কি পণ? আমি বলে নিই—জিতলে তোমার পাওনা একজোড়া মকরমুখো না হাঙরমুখো বাজুবন্ধ, আর হারলে—'

নবদুর্গা আবার না হেসে পারে না। বলে ওঠে, 'ওমা, মকরমুখো হাঙরমুখো আবার বাজুবন্ধ হয় নাকি ?'

'হয় না ?'

'মোটেই না।'

'তা হলে ? কী হয় ও সব ? কথাগুলো শুনতে পাই যে—'

নবদুর্গার অনভিজ্ঞতায় অনেক সময়ই কৌতুকের হাসি হাসেন সোমনাথ। এখন যে হাসির দাবিদার নবদুর্গা। নবদুর্গা অতএব তার স্বভাবগত কুণ্ঠা ছেড়ে রীতিমত কৌতুকের হাসি হেসে ফেলে বলে, 'সে তো বালা হয়। মকরমুখো, হাঙরমুখো, বাঘমুখো—'

'ওরে সর্বনাশ! আবার বাঘমুখোও ? তাহলে আর ওদিকে গিয়ে কাজ নেই। তবে সীতাহারে রফা হোক।'

নবদুর্গা যেন সম্বিত ফিরে পেয়ে আবার স্বভাবে ফিরে আসে। মাথা নীচু করে বলে, আমার ও সবে কাজ নেই। কত গহনা বাক্স ভর্তি। দিদির তোলা গহনাগুলোও তো সবই আমায় পরান, কী হবে আবার ?'

সোমনাথ মৃদু মৃদু হাস্তে বলেন, 'কথাটা তো বড় তাজ্জব। মেয়ে-মানুষের গহনায় অরুচি! এ যে বেড়ালের মাছে অরুচির মত! মেয়েরা তো শুনেছি—'

নেহাৎই কৌতুকের কথা। তবু এতে নবদুর্গার সেই কালো কোমল চোখ দুটোর তারায় যেন ফস করে এক ঝিলিক আগুন জ্বলে ওঠে। কাঁপা গলায় বলে, 'কী শুনেছেন তা জানি না, কী দেখেছেন সেটাই ভাবুন। দিদিকে তো দেখছেন আপনি—'

'তোমার দিদির কথা বাদ দাও। তিনি তো মহারাণী।....'

'মহারাণী না হলেই হ্যাংলা হবে না কি? মেয়েমানুষকে আপনি কী ভাবেন?'

নবদুর্গার কণ্ঠস্বর এখনো কাঁপা।

সোমনাথ বলেন, 'এই দেখো, তামাসা থেকে বচসা। আচ্ছা না হয় গহনা নয়, অন্য কিছু বল। তার বদলে—'

'তার বদলে? তার বদলে!' নবদুর্গা প্রথমে উত্তেজিত, তারপর স্তিমিত হয়। বলে, 'তার বদলে বরং এই করুন, এতো ঘন ঘন কলকাতায় যাবেন না।'

সোমনাথ অবাক্ হন। বলেন, 'কী আশ্চর্য। এটা আবার কী পাওয়া হলো তোমার?'

নবদুর্গা তার বাঁ হাতের অনামিকায় পরা মুক্তোর আংটিটা অন্য হাতে ধরে ঘোরাতে ঘোরাতে আস্তে বলে, 'অনেক পাওয়া হলো।'

সোমনাথ ওই লজ্জানম্র তরুণীর মুখের দিকে একটি সেই গভীর দৃষ্টি ফেলে আরো গভীরে একটি নিশ্বাস ফেলেন। কিন্তু কথা বলেন হালকা চালেই। বলেন, 'তাই তো তুমি যে দেখছি আমায় ধাঁধায় ফেললে! পাওয়াটা কী খুলেই বলো দেখি!'

নবদুর্গার মুখে কথা নেই।

সোমনাথ আবার বলেন, 'কী হলো? কথা বলছো না যে—বলো! ওর মধ্যে তোমার পাওনাটা কী হলো?'

নবদুর্গা এখন আর একবার চোখ তুলে তাকায়। কিন্তু তাকিয়ে থাকতে পারে কই? তার ওই দীর্ঘ পল্লববিশিষ্ট গভীর কালো চোখ দুটি যে কত অর্থবহ, তা তো ওই লোকটা জানতেই পারে না। সে চোখে অভিমান ফোটে, অভিযোগ ফোটে, মিনতি ফোটে, হতাশা ফোটে, আরো কত সূক্ষ্ম ভাবের খেলা খেলে সেখানে, কিন্তু দর্শকের সামনে নয়। ওই বিদ্বৎজন সমাদৃত পণ্ডিত এবং পরম রূপবান মানুষটার সামনে নবদুর্গা নিজেকে যেন তৃণসম মনে করে। তাই চোখ তুলে চোখের ভাষা বুঝতে দেবার আগেই চোখ নামায়।

কিন্তু মুখে কথা বলে এখন। বলে, 'পাওয়াটা হলো—ভয় পাওয়া থেকে রক্ষে পাওয়া।'

সোমনাথ তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে এলিয়ে বসেছিলেন, এখন খাড়া হয়ে উঠে বসে। নবদুর্গার মুখটা নিজের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে বলেন, 'কী আশ্চর্য, তুমি যে আজ হেঁয়ালি হয়ে উঠেছ দেখছি।....কিসের ভয়? রক্ষেই বা কিসে?'

নবদুর্গা গাঢ় গলায় বলে, 'আপনি যে নৌকোয় আসা-যাওয়া করেন।....নৌকোয় আমার বড় ভয়।....এখানে যখন ভরা গঙ্গায় ঝড় ওঠে, ঢেউ ফুলতে থাকে, নৌকোগুলো টলমল করে, দেখে বুক কাঁপে। বেশী বেশী না গেলে, সর্বদা এতো ভয় করবে না।'

সোমনাথ বলেন, 'তুমি আচ্ছা এক পণ ধরলে বটে। দেখছি তুমিও তোমার ওই দিদিটির মতই! চালাক কম নও। ভিজে বেড়ালের মত থাকো তাই।'

নবদুর্গা হতাশ হতাশ আলগা গলায় বলে, 'আমি দিদির পায়ের নখের যুগ্যিও নয়।'

সোমনাথ এখন গম্ভীর হন। বলেন, 'নিজেকে সব সময় এতো তুচ্ছ, এতো ছোট ভাবো কেন? এটা ভালো নয়। নিজেকে খুব বড় ভেবে অহঙ্কার করাও যেমন ভাল নয়, তেমনি নিজেকে তুচ্ছাতিতুচ্ছ ভাবাও ঠিক নয়। এ একটা ব্যাধি। এর থেকে উদ্ধার হবার চেষ্টা করবে।'

নবদুর্গা অবশ্য নীরব।

সোমনাথ একটু পরে একটু হেসে বলেন, 'দিদি তো তোমার সতীন। তাকে তো হিংসে করাই রীতি, ভক্তি করার তো নয়। এতো ভক্তি কেন?'

'হিংসে? দিদিকে আমি হিংসে করবো?' নবদুর্গার কচি পাতা রঙের মুখটা লালচে হয়ে ওঠে, 'কী বলছেন?'

সোমনাথ অবশ্য এতে বিচলিত হন না। সোমনাথের চোখে একই কৌতুকের দৃষ্টি। বলেন, 'নতুন কিছু বলিনি। পৃথিবীর নিয়মের কথাই বলছি।'

নবদুর্গা ক্ষুব্ধ গলায় বলে, 'মোটেই না। আপনি আমার 'মন বুঝতে' বলছেন।'

'এই ছ্যাখো! এ যে দেখি উলটো প্যাঁচ।...আমি কিন্তু ও কথা ভেবে বলিনি। সতীনের সঙ্গে হিংসের সম্পর্ক, এ তো সেই ছেলে বেলার রূপকথার সুয়োরানী দুয়োরানীর গল্প থেকেই জেনে আসছি—'

নবদুর্গা আস্তে বলে, 'সবাই এক রকম নয়।'

'তা বটে।...কিন্তু তোমার পণটি বাপু গোলমেলে। কলকাতায় আমার কত কাজ, ঘন ঘন তো যেতেই হবে।'

'তা হলে গাড়িতে যাবেন।...এখন তো কত সুবিধে। রেলগাড়িতে ক দণ্ডে পৌঁছে যাওয়া যায়—'

সোমনাথ যেন নিজেকেই নিজে বলছেন এই ভাবে বলেন, 'অনেকেই এ কথা বলে বটে, কিন্তু আমার কেমন যেন ভাল লাগে না। ও গাড়িটা যেন বড় বেশী উগ্র। যেন প্রকৃতিকে রেয়াৎ করে না।'

'তা ঘোড়ার ডাক বসিয়েও তো যাওয়া যায়? এখান থেকে কলকাতা আর কত দূর?...সেরেস্তার লোকেরা তো পাল্‌কি চেপেও যাওয়া আসা করে।'

সোমনাথ হঠাৎ বেশ জোরে হেসে উঠে বলেন, 'আরে তাই তো! আমাদের আসল কথাটাই যে ভুল হয়ে যাচ্ছে।...পাল্‌কিতে কে যাচ্ছে

সেই নিয়েই বাজি ধরা না? তা তুমি এমন একটি জিনিস চেয়ে বসলে। ভাবছিলাম একখানা সীতাহার কি বাজুবন্ধের ওপর দিয়েই যাবে, তা তো হচ্ছে না···নৌকোটা আমার বড় প্রিয় নতুন বৌ! তাই না বাবার আমলের ওই নিজস্ব নৌকোখানাকে অমন করে মেরামত করে সাজিয়ে গুছিয়ে নেয়েছি। বলি যে, তোমায় একবার চড়াবো তা তুমি তো রাজীই হও না। চল না এবার আমার সঙ্গে কলকাতায়। দেখবে খুব ভাল লাগবে।'

'আমি? একলা?' নবদুর্গার চোখ গোল হয়ে উঠে।

সোমনাথ বলেন, 'একলা কোথা? বললাম যে আমার সঙ্গে—'

'সেই তো। আপনার সঙ্গে একলার কথাই বলছি। য্যাঃ।'

সোমনাথ গম্ভীর হাসি হেসে বলেন, 'সাধে বলি, তুমি যেন আমায় পরপুরুষ পরপুরুষ ভাবো।'

'আঃ! ইস্! ছি ছি! কী যে বলেন!'

'তুমি যেমন ব্যবহার কর সেটাই বলছি। স্বামীর সঙ্গে যাবে—তাতে কী? নৌকো চড়ে ঘুরে এলে বার বার যেতে চাইবে। তখন আর আমায় নিষেধ করতে বসবে না।···দেখো তো আমার মাথার মধ্যে কী ভাবনা ঢুকিয়ে দিলে! এখন যদি বাজিতে হারি, তাহলে কী দশা হবে আমার?'

নবদুর্গা একটু নড়েচড়ে বসে।

সোমনাথ যেন একটা শিশুর সঙ্গে কথা বলছেন। নবদুর্গার সঙ্গে সোমনাথের কথা বলার ধরনই এই: ···নবদুর্গা অবশ্য ওই কথাতেই মোহিত হয়, বিগলিত হয়, তবু একবারও কি ক্ষুণ্ণ হয় না? ওরই কি মনে হয় না সোমনাথ যেন তার সঙ্গে ছেলে ভুলানো গল্প করছেন। হয় তো হয়। তবু—

তবু, করছেন তো গল্প।

তাতেই চরিতার্থতা।

নবদুর্গা গঙ্গার দিকে অপলকে তাকিয়ে বলে, 'আপনিহারবেনই না।'

'হাত গুণে বলছ?'

'হাত গুণতে হয় না।'

'ভাল ভাল। উঁচুদরের জ্যোতিষী। মুখ দেখেই গণনা। তাহলে আমার জিত নিশ্চিত?'

নবদুর্গা একদিকে ঘাড় কাৎ করে।

'বেশ, তাহলে তোমার কাছ থেকে কী আদায় করা যায় বল?'

নবদুর্গার মুখটা চকিতে ছায়াচ্ছন্ন হয়ে যায়। ও অস্ফুটে বলে, 'আমি আপনাকে কী দেবো? মনে মনে হয়তো বলে, সবই তো দিয়ে বসে আছি।'

মনের কথা শোনা যায় না, সোমনাথ তাই বলেন, 'আছে বৈ কি, বল তো বলি।'

নবদুর্গা কথা বলে সম্মতি দেয় না, শুধু একবার তাকায়।

সোমনাথ শান্ত গম্ভীর ভাবে বলেন, 'আমার সঙ্গে তুমি 'আপনি' 'আজ্ঞে' করে কথা বল, এটা ছাড়তে হবে।'

নবদুর্গা যেন মরমে মরে, বলে, 'আপনি কত বড়—'

সোমনাথ বলেন, 'স্বামী তো স্ত্রীর থেকে বড়ই হয়।'

'আপনাকে আমার অনেক অনেক বড় লাগে।'

সোমনাথ মৃদু হেসে বলেন, 'তাহলে তোমায় আমার ছোট ঠাকুর্দার কথা শোনাতে হয়। ছোট ঠাকুরর্দার তৃতীয় পক্ষ আমাদের ছোট ঠান্‌দি ছিলেন কর্তার থেকে চল্লিশ বছরের ছোট—'

'চল্‌লিশ!' চমকে না উঠে পারে না নবদুর্গা।

সোমনাথ হাসেন, 'পুরো চল্লিশ। বিবাহকালে ঠাকুর্দার বয়সে ছিল পঞ্চাশ, ঠান্‌দির দশ। আগের পক্ষের ছেলেমেয়েরাই ঠান্‌দির থেকে কত বড়।'

নবদুর্গার যেন একটা গল্প পেয়ে স্বভাবগত কুণ্ঠাটা একটু শিথিল হয়ে যায়। নবদুর্গা অবাক্ গলায় প্রশ্ন করে, 'এরকম বিয়ে হলো কেন?'

সোমনাথ মৃদু মৃদু হাসতে হাসতে বলেন, 'কেন হলো, সে বলতে

বসলে অনেক কাহিনী। মোটের মাথায় ছেলের বৌরা তাঁকে যথেষ্ট যত্ন করেনা, এই রাগে ঠাকুর্দা এই দুষ্কর্মটি করে বসেছিলেন।···কিন্তু ঠান্‌দির ব্যাপার যদি দেখতে! ঠান্‌দির ওই চল্লিশ বছর বয়সের বড় কর্তাকে উঠতে বসতে নাকানি চোবানি খাওয়াতেন।'

'য্যাঃ!' নবদুর্গা অবিশ্বাসের হাসি হাসে।

'যাঃ নয়, সত্যিই। হাভাতে বুড়ো, মুখপোড়া মিনসে, বেআক্কেলে, লক্ষ্মীছাড়া, গরুচোর এই সব ভাল ভাল ডাকে ডাকতেন তাঁকে—'

নবদুর্গা আর পারে না, মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হেসে কুটি-কুটি হয়।

সোমনাথ সেদিকে তাকিয়ে একটা অলক্ষ্য কৌতুকের হাসি হাসেন, বলেন, 'তাহলেই বোঝো! ঠান্‌দি ওঁর থেকে বয়েসে বড় পুত্রকন্যা, পুত্রবধূদের সঙ্গেও আচরণ করতেন রীতিমত গুরুজনের মত।···আর তারা তেমন মান্যি ভক্তি না করলে আচ্ছা করে শুনিয়ে দিতেন তাদের।'

'শুনিয়ে দিতেন?'

'হ্যাঁ! বলতেন আমি কি বানের জলে ভেসে তোদের সংসারে এইছি? তোদের বাপ আমায় বে করে নে আসেনি? আমার গিন্নীর মান্যি না দিয়ে পার পাবি?···তবেই বোঝো—বিবাহিতা স্ত্রীর অধিকারটা কী?···তুমিই শুধু বোকার মত নিজেকে কিছু নয় ভেবে কষ্ট পাও।'

নবদুর্গা চমকে বলে, 'কে বললে কষ্ট পাই?'

'যদি না পাও, সে তোমার মহানুভবতা, পাওয়াই তো উচিত।'

'না, আমার কোনো কষ্ট নেই।'

'কিন্তু আমার আছে।' সোমনাথ গাম্ভার্যের সঙ্গেই বলেন।

নবদুর্গা সভয়ে তাকায়।

প্রায় গাছের পাতা খসার শব্দের মত অস্ফুটে বলে, 'কষ্ট!'

'হ্যাঁ। নয় কেন? তোমায় আমি বিবাহ করে নিয়ে এসেছি, অথচ তুমি—' থেমে যান। বোধ হয় কী বলবেন খুঁজে না পেয়েই

থামেন।....এই অবসরে নবদুর্গা হঠাৎ ওঁর হাঁটুর উপর একটা হাত রেখে ব্যাকুল ভাবে বলে ওঠে, 'আচ্ছা আমি আর আপনি বলবো না।'

সোমনাথ ওর ওই হাতটা নিজের হাতে তুলে নেন, বলেন, 'ঠিক আছে। মনে থাকবে তো?'

তবু সোমনাথের গভীর অন্তঃস্থল থেকে একটি চাপা নিঃশ্বাস উঠে এসে ঘরের বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। দুঃখের? না পরিতাপের?

সোমনাথের এই শয়নকক্ষ, বা শয়ন-মহলটি বাড়ির একেবারে একপ্রান্তে এবং একটু যেন বিচ্ছিন্ন। গঙ্গার বেশী নিকট সান্নিধ্যের আশাতেই পুরনো ভিটের সঙ্গে বাগানের লাগোয়া কোণ ঘেঁষে এই মহলটি নির্মিত। এ ঘরের কথা ওদিকে পৌঁছয় না।....তবু নবদুর্গা মাঝে মাঝেই শঙ্কিত হচ্ছিল। একটু হেসে ফেলে, একটু কথা কয়ে ফেলে, এখন আর একটা ঘটনায় একেবারে স্তব্ধ হয়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি পালঙ্ক থেকে নেমে পড়ে পাশের সেই ঘরটায় ঢুকে পড়লো, যে ঘর বাক্স তোরঙ্গ দেরাজ আলমারি আলনায় বোঝাই।

ঘটনাটা এই, এ মহল সংলগ্ন বৈঠকখানা ঘরের দরজার শিকলটা নড়ে উঠেছে ঠিন্ ঠিন্ ঠন্ ঠন্।

দরজা বন্ধ নয়, তবু এটা একটা সৌজন্য, একটা সভ্যতা। দরজা খোলা আছে বলেই কেউ ঢুকে পড়বে নাকি?

সোমনাথ সাড়া দিলেন, 'কে?'

'আমি বাবা—'

মানদা খুড়ীর মধুঢালা কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'আসব?'

সোমনাথও অবশ্য ততক্ষণে পালঙ্ক থেকে নেমে পড়ে, রূপোর গুল্-বসানো খড়ম জোড়াটা পায়ে ঢুকিয়ে এগিয়ে এসে বলেন, 'খুড়ী, কিছু বলবে?'

মানদা খুড়ী তাঁর এই বিনা অসম্পর্কিত ভাসুরপোর থেকে বয়েসে অনেক বড় হলেও তাঁর সামনে ঘোমটা দেন। এখন দেখেই তাড়াতাড়ি নিজের প্রায় ন্যাড়া মাথাটিতে ঘোমটা টেনে বলে ওঠেন, 'তোমার লোক-

জনেদের তো পাত পড়ে গেলো বাবা, এখন শুধোই এবার খাবে তো?'

সোমনাথ বলেন, 'সবাই বসেছে?'

'বসেনি—দেখলাম তো, ঢেঁকিঘরের দাওয়ায় জনা দশ বারোর পাত পড়েছে। বড়বৌমা আমায় শুধোতে পাঠালেন—'

'বড় বৌমা শুধোতে পাঠালেন!' সোমনাথ ওই [illegible] কোকলা মুখটার দিক থেকে চোখটা সরিয়ে নিলেন। হঠাৎ [illegible] অপমান অনুভব করলেন তিনি।...বড়বৌমা শুধোতে পাঠালেন!

শুধোতে পাঠাবার মত আর লোক জুটলো না তাঁর।...আর [illegible] এতই রাজকার্যে ব্যস্ত যে—

অপমানের জ্বালাটা নিঃশব্দে নিজের মধ্যেই পরিপাক করে নিয়ে সোমনাথ শান্ত গলায় বললেন, 'এত বেলায় আর ভাতটা খাবো না [illegible]। শরবৎ খেলাম।'

যদিও ভাবনাটা এই মুহূর্তের।

হঠাৎ যেন মনে হলো এই [illegible]নাটা কোনো একখানে একটা [illegible] ঘা দেবে। আর সেটাই সোমনাথ নামে মানুষটার [illegible] জ্বালার কিছুটা উপশম হবে।

কিন্তু আপাতত ভালো উপশমের বদলে [illegible] গেল। মানদা খুড়ী যেন হঠাৎ কারও শোক সংবাদ শুনেছেন এই ভাবে [illegible] উঠে বললেন, 'ওমা ই কি কথা? বেলা হয়ে গেছে বলে ভাত খাবে নি? এমন কিছু বেলা হয় নাই বাবা! গিন্নি বক্কে করছে'; খেতে বসতে হবে বৈকি!'

সোমনাথ বিরক্তি চেপে বলেন, 'আচ্ছা তুমি যাও খুড়ী। দেখছি!

মানদা খুড়ী এরপর আর দাঁড়াতে সাহস করেন না। শুধু বিড়বিড় করে বক বক করতে যান, 'সোয়ামী ছোটরানী শরবৎটুকু দিতে এসে এতক্ষণ গালগপ্পোয় বেলা পুইয়ে দিলেন, সোয়ামীকে বলতে জানেন নি, ওগো তোমার নাওয়া খাওয়ার দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

আবার একটু থামেন।

বিড়বিড় করে বলেন, 'তাই বা বলব কী! কেতা যে অনেক রকম। হাড়ি বাগদী বেয়ারা কাহার সকল জনের খেতে বসা দেখে তবে কর্তা খেতে বসবেন। এ আবার কেমনতর আদিখ্যেতা। ছোট-লোকের হলগে মার্তণ্ডের পেট, সূয্যি পাটে বসার মুখে গিলতে বসার অভ্যেস, মাঝ দুপুরে গিলে নিলে, দুদণ্ড বাদেই আবার পেটের মধ্যে আগুন জ্বলে উঠবে নি? তা না ওই লক্ষ্মীছাড়াদেরও না কি পিত্তি পড়ে রোগ জন্মাবে। তাই বাবা আমার এই কল করেছেন।'

মানদা খুড়ীর বিড়বিড়িনির বিরাম নেই। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতেও আবার শুরু করেন, 'তা পেট জ্বললেই বা ক্ষেতি কী? দয়ার অবতার গিন্নীমা তো আছেন। সোন্‌দে হতেই ফের আবার ধামা ভত্তি মুড়ি চিঁড়ের নৈবিদ্যি সাজানো হবে। হুঁঃ!'

হরিমতী কী কাজে সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছিল, সে থমকে দাঁড়িয়ে বলে, 'খুড়ী ঠাকুমা এখনো এই গড়ানে বেলায় হরিনাম জপচো যে? তা হাতে তো মালা দেখচিনে।'

মানদার মনে হয় এটা বোধহয়—হরিমতির তাঁকে ব্যঙ্গ করা! তাই তীব্র ঝাঁজালো গলায় বলেন, 'হরিনামের আবার সময় অসময় কী রে হরিমতি? আর মালা না ফেরালে বুঝি নাম জপা যায় না?'

'ওমা। তা এতো এতো আগের কী আচে গা?' হরিমতি বলে, 'খুড়ী ঠাকুমা যেন সব্বদাই সেপাইয়ের ঘোড়া! যাক্‌গে বাবা, মা কমনে গেল দেকেচো?'

'মা?'

মানদা খুড়ী চোখ কুঁচকে বলেন, 'বড়বৌমা? তিনি আবার কোথায় থাকবেন হেঁসেল ঘর ছাড়া? পাটরানীর ঠাঁই পাটরানীর, দো রানীর ঠাঁই দো রানীর।'

হরিমতি বিরক্ত গলায় বলে, 'খুড়ী ঠাকুমার যেন সব্বদাই ঠেস দিয়ে কথা।...একটুক্ আগেই তো পরাণের ঠাকুমার তাড়া খেয়ে মা ওপর বাগে চলে এলো দেখনু।'

মা তেতো গলায় বলেন, 'আবার বোধহয় তক্ষুনি নীচের বাগে চলে গেছেন। এইতো আমায় শুধোতে পাঠালেন, লোকজন সব খতে বসছেনো তিনি এখন খাবেন কিনা।'

আর কাউকে না পাঠিয়ে শুভঙ্করী যে তাঁকেই পাঠিয়েছেন এ গৌরবে গম্‌গম্ করেন মানদা।

হরিমতি বলে, 'কি জানি বাবা কখন কোথায় কী করচেন তিনি। ইদিকে তো হেঁশেল ঘরে 'মা মা' করে হাক্কা উড়ে গেল।'

মানদা উৎসুক গলায় বলেন, 'ও মা হাক্কা ওড়া কিসের?'

হরিমতি খরখরিয়ে বলে, 'কিসের তা জানি নে, দেকলাম তো হৈ চৈ পড়ে গেচে। আর এও বলি বামুনমেয়েরই অন্যাই। মা য্যাখন বলে গেছে, মাঝিমাল্লাগুলোকে মাথা পিচু চারখান করে মাচের গাদা দিতে, ত্যাখন তুই মাগীর কী কাজ তার ওপর কলম চালাতে? সব্বক্ষণ খোদার ওপর খোদকারি মাগীর।'

'মাথাপিছু চারখানা করে মাচের গাদা!' মানদা যেন শিউরে ওঠেন, 'বলিস কি হরিমতি! ওই ছোটলোকগুলোকে? বাপের কালে কেউ এমন শুনেচে? অ্যাঁ!...তাও কি ছোটোমোটো? মাচ কোটা তো দেকেচি, অ্যাতো খানি খানি। আর সব একোই মাপের। এ বাড়ির যেন পায়ে মাথায় সমান। যা ঘরের ছেলেপেলে খাবে, তাই ছোটোলোকগুলোও খাবে। তাও ন্যায্য বলি, ঘরের ছেলেপেলে চারখানা করে মাচের গাদা কই খাচ্ছে?'

হরিমতি নেমে যাচ্ছিল, এখন ঘাড় উচিয়ে বলে, 'ও কতা বোলোনি খুড়ী ঠাক্‌মা, জিব খসে যাবে। ঘরের ছেলেপেলে খাচ্চে না? এই তো একটুক আগেই তোমার পৌত্তুরটি একসরা মাচ খেলো। ডাল বেগুন তো ওনার মুকে ওচে না, আগাস্তি গোড়াস্তি শুদু মাচ দে ভাত খাবে।'

এ কথার পর মানদা সাপিনীর মত ফুঁশে উঠবেন এটাই স্বাভাবিক। উঠলেনও তাই। তীব্র তীক্ষ্ণ গলায় বলে উঠলেন, 'যত বড় মুখ নয়,

অত বড় কথা তোর হরিমতি ? আমায় বলিস কি না জিভ নেদ
আমার নাতির খাওয়া তুলে খোঁটা ! আচ্ছা আমি গিন্নীর াগে
প্রতিকার যদি না করি তো এক্ষুনি ছেলে বৌ নাতি নাতনীর ি
বেরিয়ে যাবো।' বলে আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে নেমে যান ার

হরিমতি ঠোঁট উলটে স্বগতোক্তি করে, 'তুমি নইলে আর
হবে কে ? এ থেটার তো দিন দুবেলা দেকচে লোকে। এই হা
কপালে খানিক বকুনি খাওয়া আচে।'

আবার হঠাৎ মুখ টিপে হেসে মনে মনে বলে, 'সেটাও
থেটার। লোক দেকানো বকুনি দিয়ে নোকের আড়ালে বকশিশ্‌। ...
ধন্যি বলি বাবা বুদ্দিকে। না হয় কপালে মা-ষষ্ঠীর কেরপা হয়নি, তাই
বলে মা-লক্ষ্মীকে দু দরজা হাট করে ওড়াতে হবে ? যত রাজ্যির পঙ্গপাল
জুটিয়ে রেখে নিজে চব্বিশ ঘন্টা তাদের জন্যে গাদা খাটুনি খেটে মরচে।
....যেন দাসী বাঁদী ! এই সব কুপুষ্যিদের কারো পান থেকে চুন
খশাবার জো নেই। ভেবে ভেবে ভয়ে হয়ে কুল পাইনে।'....হরিমতি
আবারও স্বগতোক্তির পথে এসে দাঁড়ায়, 'বুদ্দির কথা আর ভাবিই না
ক্যানো ? ঘটে একছিটে বুদ্দি থাকলেও কি আর আপনার পায়ে
আপনি কুড়োল মারে ?....যাক গে, মরুকগে. আমরা দাসী বাঁদি, দাসী
বাঁদির মতন থাকাই ভাল। যাই দেকি গে কোথায় গেল মা !'

এ বাড়িতে যারা নতুন, তারা শুভঙ্করীকে বলে 'বড়মা', কিন্তু
পুরনোরা শুধুই 'মা' বলে। হরিমতি শেষের দলে।....তবে আবার
শুভঙ্করীকে 'গিন্নীমা' বলে এমন লোকেরও অভাব নেই। আছেন
সরকার মশাই. যিনি সোমনাথের মায়ের আমলের।

সে যাক।

কিন্তু সত্যি শুভঙ্করী এখন কোথায় ? পরাণের ঠাকুমার তাড়নায়
তিনি তো আঁচলে হাত মুছতে মুছতে দোতলায় ওঠবার বড় সিঁড়িতে
উঠে এসেছিলেন।....তারপর ? তারপর কী হলো ?

হ্যাঁ, দোতলার দালানে এসে পা ফেলে ছিলেন বটে এ বাড়ির

আলতা রাঙা পা অবশ্য নয়। বসে আলতা পরার সময়ই হয় না শুভঙ্করীর। নাপিত বৌ এলেই ব্যস্ত হয়ে বলে ওঠেন, 'নুটিটা একটু নোখে ছুঁইয়ে দিয়ে ছেড়ে দে নাপিত বৌ, বসবার সময় নেই।

নাপিত বৌ রেগে বলে, 'ভামন্ত সংসারের ছিষ্টি কাজ করবার সময় হয় তোমার বড়মা, আর ধোয়া ধরে একটু আলতা পরতে বসতে সময় হয় না? এয়োস্ত্রিরী মানুষ—নক্ষণ বলে কতা—'

শুভঙ্করী তাড়াতাড়ি বলেন, 'নোখে ছোঁয়ালেই লক্ষণ হয় বাবা—'

তারপর একটু মুখ টিপে হেসে বলেন, 'ছোট গিন্নীর শ্রীচরণ নিয়ে বসে বসে আল্পনা কাট না? একই কাজ হবে।'

নাপিত বৌ মনে মনে বলে, 'ধন্যি মেয়ে মানুষ মা তুমি. এ সব বাক্যিতেও হাসি পায়।'

মনে মনে কথাব চাষ এ সংসারে বড় বেশী। সবাই মনে মনে কথা কয়।....এমন কি বাড়ীর কর্তাও।

মানদা খুড়ী চলে যাবার পর নবদুর্গা আস্তে ও ঘর থেকে একটু মুখ বাড়িয়ে দেখে নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে এ ঘরে এসে ঘোমটাটা বাড়িয়ে বলে 'যাই?'

সোমনাথ এখন আর বলেন না, 'যাবে কেন? কে মারছে তোমায়?'

বলেন তো এমন কথা অনেক সময়ই। এখন বললেন না, তাকালেনও না ওর দিকে। মৃদু গম্ভীর গলায় বললেন. 'এসো।'

নবদুর্গা সভয়ে একবার ঘোমটার পাশ থেকে ওই গম্ভীর মুখটার দিকে তাকালো।

এই স্বর তার চেনা।

জানে এখন আর এই মানুষটার চিন্তার জগতে 'নবদুর্গা' নামের একটা তুচ্ছ প্রাণীর কোন অস্তিত্ব নেই।

আবার আপন তুচ্ছতায় মরমে মরে নবদুর্গা।

ক্ষণপূর্বের সেই পুলকিত কৃতার্থমন্যতাটুকু ম্রিয়মান ছায়ায় ঢেকে যায়।....আস্তে আস্তে নেমে যায় ঘরের মধ্য থেকেই, নেমে যাওয়া সেই নিজস্ব সিঁড়ি দিয়ে।....এ সিঁড়ি গিয়ে পড়বে একতলার দালানের পাশের চোরকুঠুরির সামনে। এ সিঁড়ি নির্মাণের কারণ হচ্ছে সময় বাঁচানো।

স্বল্প সময়ের মধ্যেই নিজের মহলে চলে আসেন সোমনাথ। কখনো বা নবদুর্গা কখনো শুভঙ্করী।

নবদুর্গার চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়েও দেখলেন না সোমনাথ। ঘরের মধ্যেই একটু অস্থির ভাবে পদচারণা করে বারন্দায় বেরিয়ে এলেন। স্থির হয়ে রেলিং ধরে দাঁড়ালেন না, এখানেও পদচারণা করতে লাগলেন।

যদিও এখন ঝাঁ ঝাঁ রোদ, তবু গঙ্গাবক্ষ থেকে বহে-আসা শীতের উড়ো হাওয়া কাঁপুনি ধরিয়ে দেবার মত। তবু ঘর থেকে একখানা শাল নিয়ে এসে গায়ে জড়াবার উৎসাহ নেই।....পদচারণা করতে করতে নিজের মনে অস্ফুটে বলে ওঠেন, 'নিয়তি? চোখকে মনঠারা নিয়তি নয়। ভুল! ভ্রান্তি!....সারা জীবন তার খাজনা জুগিয়ে যেতে হবে। স্বেচ্ছায় অসহায়তা!.. লজ্জা, গ্লানি, উপহাস!....

টুকরো টুকরো এই শব্দগুলো যেন শুকনো মালা ছেঁড়া ঝরা ফুলের মত খসে খসে পড়ে।

সোমনাথ শুভঙ্করীর জেদের কাছে পরাজয় স্বীকার করেছিলেন।

এখন ভাবলে আত্মধিক্কারের জ্বালা অসহনীয় হয়ে ওঠে।.. কেন করেছিলেন? কারো জেদের কাছে নতি স্বীকার করবার মত মেরুদণ্ডহীন কি তিনি?....

কিন্তু শুভঙ্করী কি জেদ করেছিলেন?

নাঃ, জেদ নয়! শুভঙ্করী সে পথে যাননি। শুভঙ্করী অনুনয় বিনয়ের দীর্ঘ পথ পার হয়ে অবশেষে এক মোক্ষম চাল চেলেছিলেন। শুভঙ্করী বলেছিলেন, 'দুই বিবাহে আপত্তি থাকতে পারে, থাকা হয়তো অসঙ্গতও নয়, কিন্তু বিপত্নীক পুরুষের তো দ্বিতীয় পক্ষ গ্রহণে আপত্তির

কোনো কারণ থাকতে পারে না। তবে সেই পথটাই প্রশস্ত করে দিয়ে যাবেন শুভঙ্করী স্বামীর জন্য।'

সোমনাথ তীব্র বেদনামিশ্রিত বিরক্তিতে প্রশ্ন করেছিলেন, 'কী করবে? বিষ খাবে?'

স্মৃতিমথিত নিজেরই এই প্রশ্নের ধাক্কায় সোমনাথ সহসা যেন অনেক ক'টা বছরের ওপারে গিয়ে পড়লেন।

দেখতে পেলেন ঘরের মধ্যেকার ওই পালঙ্কের বাজু ধরে শুভঙ্করী দাঁড়িয়ে। শুভঙ্করীর স্বর্ণাভ গৌর মুখের উপর পড়ন্ত বিকেলের স্বর্ণাভ আলো। সেই আলোয় ঝলসে উঠলো শুভঙ্করীর খুঁতহীন মুখের অনবদ্য একটুকরো হাসি।

সে হাসি ব্যঙ্গের নয়, যেন কৌতুকের।

গলার স্বরেও সেই কৌতুকের ঝিলিক, 'ওমা! শোনো কথা! মা গঙ্গার স্নেহের কোল থাকতে বিষ খেতে যাবো কোন্ দুঃখে?'

সোমনাথ গভীর গম্ভীর গলায় বলেন, 'মা গঙ্গার কোলটাই বা বেছে নেবার দরকার হচ্ছে কোন্ দুঃখে?'

'সে তো বলে বলে পুরনো হয়ে গেছে।'

'ওটা তোমার জেদের কথা। আমি তো তোমায় দত্তক নেবার ব্যবস্থাও করে দিতে চেয়েছি।'

শুভঙ্করী আবার তেমনি এক ঝিলিক হেসে উঠে বলেছেন, 'অরুচি! কোথাকার না কোথাকার একটা ছেলে, যার গায়ে এই রায়চৌধুরী বংশের রক্তের ছিটেও নেই, সে এসে জাঁকিয়ে বসে বংশ রক্ষে করবে?'

সোমনাথ শান্ত গলায় বললেন, 'এ পদ্ধতি তো নতুন নয়। আমার আবিষ্কারও নয়। পুরাকাল থেকে একাল পর্য্যন্ত পৃথিবীর সর্বত্রই এ প্রথা আছে, রয়েছে, থাকবেও।' বললেন, নেহাৎ দায়ে পড়েই। নচেৎ সোমনাথও ত দত্তক গ্রহণের স্বপক্ষে কখনোই নয়। ওঁরও একই বক্তব্য। তবু বললেন, 'কিন্তু—'

'থাকুক গে যাক'—শুভঙ্করী ঝংকার দিয়ে বলে উঠলেন, 'আমার ও কথা ভাবলেই হাসি পায়। পরের একটা ছেলে ধরে এনে তাকে 'বংশধর' ভেবে আহ্লাদে নাচা। ধ্যেৎ!'

সোমনাথ ওই কৌতুক হাসিভরা মুখটার দিকে অপলকে একটু তাকিয়ে দেখলেন। চিরদিন এই একটা হাসির ভঙ্গি দেখে আসছেন সোমনাথ শুভঙ্করীর। ওই হাসিটা যেন শুভঙ্করীকে অপর পক্ষের ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে তুলে রাখে।

চিরদিন?

তা নয়ই বা কেন?

সোমনাথের জীবনের সঙ্গে যুক্ত হবার আগে ক'টা দিনই বা কেটে ছিল শুভঙ্করীর জীবনের? বিয়ে যখন হয়েছিল তখন সোমনাথের বয়েস চোদ্দ আর শুভঙ্করীর আট।....সম্পর্কটা গড়ে উঠেছিল প্রায় বাল্য-সাথীর মতই ঝগড়া আর খেলার মধ্য দিয়ে।

এত কম বয়েসে বিয়ে হবার কারণ সোমনাথের, এ বংশের তিনি সবেধন নীলমণি বলে। দেবনাথ রায়চৌধুরীর একমাত্র সন্তান ভবনাথ। তাঁরও ওই একটি মাত্রই পুত্র সোমনাথ। অতএব সংসারে সহজে একটা উৎসবের আয়োজন করবার কারণ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। এটা ছুঃখের বৈ কি!

কবে কোন্ কালে গর্ভের বয়েস ধরে নবম বর্ষীয় পুত্রের উপনয়ন দেওয়া হয়েছিল। ব্যস্, তারপর এই দীর্ঘ পাঁচ ছ'টা বছর ধূ ধূ মরুভূমি।

সোমনাথের ঠাকুমা ধরে পড়লেন, 'ছেলের বে' দে ভব। এই ন্যাড়া ন্যাড়া দিনগুলো আর সহ্য হচ্ছে না বাবা।'

ভবনাথ চমকে উঠেছিলেন—'বিবাহ?....সোমনাথের?'

'তা খোকা বৈ তোর আর ক'টা ছেলে আছে ভব? বৌমাও তো এই শাউড়ির মতনই একটা ভিন্ন ছু'টোর মা হতে পারলো না। বেটা-ছেলে—তেরো চোদ্দ বছর বয়েস হয়ে গেছে, গোঁফ গজাতে আর কতক্ষণ? ঢ্যাঙা তো কম হয়নি।'

ভবনাথ হেসে ফেলে বলেন, 'ঢ্যাঙা হলেই বিবাহের যোগ্য বলে গণ্য করতে হবে মা? অতটুকু ছেলে '

'তুই থাম ভব! অতটুকু তা কী বয়ে গেল? বে' দিয়েই ওকে কি তুই পরিবার প্রিতিপালনের ভার দিবি? হাসবে খেলবে ঘুরবে ফিরবে, খেলুড়ির মতন একটা সঙ্গী পাবে। আর আমিও এই ন্যাড়া দিনগুলো গোনার হাত থেকে একটু রেহাই পাবো।'

ভবনাথ তবুও বলেছিলেন, 'আর দুটো বছর থাক না মা?'

সোমনাথের ঠাকুমা এবার ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, বলেছিলেন, 'দু' দুটো বছর বড় অল্প সময় হলো ভব? ত্যাতোদিন তোর মা নাত-বৌ দেখতে বেঁচে থাকবে এ দলিল লিখে দিতে পারিস?...তা বেশ! মায়ের ছেরাদ্দ চুকিয়ে বুকিযে তা'পর ছেলের বে'র ঘটা করিস।'

অথচ সত্যিই কিছু মরবার বয়েস হয়নি মহিলার।

কিন্তু এর পর আর কি করবার আছে?

অন্ততঃ সেকালে ছিল না এর পর আর কিছু করবার।

ভবনাথ ছেলের বিয়ের পাত্রী খুঁজতে লাগলেন।

সোমনাথের মা একবার স্বামীর কাছে মিনতি জানাতে চেষ্টা করেছিলেন, 'লেখাপড়া করছে, এক্ষুনি বিয়ে? এখন তো পাস করার রেওয়াজ হয়েছে। একটা পাস করে তারপর হলে হতো না?'

ভবনাথ ক্ষুব্ধ হাসি হেসে বলেছিলেন, 'হলে তো ভালই হতো, কিন্তু শুনেছো তো সবই?'

ভবনাথ-জায়াও ক্ষুব্ধ হাসি হেসে নিঃশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, 'শুনেছি।...জজের রায় পড়ে গেছে। আর নড়চড়ের উপায় নেই। তবু বলছিলাম আজকাল কি আর ওর বয়েসে কারুর—'

ভবনাথ বাধা দিয়ে বলেন, 'ও তর্ক তুলতে যেও না। দেশে-রাজ্যে কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে তুমি কি সব খবর রাখো? এই তো খড়দার ঠাকুরমশাইয়ের নাতির বিবাহ হলো, কতটুকু বালক? জোর এগারো বারো! তা নয়, সামনের বছরেই এনট্রান্স পরীক্ষা, এখন বাড়িতে

একটা বিরাট কাজকর্মের হুজুগ লাগলে, ক্ষতি না হয়ে যাবে? প্রতি বছর ক্লাসে প্রথম হচ্ছে—'

সোমনাথের মা কাঁদো কাঁদো হয়ে বলেছিলেন, 'তবে?'

'তবের আর কিছু নেই—'

ভবনাথ বিষণ্ণ গম্ভীর মুখে নিরুপায় গলায় বলেছিলেন, 'যা এগোচ্ছে তা এগিয়ে নিয়েই যেতে হবে। মা বলেছেন আজ ঘটকমশাই আসবেন, দেখা যাক। সুন্দরী সুলক্ষণা ভদ্রবংশোদ্ভূত কন্যা না জোটা পর্যন্ত তো হচ্ছে না। তাতে সময় কিছুটা ক্ষেপ হবে।'

তা আশ্চর্য, সোমনাথের ভাগ্যে অথবা সোমনাথের মায়ের দুর্ভাগ্যে, ঘটক ঠাকুর ত্বরিৎ গতিতে ঠিক তেমনিই একটি মেয়ের সন্ধান এনে দিলেন।

সুন্দরী, সুলক্ষণা, সুমিষ্টভাষিণী আর অতীব উচ্চ কুলীন বংশোদ্ভূতা। তা ছাড়া কেবলমাত্র বংশ কৌলিন্যেই নয়, অর্থ কৌলিন্যেও কম নয়; পাটুলীর জমিদার রাধাগোবিন্দ মুখুয্যের পৌত্রী। পিতা জয়গোবিন্দ বিদ্বান পণ্ডিত ব্যক্তি, কলকাতায় সংস্কৃত স্কুলে অধ্যাপনা করেন। এইটি জ্যেষ্ঠা কন্যা। আরও দু'টি সন্তান বর্তমান জয়গোবিন্দের, একটি পুত্র ও একটি কন্যাসন্তান।

ভবনাথের মা পুলকিত কণ্ঠে বলেন, 'আর কোনো চিন্তে নয় ভব, তুমি এইখেনেই কথা দাও।'

ভবনাথ হেসে ফেলেছিলেন, 'একেবারে কথা দিয়ে বসবো, কন্যা দেখার প্রয়োজন নেই?'

জননী উত্তেজিত প্রশ্ন করেছিলেন, 'ঘটকমশাই চিরকেলে লোক। তিনি কি বানিয়ে বানিয়ে মিছে কথা বলবেন? আর যা বলেছেন, তার অর্ধেক সত্যি হলেও, ছেলের বৌ করা যায়।'

ভবনাথ শশব্যস্তে বলেন, 'আহা, তাই কি বলছি? তবে কন্যার জন্মপত্রিকাটিও তো একবার দেখা আবশ্যক।'

'সেও দেখা হয়ে গেছে।' ভবনাথ জননী সগর্বে বলেন, 'তোর মা কাছা-কোঁচা দে কাপড় পবে না বটে, তবে জানিস সাতটা বেটাছেলের বুদ্ধি ধরে।....ঘটকমশাইকে বলাই ছিল তিনি একেবাবে মেয়ের ঠিকুজী-কুষ্ঠী সঙ্গে নে এয়েছিলেন। ইদিকে ভট্চাযমশাইকে খবর দেওয়া ছিল, তিনি খোকার ঠিকুজী কুষ্ঠীর সঙ্গে মিলিয়ে বলে গেছেন রাজযোটক। মেয়ের দেব গণ, বিপ্র বর্ণ, রাশি মিথুন।'

ভবনাথ ললাটে একবার করস্পর্শ করে বলেন, 'এতো কাণ্ড করা হয়ে গেছে ?'

জননী একগাল হেসে বলেন, 'তবে না তো কি তোর জন্যে ফেলে রেখে দেবো ? তোর বলে কত দিকে কত কাজ ! মিথ্যে বিলম্ব হয়ে যাবে।'

অতএব ভবনাথের আর কিছু বলার থাকে না। সেই সুন্দরী সুলক্ষণাযুক্ত ধনী কন্যাটি যদি এতই চালাক হয় যে, কোষ্ঠীপত্রটি পর্য্যন্ত প্রশ্নের অতীত করে রেখে থাকে, তাহলে আর বিলম্ব করাব অজুহাত কোথায় ?

কিন্তু ভবনাথ-জননী মহেশ্বরী দেবী যে কেবল ছেলেকে আয়ত্ত করেই সন্তুষ্ট থাকলেন তা তো নয়, ছেলের বৌকেও নত করা দরকার বৈ কি !

সে যে তার ছেলের বিয়ের খবরে বিরস মুখ করে বেড়াবে, এ তো হতে দেওয়া যায় না। ভবনাথ-জননী নিজ ভঙ্গিমায় ছেলের বৌকে একেবারে পেড়ে ফেললেন। ডাক দিয়ে হেঁকে বললেন, 'খোকার বে'র কথা হয়ে পর্যন্ত তোমার মুখের হাসি হরে গেল কেন বল তো বৌমা ?'

বৌমা মলিন মুখটিকে কতকটা অমলিন করে বলেন, 'কই মা ? কে বললে ?'

বৌমার শাশুড়ী প্রবল কণ্ঠে বলেন, 'বলবে আবার কে বৌমা ? ভগবান আমার কপালের নীচে দু'টো চোখ দেছেন, কি দেখনি ? তবে ? চোখ থাকতে কানের ভরসা করতে যাবো কেন বাছা ?'

বৌমা বিপদে পড়ে অস্ফুটে যা বলেন, তার অর্থ হতে পারে শরীরটা

তেমন ভাল নেই, তাই হয়তো শুকনো দেখাচ্ছে।

তবে ভবনাথ-জননীকে অত সহজে কাবু করা সম্ভব নয়। তিনি এ কথার উত্তরে বীরবিক্রমে যা বলেন, তার অর্থ—'শরীর খারাপ না হাতি, খারাপ হচ্ছে মন। বেটার বৌ আসবে সেই ভয়ের তাড়সে মুখ শুকনো, বাক্যিওক্যি বন্ধ, মুখে হাসি নেই। বেটার বৌয়ের শাশুড়ী হয়ে পড়লেই তো ভার-ভারিক্কী হতে হবে, বর সোহাগী হয়ে আহ্লাদিপনা করে বেরালে চলবে না।'

অনেকগুলো কথার পর শেষবেশ বলেন, 'তোমার যদি লজ্জায় না আটকায় বাছা তুমি বেটার বৌর সামনেও ইহুদি মাকড়ি কানে ঝুলিয়ে, পাছাপেড়ে শাড়ি পরে, মল পাঁইজোর পরে বেড়িও মা, কিছু বলতে আসবো না। কিন্তু আমার সাধে বাদটি দিতে এসো না।'

অতঃপর ?

অতঃপর কিশোর সোমনাথের সেই প্রায় তরুণী মা যাঁর নাম ফুল্লকমল, তিনি মল-মাকড়ি, তিন-পেড়ে শাড়িগুলি ঝিদের বিলিয়ে দিয়ে হাসি হাসি মুখ করে বেড়াতে থাকেন। এবং ছুটে ছুটে শাশুড়ীর কাছে এসে জিজ্ঞেস করতে থাকেন, 'মা, নবৎ বসবে তো ? মা ইংরিজী বাজনা বাজবে তো ? মা গড়ের বাদ্যি কি ? নতুন পিসীমা বলছিলেন, ওনার ভাগ্নের বিয়েতে না কি গড়ের বাদ্যি হয়েছিল।'

কিন্তু মহেশ্বরীর প্রতিপক্ষ তো আরো ছিল।

স্বয়ং যে বিয়ের বর।

সোমনাথ হঠাৎ একদিন প্রায় মরিয়া হয়ে এসে বলে, 'ঠাকুমা, কী সব নাকি বিচ্ছিরী কাণ্ড করছ তুমি ?'

ঠাকুমা গালে হাত দিয়ে বলেন, 'ওমা, আমি কোথায় যাবো ? এই বুড়ো বয়েসে আমি আবার কী বিচ্ছিরী কাণ্ড করতে যাবো রে ?'

'করছই তো। ইয়েটিয়ে কী সব শুনছি।'

ঠাকুমা হা হা করে হেসে বলেন, 'তাতে তোর কী রে ছোঁড়া? আমার সাধ হয়েছে ঘটা করে নাতির বে' দেবো, টুকটুকে নাত-বৌ আনবো, বেশ করবো।'

নাতি আরো মরিয়া হয়ে বলে, 'তা আমাকে নিয়েই তো ওই সব করতে চাইছ।'

'তা তোকে নে করবো না তো কি বেন্দা তেলিনীর নাতিকে নে করবো?'

'না না, ও সব করতে-টরতে পাবে না বলে দিচ্ছি - ' সোমনাথ প্রায় চেঁচিয়েই ওঠে।

কিন্তু তাতে তার বাপের মার বুক দমবে এমন ভাবার হেতু নেই। তিনি অবজ্ঞার সুরে বলেন, 'যা যা ছোঁড়া, বেশী ক্যাচ্ ক্যাচ্ করতে আসিস নে। যখন হুকুম করবো বাপের সুপুত্তুর হয়ে টোপর মাথায় দে চতুর্দোলায় উঠবি।'

সোমনাথ তবু গোঁ ভরে বলে, 'তার মানে তুমি চাও আমি এক-জামিনে ফেল হই?'

ঠাকুমা এখন রণমূর্তি ধরেন, 'কী বললি রে হোয়া ছোঁড়া? বে' দিলে তুই একজামিনে ফেল হবি? কেন বৌ এলেই বই কাগজ সব তার পাদপদ্মে বিসর্জন দিবি? বৌ থাকবে আমার মহলে, তোর ছায়া মাড়াতেও দেবো না, হলো তো?'

সোমনাথ এবার প্রায় কেঁদে ফেলে বলে, 'বন্ধুরা হাসছে—'

'হিংসেয় হাসছে।' ঠাকুমা বলেন, 'শুনছে তো তোর বড় জমিদারের ঘরে বে' হচ্ছে, পরমাসুন্দরী বৌ হচ্ছে, ঘটাপটা হচ্ছে, হিংসেয় জ্বলছে।'

সোমনাথ এবার শেষ চাল চেলে উঠে যায়, 'আর আমি যদি ওই সবের আগের দিন পালিয়ে যাই?'

'কী বললি? পালিয়ে যাবি? মহেশ্বরী বামনী কে চেনো না তুমি! পুলিসে হুলিয়া করে রেখে দেবো না? দেখি কোথায় পালাস।'

'ঠিক আছে, আমি তার মুখই দেখবো না।' বলে ঘর ছেড়ে চলে

যায় সোমনাথ নামের সেই বিব্রত বিপন্ন ছেলেটা। মহেশ্বরী দেবী তার পিছনে শেষ কথাটা ছুঁড়ে মারেন, 'দেখবো রে ছোঁড়া দেখবো। শেষ কালে সেই মুখই সার হবে।'

তা মহেশ্বরী দেবীর বাক্য যে বিফল হয়েছিল তাই বা বলা যায় কই? প্রথম তো—

একজামিনে ফেল হওয়ার কথাটা অলীক করে দিয়ে অতি ভাল করে জলপানি পেয়ে এনট্রান্স পাস করেছিল সোমনাথ তার পরের বছর। মানে যে বছর কনে বৌ ঘর বসতে এলো।....এবং কেমন করেই যেন বৌয়ের সঙ্গে দারুণ ভাবও হয়ে গেল সোমনাথ নামের ছেলেটার।

ভাবটা হলো কিন্তু সম্পূর্ণ একটি ঝগড়ার সুত্রে।

মহেশ্বরী দেবীর অগাধ প্রশ্রয়ে নাত-বৌ শুভঙ্করী 'বৌ-গিরির সমস্ত পাঠ (যা নাকি বাপের বাড়ী থেকে এক বছর ধরে পাখিপড়া করে মুখস্থ করে এসেছিল তা) সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে বাপের বাড়ির স্টাইলে দস্যি-দাস্যি করে বেড়ায়। যখন তখন মল বাজিয়ে ঝুম্‌ঝুম্ করে সিঁড়ি দিয়ে ওঠে নামে। 'ঠাকুমা, আচার! ঠাকুমা, আমসত্ত্ব'! বলে মহেশ্বরীর কাছে এসে দাঁড়ায়, এবং দৈবাৎ সোমনাথের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলেই মুখে ঘোমটা টেনে দেবার আগে একটু জিভ ভেঙিয়ে নেয়, নয়তো অলক্ষ্যে একটি কিল দেখায়।

কিন্তু সেকালের পটভূমিকায় মহেশ্বরী দেবীর নতুন বৌ সম্বন্ধে এতো প্রশ্রয় আশ্চর্য নয় কি?....এমন তো দেখা যেতো না তখন।

তা সত্যি দেখা যেতো না এমন, তবে ক্ষেত্রবিশেষে আবার এমন কোনো ব্যাপার ঘটতেও দেখা যেতো। হয়তো বা এর থেকেও তীব্র।

রহস্য আলাদা।

রহস্য পলিটিক্‌স্।

যেহেতু সোমনাথের মা ভার-ভারিক্কীর ভূমিকা নিয়ে নিজের এলাকায়

পেলেই বেটার বৌকে 'বৌ-গিরির নিখুঁত পাঠ শেখাতে বসতেন, সেই হেতুই মহেশ্বরী দেবী সেই বৌকে নিজের এলাকায় নিয়ে এসে সে সব পাঠ নস্যাৎ করার শিক্ষা দিতেন। এটা হয়তো একটা মজা, একটা কৌতুক, নিজের বেটার বৌকে জব্দ করার একটা অভিনব পদ্ধতি।

যেন, ওঃ ভারী গিন্নী হয়েছিস তুই, তাই বৌ-শিক্ষে দিতে আসছিস। দেখ তোর গিন্নীপনা আমি এক তুড়িতে উড়োতে পারি কিনা !....তোর বৌ তোর বশীভূত হয়, না আমার বশীভূত হয়, দেখ।

তা দেখা সহজেই যাচ্ছে।

দু' পক্ষের এই ঠাণ্ডা লড়াইয়ের বিষয়বস্তু তো সেই বছর নয়-দশেকের মেয়েটা। ধনী-ঘরের আদরের দুহিতা, বলতে কি সেখানেও নিজের ঠাকুমার অগাধ প্রশ্রয়েই মানুষ। কাজেই কার বশীভূত হবে সেটা তো প্রশ্নের অতীত।

অতএব বৌ শুভঙ্করী নিজের শাশুড়ীর ধারেকাছে ঘেঁষতে চায় না। নেহাৎ এসে দাঁড়াতে হলে অপ্রতিভ অপ্রতিভ মুখে কিছুক্ষণ থেকেই সুযোগ খুঁজে চম্পট দেয়।

ফুল্লকমল হচ্ছেন সাধারণ গৃহস্থের মেয়ে, গরিবই বলা যায় তাঁর বাপকে। স্বভাবতঃই তিনি এই জমিদার-কন্যা পুত্রবধূর কাছে ভিতরে ভিতরে নিজেকে একটু যেন ছোট বলে বোধ না করে পারেন না।

ওই একই কারণে প্রবলা শাশুড়ীর কাছেও তো প্রায় মশা-মাছির মতই থেকে এসেছেন চিরকাল।

এই দু'টো ব্যাপারের প্রতিক্রিয়ায় ফুল্লকমলের ছেলের বৌকে আয়ত্তে পেলেই আক্রোশ ছাড়া আর কোনো ভাব মনে আসতো না। এবং ব্যবহারে সেই ভাবটাই ফুটে উঠতো। যেটা শুভঙ্করীর কাছে আরো ভীতিকর হতো।

ফুল্লকমল এই দুঃখের জ্বালা যদি স্বামীর কাছে একটু প্রকাশ করতে পেতেন, তা হলেও বা কিছুটা সান্ত্বনা ছিল। কিন্তু সেখানেও গভীর

শূন্যতা। মেয়ে-ছেলেদের প্যানপ্যানানি শোনবার মত হালকা স্বভাবের লোক নয় ভবনাথ।

ফুল্লকমল যদি বলতেন, 'বৌয়ের আচার-আচরণ দেখছ?'

ভবনাথ গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলেছেন, 'সেটা কি আমার দেখার কথা?'

ফুল্লকমল শুষ্ক কমল হয়ে গিয়ে বলেছেন, 'তা জানি, দেখবার কথা আমারই—কিন্তু—'

ভবনাথ আরো গম্ভীর হয়ে বলেছেন, 'ভুল কোরো না বড়বৌ, মা থাকতে তোমারও দেখার কথা নয়।'

ফুল্লকমল তখন কষ্টে চোখের জল চেপে বলতেন, 'মা তো বরং আস্কারা দিয়েই মাথা খাচ্ছেন!'

ভবনাথ আরো গম্ভীর হয়ে বলেছেন, 'দেখা যাচ্ছে ওটাই মার ব্যাধি। একদা নিজের পুত্রবধূকে আস্কারা দিয়ে মাথা খেয়েছেন, এখন তোমার পুত্রবধূকেও—'

'নিজের পুত্রবধূকে?' ফুল্লকমল আর না পেরে যেন ফস্ করে জ্বলে উঠেছেন, 'আমায় আস্কারা দিয়েছেন মা?'

ভবনাথ উত্তর দিয়েছেন, 'দিয়েছেন বৈ কি। না দিলে কি আর মার সম্পর্কে এরকম উক্তি করতে সাহস হতো?'

নেহাৎ আলাপ-আলোচনাগুলো মধ্যরাত্রির পটভূমিকায়। তাই ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার উপায় থাকতো না। অতএব ফুল্লকমল পালঙ্ক থেকে নেমে এসে মাটিতে শুয়ে মাটি ভিজিয়েছেন।

কিন্তু ভবনাথের আচরণে বোঝা যায় না ঘটনাটা তাঁর জ্ঞানগোচরে ধরা পড়েছে। কারণ শয্যার অর্ধাংশের শূন্যতা সম্পর্কে যেন অনবহিত হয়েই গভীর ঘুমের তলায় তলিয়ে যান। তার সাক্ষ্য দেয় নাসিকাগর্জন।

অপমান অথবা অভিমানাহত ফুল্লকমল অবশেষে একদিন শাশুড়ীর ছেলের বদলে নিজের ছেলের কাছেই নালিশ জানালেন, 'আমি কি তোদের সংসারের দাসী-বাঁদী?'

বেচারী ছেলেটা হতভম্ব হয়ে তাকালো।

ফুল্লকমল বললেন, 'তোর বৌ আমায় এক ফোঁটা মানে না, আমার দিক ঘেঁষে না, ডেকে কাছে বসালে ছুতো করে উঠে যায়। এর কোনো বিহিত হবে না?'

কিশোর সোমনাথকে বিয়ে একটা দেওয়া হয়েছে বটে, এবং বিয়ের এক বছরকাল গেলে বৌকে নিয়েও আসা হয়েছে, তবু তাকে যে আবার এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে, তা কোনোদিন ভাবেনি।...কিন্তু তার পনেরো বছর বয়েসের তরল তাজা রক্ত তেতে উঠতে দেরি হয় না। রেগে উঠে বলে, 'আচ্ছা করে বকে দিতে পার না?'

মা ক্ষুব্ধ গলায় বলেন, 'কখন বকে দেবো? আমার দিকে এলেই তো তোর ঠাকুমা চর পাঠান আমি বৌয়ের কানে কী মন্তর দিচ্ছি জানতে।'

ফুল্লকমল যে নেহাৎ মোটা গেরস্ত ঘরের মেয়ে, তা তাঁর কথাবার্তার ধরনেই বোঝা যায়, যে ধরনটা তাঁর এই কিশোর পুত্রের কাছেও অপছন্দকর।

সোমনাথ সেই অপছন্দটিকে কণ্ঠস্বরে ব্যক্ত করে বলে, 'মন্তর-ফন্তর আবার কী? তুমি খুব করে বকুনি লাগাবে।'

'বকুনি লাগাবো? তোর ঠাকুমা টের পেলে হয়তো বৌয়ের সামনে আমাকেই গাল দেবেন।'

'তবে আর আমায় বলতে এসেছ কেন?'

ফুল্লকমল কাঁদো কাঁদো হয়ে বলেন, 'তোর গুষ্টির কাছেও বলতে পারো না, তোকেও বলতে পাবো না, তবে তো দেখছি আমার গঙ্গায় ডুবে মরাই ভাল।...তোর বৌকে তুই শায়েস্তা করতে পারবি না?'

সোমনাথ সহসা যেন একটা রাজসিংহাসনের অধিকার লাভ করে বসে! তার বৌকে সে শায়েস্তা করবে। এ কী অদ্ভুত আনন্দের বাণী!...সে অধিকার যদি তার থাকে তো ওই জিভ ভ্যাঙানোর শোধ নেওয়া যায় এক হাত।

কিন্তু—

একটা 'কিন্তু' এসে উৎসাহের আগুনে বরফ-জল ঢালে।

সেই জলঢালা গলায় বলে, 'আমি যে বকে দেবো, পাবো কোথায় ওকে শুনি? আমি কি ওর সঙ্গে কথা কই?' বলে খুব সন্তর্পণে একটি নিঃশ্বাস লুকোয় সোমনাথ।

সত্যি, এতোগুলো দিন হয়ে গেল বৌটা বাড়িতে এসেছে, অথচ সোমনাথ কোনোদিন তার সঙ্গে একটাও কথা কইবার কোনো সুযোগ পায়নি। মন খুবই উসখুস করে, তাছাড়া—বন্ধু-টন্ধুরা তো জিগ্যেস করে জ্বালিয়ে খায়, কিন্তু উপায় কী? কোথায় বা বৌ, কোথায় বা সোমনাথ।...মাঝে মাঝে কোনো একটা কারণ সৃষ্টি করে ঠাকুরমার এলাকায় পৌঁছে দেখেছে একগলা ঘোমটা দেওয়া একটা লাল নীল কি সবুজ শাড়ির পুটুলি পাকানো দৃশ্য। কিন্তু সে দৃশ্যের মধ্য থেকে হঠাৎ বেরিয়ে আসা দু'একটি আংটি পরা আঙ্গুল যেন বুকটাকে হিম করে দেয়, ভয়ে লজ্জায় দু'বার আর তাকাতে পারে না।

কিন্তু মজা এই, পুঁটুলিটি দিব্যি ডাকাবুকো, সে তার মধ্যেই নড়েচড়ে এবং সুবিধে পেলেই ঘোমটাটা একটু তুলে ধরে অনায়াসে জিভের ডগা দেখায়।

এই দুবিনীত ব্যবহারে মনের মধ্যে একটা অপমানের দাহ সৃষ্টি করে বৈ কি। সোমনাথও কোনো একদিন সুযোগ পেলে 'দেখে নেবে' এ ইচ্ছে আছে। আবার মাঝে মাঝে ঔৎসুক্যটাই জয়ী হয়, দেখার ইচ্ছেটার মধ্যে আক্রোশ আর আগ্রহ দুই-ই থাকে।....তবে সুযোগ কোথায়? ঠাকুমার এলাকায় ঠাকুমা সর্বদাই উপস্থিত, আর সোমনাথকে দেখতে পেলেই চালাক বুড়ী একগাল হেসে বলবে, 'কী রে? বুড়ীর খোঁজে, না ছুঁড়ির খোঁজে?'

সোমনাথ রেগে গিয়ে বলে ওঠে, 'এতো অসভ্য কেন তুমি?'

বুড়ী খলখলিয়ে হেসে ওঠে, বলে, 'সভ্য কী করে হবো বল? সায়েবের ইস্কুলে নেকাপড়া শিখেছি কি?'

'আহা সাহেবের ইস্কুলে না পড়লে আর সভ্য হতে নেই ?' বলে সোমনাথ মুখ লাল করে।

মহেশ্বরী বল্লেন, 'আচ্ছা বাবা, এই মুকে চাবি। তুমি ফুলের ধারে কাছে মৌমাছির মতন ঘুরঘুর করবে, আর আমার বললেই দোষ।'

সোমনাথ স্পষ্ট অনুভব করে তার এই দুর্দশায় পুঁটলির মধ্যে একটা চাপা হাসির উচ্ছ্বাস কিলবিল করে ওঠে। সোমনাথ অসহ্য রাগে সেখান থেকে সরে যায়।

এখন মা'র এই আদেশবাণীতে মনের মধ্যে রীতিমত একটি পুলক অনুভব করে সোমনাথ। মনের মধ্যে বেশ একটি বীরভাবেরও উদয় হয়। বেশ জোর গলায় বলে, 'আচ্ছা দেখে নিচ্ছি।'

বলেই হতাশ হয়, কোথায় দেখবে! হতাশ গলাতেই বলে, 'কখন যে বলবো! সব সময় তো ঠাকুমার কাছে বসে আছে।'

ফুল্লকমল নিঃশ্বাস ফেলে বলেন, 'সেই তো কথা। বড়মানুষের কন্যে বড় গাছে নৌকো বেঁধে বসে আছেন। তা হোক, তোর পরিবার তোর মাকে মান্য করবে না তুই তার শাসন করবি না? চিরদিন দেখে আসছিস তো আমি তোর ঠাকুমাকে কী রকম—'

কথার শেষটা আর উচ্চারিত হয় না, এক পশলা জল এসে কণ্ঠ রোধ করে দেয়।

সোমনাথ চমকে ওঠে। সত্যিই তো, ঠাকুমার সঙ্গে মার যা সম্পর্ক, সোমনাথের মায়ের সঙ্গেও তো সোমনাথের বৌয়ের সেই একই সম্পর্ক। তবে? মা যদি চিরদিন ঠাকুমার ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকেন, তো, তার বৌ-ই বা তার মার ভয়ে কেন কাঁটা হবে না?

নাঃ, এর একটা বিহিত করা দরকার।

আর সে বিহিত সোমনাথকেই করতে হবে। সোমনাথের মধ্যে থেকে 'স্বামী' আত্মপ্রকাশ করে।

সোমনাথ মনে মনে খসড়া করে, সেই বেয়াদব মেয়েটাকে কোন্

কোন্ কড়া ভাষায় সওয়াল করবে। প্রথমে কী বলবে? জিভ ভ্যাঙানোর কথাটা আগে বলে নিয়ে তৎপরে মা'র ব্যাপারটা তুলবে? না মা'র ব্যাপারটা মিটিয়ে নিয়ে, নিজের সংক্রান্ত কথা তুলবে?

ধর প্রথমেই কড়া গলায় বলে উঠল, 'দাঁড়াও, তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

তারপর?

তারপর সে যদি পালাবার চেষ্টা করে?

পালাতে দিলে তো চলবে না।

তবে কি দেখা মাত্রই বলবে, 'শোনো, পালাবার চেষ্টা কোরো না। তোমার কপালে অনেক শাস্তি আছে।'

তারপর?···

অনবরত ওই প্রশ্ন আর 'তারপরের' দোলায় দুলতে থাকে সোমনাথ নামের চিরদিনের নিঃশঙ্ক বেপরোয়া ছেলেটা।···কিন্তু সে সব তো হলো, কিন্তু আসামীকে পাওয়া যাবে কোথায়?

তা ভগবান বোধহয় তার অবস্থা দেখে সহায় হলেন একদিন।

পরীক্ষা হয়ে গেছে, স্কুলের বালাই নেই, নেই পড়ার বালাই। ভবনাথের আদেশ, এই অবকাশে পণ্ডিতমশায়ের কাছে কিছু সংস্কৃত শিখে নেবে। দিনান্তে একবার সেইটুকুই পাঠচর্চা। কাজেই ফাঁকা ফাঁকা দিনগুলোর মধ্যে এই এক অস্থিরতা ঢুকে পড়ায় সোমনাথ অকারণ বাড়ির এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াচ্ছিল। বেড়াতে বেড়াতে ছাদে উঠে এদিক সেদিক দেখতে গিয়ে হঠাৎ যেন পাথর হয়ে গেল।

বাড়ির পিছনে আমবাগানের মধ্যে সব থেকে কাছের গাছটাই ওটা কী? একটা ডাল থেকে নীচের দিকে ঝুলছে, এবং গাছটা সবেগে আন্দোলিত হচ্ছে।

ওই ঝুলন্ত জিনিসটা যে একখানা লাল ডুরে শাড়ির আঁচল সেটা বুঝতে বেশীক্ষণ লাগে না সোমনাথের। এ শাড়ি তার দেখা। চিন্তা মাত্র না করে তীরবেগে নীচে নেমে বাগানে গিয়ে পড়ে সে।

বাগানে নামার পর সোমনাথ গাছতলার কাছ বরাবর একটু গিয়েই থমকে দাঁড়ায়। ঝোঁকের মাথায় নেমে তো এলো, কিন্তু ওরকম কাপড় তো পাড়ার কোনো মেয়েরও হতে পারে। বাড়ির অন্য কোনো মেয়েরও হওয়া অসম্ভব নয়। কত সব মেয়ে বৌ তো আছে বাড়িতে, কে তারা সোমনাথ ঠিক জানেও না। অন্য কেউ লাল ডুরে কাপড় পরতে পারে না? তাঁতী কি ওই রকম কাপড় মাত্র একটাই বানিয়েছে?

সোমনাথ নিজেকে নিজে বলে, 'খুব তো চলে এলে, এখন যদি দেখে অন্য কেউ?'

তাহলে?....

সোমনাথ মনকে যুক্তি দিয়ে বোঝালো, তাহলেই বা কী? যেই হোক না কেন, কোনো গিন্নী-টিন্নি তো আর নয়? যে উঠেছে তাকে তো এই বলে বকে দেওয়া যাবে, মেয়েমানুষ হয়ে গাছে চড়াটা সভ্যতা নয়।

সোমনাথ গাছের একেবারে তলায় চলে আসে। দেখে গাছ আরো আন্দোলিত হচ্ছে। তার মানে যে উঠেছে, সে নেমে আসছে।....একটা পা আগে নামিয়ে দিচ্ছে।

সোমনাথের বুকটা ধড়ফড় করে ওঠে।

তাঁতী এক রকমের শাড়ি অনেক বানাতে পারে। ভগবান এ রকমের পা ক'টা বানিয়েছেন?

ধড়ফড়ে বুককে সামলে সোমনাথ টানটান হয়ে দাঁড়ায়।....প্রবল ইচ্ছে হচ্ছিল ওই নেমে আসা পা'টাকে চেপে ধরে। আসামীকে পালাবার পথ বন্ধ করে দিয়ে হাতেনাতে ধরে। নচেৎ মাটিতে পা দিয়েই তো দৌড় দেবে।

কিন্তু ধরতে বাধলো।

সোমনাথ না ওর স্বামী?

আর ওই পা ধরার ব্যাপারটাকে ওই পাজী মেয়েটা নির্ঘাৎ সবাইকে বলে দেবে। তার মানে ওই, পা ধরাটা লোকের মুখে মুখে 'পায়ে ধরায়' গিয়ে উঠবে।

মেয়েমানুষদের তো যত রাজ্যের আজেবাজে কথা নিয়েই কারবার। দেখেছে তো সোমনাথ ছোটবেলায়, ওঁরা যখনি গল্প জুড়বেন কুটনো ঘরে, কি রান্নাঘরের দিকে, শুনতে পাওয়া যাবে কাদের বৌ ঘোমটা কম দেয়, কাদের ছেলে দিনেরবেলায় বৌয়ের সঙ্গে কথা বলেছে, এই সব।.... বড় হয়ে অবধি অবশ্য সোমনাথ আর ওই অন্দরমহলের দিকে বিশেষ যায় না, এক খাবার সময় বাদে।

কিন্তু শৈশবের অবোধ চিত্তে যে কথা, যে দৃশ্য শুধু একটা অর্থহীন অস্ফুট আভাস রেখে যায়, সেটা তো বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে বোধের জগতে ধরা পড়ে।

অতএব ওই নিটোল ধবধবে পা'টাকে টেনে ধরবার অদম্য ইচ্ছেকে দমন করে সোমনাথ গলা মোটা করে বলে 'গাছে কে ?'

ব্যাস্, পা'টা মুহূর্তে আবার উঠে পড়ে। এবং লাল ডুরের আঁচলও সরসরিয়ে উঠে গিয়ে সবুজ পাতার আড়ালে আত্মগোপন করবার চেষ্টা করে।

গলা মোটা করবার চেষ্টা করলেও, মোটার ভিতরে কাঁপুনি ধরা পড়ে যায়।....কিন্তু না কেঁপেই বা যাবে কোথায় ?

এই মেঘ মেঘ দুপুরে, বাড়ির বাইরে এহেন পরিস্থিতিতে যদি হঠাৎ কেউ দেখে ফেলে সোমনাথকে।

কিন্তু যতই যা হোক, আসামীকে হাতের মুঠোয় পেয়ে ছেড়ে দিয়ে পালানোও তো যায় না।

কাজেই সোমনাথ এক মোক্ষম চাল চালে। গাছের কাণ্ডটাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে দারুণ ঝাঁকানি দিতে শুরু করে।

এই ভাবে গাছ ঝাঁকিয়ে বকুল শিউলি চাঁপা ঝরানো, অথবা কাঁচা আমের গুটি ঝরানো এ তো অভ্যস্ত ব্যাপার।

এ চালে কাজ না হয়ে যায় না।

দু' হাতের মুঠোয় একটা মোটা ডাল বাগিয়ে ধরে অপরাধিনী সর-সরিয়ে নেমে এলো।....নেমেই ছুট দেবার তাল করছিল, গাছকোমর-

বাঁধা আঁচলের যে কোণটা খুলে ঝুলে পড়ে তাকে এহেন বেপোট অবস্থায় ধরা পড়িয়ে দিয়েছে। সেই আলগা আঁচলটাকে সামলে নেবার ক্ষণিক মুহূর্তে ঘটে গেল এক বিপর্যয়।

চোর হাতছাড়া হয়ে যাবার ভয়ে সোমনাথ প্রায় পুলিসী ভঙ্গিতে তাকে জাপটে ধরে ফেলে।....কিন্তু সেও তো ক্ষণমুহূর্তের ব্যাপার, ধরেই ছেড়ে দিয়েছে এবং নিজেই প্রায় চোরের মানসিকতায় পৌঁছে গেছে।

তবু মুখে শক্তি থাকবার শক্তিটুকু কোনোমতে সংগ্রহ করে সোমনাথ অন্যদিকে তাকিয়ে গলা ভারী করে বলে, 'মেয়েমানুষ একা একা গাছে উঠতে এসেছ যে?'

নববধূর সঙ্গে এই প্রথম সম্ভাষণ!

মেয়েমানুষটি গাছে ওঠার আর গাছ থেকে লাফিয়ে নামার, এবং ক্ষণপূর্বের এক ভয়ংকর অভিজ্ঞতার চাপে হাঁপাচ্ছিল। এখন এই শাসন-বাক্যে সেই ওঠাপড়া করা বুককে কিছুটা সামলে নিয়ে তাকিয়ে বলে, 'তোমার তাতে কী?'

তোমার তাতে কী!

তোমার তাতে কী!

সোমনাথকে যে সহসা এতখানি অপমানকর প্রশ্নের সামনে দাঁড়াতে হবে, তা সে ভাবেনি। এ প্রশ্নে তার মেজাজ গরম হয়ে ওঠে, এবং একটু আগের অপরাধবোধ স্তিমিত হয়ে যায়। কড়া গলায় বলে, 'খুব যে সাহস দেখছি! আমার তাতে কী? বড় বাড় বেড়েছে তোমার দেখছি। এবার শায়েস্তা করা হবে, বুঝেছ?'

কিন্তু মেয়েটার প্রাণে বোধ হয় ভয়-ডরের বালাই নেই। না হলে এই রকম বেপোট অবস্থায় কিনা ফিক্ করে হেসে ফেলতে পারে!

হেসে ফেলে বলে কিনা, 'কে করবে শায়েস্তা? তুমি নাকি?'

এক লহমা আগে সোমনাথের মনে হচ্ছিল এই রকম হাসিকেই কি রূপকথার গল্পে 'হাসলে মুক্তো ঝরে' বলে, কিন্তু এখন ওই মুক্তোঝরা হাসি-মুখ থেকে এমন অবজ্ঞা-বাণী শুনে ওর রক্ত আগুন হয়ে যায়।

ক্রুদ্ধ গলায় বলে, 'করবোই তো। আমি তোমার স্বামী তা মনে রেখো।'

মেয়েটা এবার তার সেই লাল ডুরের আঁচলটুকু মুখে চাপা দিয়ে খুক্ খুক্ করে হাসতে থাকে। অর্থাৎ অত বড় একখানা জোর ঘোষণাকে সে হেসেই বরবাদ করে দেয়।

সোমনাথ মহা ফাঁপড়ে পড়ে যায়। ওদিকে প্রাণে ভয়, হঠাৎ যদি কেউ দেখে ফেলে! ইস্! ভাবলেই তো প্রাণ উড়ে যায়।....আবার এদিকে ওই বেয়াদব বৌকে কোনো রকম শায়েস্তা না করেই বা রণে ভঙ্গ দেওয়া যায় কী করে? .

তাড়াতাড়ি কিছু করার জন্যেই সোমনাথ ওর মুখের আঁচলটা সরাবার জন্যে দু' হাতে ওর দু'টো হাতই চেপে ধরে বলে, 'এতো হাসির মানে?....কী হয়েছে এতো হাসির?'

দু'টো হাতই আটক, ঘোমটা টানার উপায় নেই, অথচ তার সবটুকু খশে গিয়ে পুরো মুখখানাকে দৃশ্যমান করে দিয়েছে।....

সেই লাবণ্যময় মুখ, আর 'খঞ্জন গঞ্জন' দু'টি চোখের উন্মুক্ত দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে হঠাৎ যেন কেমন হতভম্ব হয়ে যায় বেচারা সোমনাথ।

আর এই বিকল মুহূর্তে মেয়েটা এক অসমসাহসিক ভঙ্গিতে বলে ওঠে কিনা, 'কই? কর শায়েস্তা?'

সোমনাথ যেন চোখে অন্ধকার দেখে।

এই বৌ হলো তার! একে নিয়েই ঘর করতে হবে তাকে?

এই বৌকে সে জীবনে কোনো দিনই শায়েস্তা করতে পারবে না, এমনি একটা আশঙ্কা যেন তার ভবিষ্যৎকে আচ্ছন্ন করে দেয়।

তবু সোমনাথ মুখে সাহস দেখাতে চেষ্টা করে। তাই গলার স্বরকে সাধ্যমত কঠোর করবার ভান করে বলে, 'এক্ষুণি তোমার হয়েছে কী, হবে। তোমার গাছে ওঠার কথা রাষ্ট্র করে দেবো, তখন বুঝবে মজা।'

বৌ অবজ্ঞায় ঠোঁট উলটে বলে, 'এই কথা! গাছে তো আমি রোজই উঠি।'

'রোজ ওঠো?'

'উঠিই তো! তোমার মতন গোবর-গণেশ নাকি?'

সোমনাথের মনে হয় এবার বোধ হয় রণে ভঙ্গ দেওয়াই উচিত। আর বেশীক্ষণ থাকলে মানমর্যাদার কিচ্ছু বজায় থাকবে না।...হায় হায়, খুঁজে খুঁজে কিনা এই রকম একটা বৌ নিয়ে আসা হয়েছে তার জন্যে! সভ্যতা নেই, ভব্যতা নেই, ভয়-ডর নেই, লজ্জা-শরম নেই। এ কী বিপদ সোমনাথের!

কিন্তু আর তো দাঁড়ানো যাচ্ছে না।

ভয়ে প্রাণ উড়ে যাচ্ছে।

ভগবান জানেন কেউ কোনখান থেকে দেখতে পাচ্ছে কি না! পেলে কি সে ভাবতে যাবে সোমনাথ বৌকে শাসন করতে এসেছে? নিশ্চয় ভাববে—ইস্। ছি-ছি!

অথচ মার অভিযোগবাণী ও নির্দেশনামা মনে পড়ে যাচ্ছে। তার উপর এই অপমানকর কথা!

স্কুল-মাঠের খেলার টীমে সে ফার্স্ট বয়, সাঁতার দিয়ে গঙ্গার এপার ওপার করতে পারে সে, ক্লাসে বরাবর মনিটার থেকেছে, আর এই বেহায়া মেয়েটা তাকে বলে কি না 'গোবর গণেশ'।

তাই সোমনাথ পিট্টান দেবার আগে তাড়াতাড়ি একটা যা তা কথা বলে বসে।

বলেই তো মাথা কাটা গেছে।

কিন্তু হাতের ঢিল আর মুখের কথা ফিরিয়ে নেবার তো উপায় নেই। অথচ বলে ফেলেছে, 'গোবর গণেশ! তোমায় এক হাতে তুলে ধরে আছাড় মারতে পারি তা জানো?'

এর বদলে যা ঘটবার ঘটে।

বৌ মুখে আঁচল গুঁজে উচ্চ হাসি রোধ করতে করতে বলে, 'এ মা! এই বীরত্ব! ছোটলোকেরা তো তাহলে খুব বীর। তারা তো রাতদিন বৌ ঠ্যাঙায়। আমাদের ওখানের পঞ্চা কামার—'

কিন্তু পঞ্চা কামারের কাহিনী শোনবার জন্যে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে নাকি সোমনাথ ?

সে তো যাকে বলে ত্বরিৎগতিতে হাওয়া।

প্রথম বাক্য বিনিময়ের নমুনা অথবা স্মৃতি এই।

অর্থাৎ ব্যাপারটা সোমনাথের পরাজয় দিয়েই সুরু।....

তদবধি ঘটনাটা প্রায় ওই পর্যায়েই এগিয়েছে।

যখনি যে ঘটনায় দু'জনে বাক্য বিনিময়ের সুযোগ পেয়েছে, (বলতে কি, মনে হতো, বৌ বুদ্ধি করে সুযোগ করে নিয়েছে) তখনি বাক্য বিনিময়টা বাক্য যুদ্ধে পরিণত হয়েছে, এবং সে যুদ্ধে সর্বদাই 'শুভঙ্করী' নামের ওই ধানী লঙ্কাটি বিজয়িনী হয়েছে।

যেমন আবার একদিন মায়ের কাছে ধিক্কার খেয়ে সোমনাথ আবার বৌ শায়েস্তার উদ্দেশ্যে ধরে ফেললো তাকে ছাদে।....

অবশ্য সোমনাথই আগে ছাদে উঠেছিল, 'আকাশ প্রদীপ' দেবার বাঁশ টাঙাতে। ছাদের আলশেয় মোটা মোটা লোহার আংটা লাগানো আছে, বাঁশও মজুত থাকে। তবু ভবনাথের নির্দেশ প্রথম সন্ধ্যায় অর্থাৎ আশ্বিন সংক্রান্তির সন্ধ্যায় এই পুণ্য কাজটি সোমনাথ নিজে হাতে করবে। নিতান্ত বাল্যকাল থেকেই এটি করে আসছে সোমনাথ। এবারেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

কিন্তু বাঁশে লাগানো কপিকলের দড়ি টেনে দীপাধারকে অনেক উঁচুতে তুলে দিয়ে যখন দড়ির শেষ প্রান্তটা আর একটা আংটায় বাঁধতে যাবে, যেন ভূত দেখে চমকে ওঠে।

আলশেয় ঠেশ দিয়ে বৌ দাঁড়িয়ে।

পরনে ঢাকাই শাড়ি, সর্বাঙ্গে গহনার ঝলসানি, প্রদোষের আধো আলো আধো ছায়ায় দেখাচ্ছে যেন দেবী প্রতিমার মত।

বুকটা ধড়াস্ করে ওঠে সোমনাথের।

বিরাট ছাতটার এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে আর কেউ কোথাও

আছে কি না!···সাদা-সাপটা সোজা একখানা ছাদ তো নয়, বাড়ির অনেক গড়ন অনেক ছাঁচ। ছাদেও সেই ছাঁচের বৈচিত্র্য।····কোনোখানে ছ'তিনটে পৈঁঠে উঠে গিয়ে খানিকটা বারান্দার মত, কোনোখানে তিন চারটে সিঁড়ি নেমে গিয়ে খানিকটা নীচু অংশ। ছোটদের লুকোচুরি খেলবার মত গোপন কোণেরও অভাব নেই।

সোমনাথ অহেতুক চাঞ্চল্যে সারা ছাদটা একবার ঘুরে নেয়, নাঃ কেউ কোথাও নেই। ভেবে পায় না এই অসমসাহসিনী সোমনাথ ছাদে আছে জেনেও কী করে একা চলে এসেছে! কিন্তু এসেছে যখন সোমনাথ কি ওকে একা রেখে পালিয়ে যাবে?

সোমনাথ কাছাকাছি এগিয়ে গিয়ে যেন গঙ্গাবক্ষে নৌকার শোভা দেখছে এইভাবে অন্যদিকে তাকিয়ে বলে ওঠে, 'একা একা ছাদে এসেছ কেন?'

বৌ যে কোনো একটা প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল তাতে সন্দেহ নাস্তি।···তাই না চমকে বলে, 'একা একা বাগানে যাওয়া বারণ, একা একা ওঠা বারণ, সারাক্ষণ কে আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরবে শুনি?'

সোমনাথ গম্ভীরভাবে বলে, 'বাপের বাড়ি থেকে তো একজন দাসী এনেছ।'

'কে? ভাবিনী পিসী? সারাদিন সেই বুড়ীকে নিয়ে ঘুরবো না কি?'

'বাড়িতে তো অনেক মেয়েটেয়ে আছে।' বলে সোমনাথ।

কিন্তু বলাবাহুল্য কথার জন্যেই কথা। একটা কিছু তো বলতে হবে। 'মেয়েটেয়ে' যে কারা তা কে জানে? সঙ্গে সঙ্গে বৌয়ের চটপট জবাব, 'কে? টুনু ঠাকুরঝি? লাবণ্য ঠাকুরঝি? লীলা ঠাকুরঝি? পটাই ঠাকুরঝিরা? তারা আমার সঙ্গে মিশতে চায় নাকি? কাছেই আসে না।'

কথাটা মিথ্যে নয়। এ বাড়িতে বরাবরই মূল মালিকের বংশধারা শীর্ণ, বাড়ি ভর্তি যে এতো লোক, সবই প্রায় দূরসম্পর্কিত আশ্রিত

পর্দায়ের। তাদের মেয়েরা মহেশ্বরীর নাতবৌয়ের সঙ্গে তেমন মেলামেশা করতে আসতে সাহসই পায় না। সমবয়সী গোছের হলেও।

কিন্তু কেন?

মহেশ্বরীর কি নিষেধ আছে?

তা তো নয়, তবু কোথায় যেন আছে বাঘের ভয়।

শুভঙ্করীর মধ্যে এ ভয়ের ছায়া নেই, তাই শুভঙ্করী প্রথম প্রথম ওদের সঙ্গে ভাব করবার জন্যে খুব চেষ্টা করেছে। হাতছানি দিয়ে ডেকে ডেকে কাছে আনিয়ে বলেছে, তোরা রান্নাবাড়া খেলিস না? পুতুলের বিয়ে দিস না? চড়ুইভাতি করিস না?'

কিন্তু উৎসাহব্যঞ্জক উত্তর পায়নি।

কেউ বলেছে, 'ছোটবেলায় খেলতাম,' কেউ বলেছে, 'চড়ুইভাতি করতে গেলে তো বড়দের কাছে সব চাইতে হবে,' কেউ বা বলেছে, 'আমার সব পুতুলের বিয়ে হয়ে গেছে।'

শুভঙ্করী তবু চেষ্টা ছাড়েনি, বলেছে, 'আহা, কী একেবারে বড় তুই? আমি তো খেলি,'....বলেছে, 'আচ্ছা বড়দের কাছে চাইবার ভার আমি নেবো'....বলেছে, 'আমার তো গাদা গাদা পুতুল, নে না বাবা তার থেকে। ছেলে, মেয়ে যা ইচ্ছে।'

বস্তুতঃ শুভঙ্করীর এটা চালের কথা নয়।

গাদা গাদাই আছে তার।

বিয়ের সময় এপক্ষ থেকে যে অধিবাস গিয়েছিল, তাতে খেলনা পুতুলের যে বিরাট বাহিনী দেওয়া হয়েছিল তা বলবার মত। মাটির, কাঠের, কাচের, পিতলের, কাপড়ের, হরেক রকম। তা ছাড়া—তার নিজস্ব যে বৃহৎ পুতুলের সংসারটি ছিল সেটি তার মা মেয়ের সঙ্গের দাসী ভাবিনীবালার কাঁখে চাপিয়ে দিয়েছিল রীতিমত একটি তোরঙ্গ সাজিয়ে।

শ্বশুরবাড়িতে এসেও শুভঙ্করী পিতৃগৃহের মতই খেলাঘর সাজাবার জন্যে একটি ঘর পেয়েছে। সেখানে পুতুলদের রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর,

খাবার ঘর, শোবার ঘর, গোয়াল ঘর, ঢেঁকি ঘর ইত্যাদি তাদের সর্ববিধ সরঞ্জামসহ দেদীপ্যমান।

সেই সব ছোট ছোট খাট আলনা দেরাজ সিন্দুক সম্বলিত খেলাঘর, এবং বিচিত্র কাপড় গহনা পুঁতির মালায় সুসজ্জিত পুতুলগুলির দিকে তাকিয়ে বাড়ির অন্যান্য শিশু বালিকাদের কি লুব্ধ দৃষ্টি প্রখর হয়ে ওঠে না?

তবু ডাকলে তারা তেমন ভাবে আসে না।

দরজার কাছে এসেই পালায়, অথবা একটু খেলেই বলে, 'যাই ভাই, মা বকবে।'....শুভঙ্করী অবাক্ হয়েছে, অভিমানাহত হয়েছে, ক্রুদ্ধও হয়েছে। ভেবে ভেবে কারণ খুঁজে পায়নি।....অবশেষে একদিন তার জ্ঞান-দৃষ্টি খুলে গেল। খুলে দিলেন, এক জ্ঞাতি ঠান্‌দি।

ঠান্‌দির নিজের নাতি-পুতির বালাই নেই। অতএব এ সংসারে কোনোপ্রকার স্বার্থ সংরক্ষণের দায়-ও তাঁর নেই। ঝাড়া হাত-পা মানুষ, খটখটে গড়ন, কটকটে কথা, প্রচুর গতর, প্রচুর শুচিবাই।

তা তিনিই একদিন শুভঙ্করীর বিস্মিত ম্রিয়মাণ মুখ দেখে বলে উঠলেন, 'মিথ্যে ওদের ডেকে ডেকে খেলাতে বসাতে চাও নাত-বৌ, ওরা ইদিক্ ঘেঁষবে না।'

শুভঙ্করী ভয়ে ভয়ে বলেছে, 'কেন?'

ঠান্‌দি কটকটিয়ে উত্তর দিয়েছেন, 'হিংসে হিংসে, আর কেন? তুই চব্বিশ ঘণ্টা গয়নায় অঙ্গ মুড়ে বসে থাকিস, এবেলা ওবেলা ঢাকাই জামদানী পরিস, দাসীতে গা মাজে, খিদমদগারি করে, আর ক্ষীর সর ছানা মাখন নিয়ে তামস্ত সংসারের সবাই তোর পিছু পিছু ছোটে, ওরা কি এ সবের নাগাল পায়? তাই হিংসেয় জ্বলে।...আবার হক্ কথা বললে বলতে হয়—নজ্জাও পায়। তোর নোখের কোণের যুগ্যি ভাগ্যিও নয়, রূপও নয়, নজ্জা আসারই কথা।'

চোখের সামনে থেকে একটা কুয়াশার পর্দা সরে গিয়েছিল শুভঙ্করী নামের সেই ন' বছরের মেয়েটার। আর সেটা সরে যেতেই নিজেই

লজ্জায় দুঃখে মরমে মরে গিয়েছিল। ছি-ছি! সত্যিই তো এদিক থেকে তো কোনো দিন ভেবে দেখেনি সে।....হতেই পারে ওদের এরকম! নিশ্চয় হতে পারে। হিংসেটিংসে নয়, ওই লজ্জাই।... আর কিনা বোকা শুভঙ্করী এক গা গহনা ঝল্‌সে, জরিদার শাড়ি পরে ওদের ডাকাডাকি করেছে 'খেলবি আয়' বলে।

সোমনাথ অবিশ্বাসের গলায় বলে, 'ওরা তোমার কাছেই আসে না?'

বৌ প্রায় দপ্‌ করে জ্বলে ওঠে। আব সেই জ্বলন্ত গলাতেই বলে, 'আসবে কেন শুনি? আমি আহ্লাদির মতন রাতদিন গয়না পরে, জরির কাপড় পবে সেজেগুজে বেড়াবো, ভাল পিঁড়িতে খেতে বসবো, ভাল পালঙ্কে শোবো, ওদের বুঝি মন খারাপ হয় না? আমার কত গাদা গাদা খেলনা পুতুল, ওদেব মাত্তর একটা দু'টো, তাও ভাল নয়, ওদের কেন আমার সঙ্গে খেলতে ভাল লাগবে শুনি?'

সোমনাথ অবাক্ হয়।

অবাক্ গলাতেই বলে, 'এ সব কথা তোমায় কে বলেছে?'

শুভঙ্করী উদাস উদাস গলায় বলে, 'কে আর বলবে? নিজে নিজেই ভেবে বুঝেছি।'

এখন প্রায় অন্ধকার নেমে এসেছে, সূর্যের শেষ-আলোর আভাসে শুভঙ্করীকে আর স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। শুধু ওর গায়ের নতুন সোনার বাহার একটু একটু ঝিলিক্ মারছে।....

সোমনাথের হঠাৎ মনে হয় এই মেয়েটা যেন বুদ্ধি বিচক্ষণতায় তার থেকে অনেক বড়। সোমনাথের মাথায় কি এ কথা আসতো? সত্যিই তো, এমন তো হতেই পারে!

সোমনাথকেও তো ছেলেবেলা থেকে এরকম পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছে।...সোমনাথ জমিদার বাড়ির ছেলে, বংশের একমাত্র ছেলে, তায় আবার রূপের কার্তিক ছেলে, তার সঙ্গে কার তুলনা? প্রায় এমনি একটা ভাব নিয়েই তার সহপাঠীরা খেলাধুলো করেছে।

তবে ভবনাথের বিচক্ষণতায় বাইরে ছেলের সাজসজ্জায় বাবুয়ানার ছাপ ছিল না। বাড়িতে সিমলে শান্তিপুরী ধুতি, চিকনের পাঞ্জাবি, বাইরে মোটা ধুতি মোটা কোট। ঠাকুমা বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি-প্রদত্ত শৌখিন সাজে সজ্জিত করে ঠাকুরবাড়িটাড়ি নিয়ে গিয়েছিলেন, বন্ধুরা দেখে ফেলে 'জামাইবাবু জামাইবাবু' করে ক্ষ্যাপানোয় বাড়ি ফিরে তাড়াতাড়ি সে সব ছেড়ে ফেলেছে।....

কিন্তু বেচারি নতুন বৌ!

তার তো আর তা করবার জো নেই।

সোমনাথ ওর অসুবিধাটা বোঝে। তবু মুখে তো হারবে না। তাই জোর দিয়ে বলে, 'তোমার যখন সবই এত গাদা গাদা, ওদের তো চারটি চারটি দিয়ে দিলেই হয়?'

বৌ ঝঙ্কার দিয়ে বলে, 'আহা, আমি যেন দেবার কর্তা? টুনু ঠাকুরঝির সঙ্গে গঙ্গাজল পাতিয়ে আমার একটা ঢাকাই কাপড় আর একটা আংটি দিয়েছিলাম বলে কত বকুনি খেলাম। টুনু বেচারি সুদ্ধ বকুনি খেয়ে মলো। রাগ দুঃখু করে ফেরৎ দিয়ে গেল।'

সোমনাথ উত্তেজিত গলায় বলে, 'কেন? তোমার জিনিস তুমি দেবে, তাতে কী? কে বকলো শুনি?'

শুভঙ্করী আস্তে বলে, 'অনেকে। নাম বলবো না। সবাই তো গুরুজন। আসলে মেয়েমানুষের সব কিছু নামেই নিজের, সত্যিকার নয়।'

সোমনাথ আর কথা বলে না।

ওই 'গুরুজন' শব্দটার মধ্যে সে সহসা এমন একখানি মুখ দেখতে পায়, যাতে আর কথা বাড়াতে সাহস করে না।

কিন্তু সেই বাবদই তো কাজ বাকী।

মার ধিক্কারবাণী মনে পড়লেই পৌরুষে ঘা মারে। অতএব সোমনাথ এই কথার সূত্রটাই ধরে ফেলে কাজে নামে। 'গুরুজনে তো তোমার ভারী ভয়?'

অন্ধকার ঘনীভূত হয়ে এসেছে, এখন আর কেউ কারো মুখ দেখতে পাচ্ছে না, তাই এ কথায় তার বালিকাবধূর মুখে যে ভ্রূকুটি ফুটে উঠলো, তা দেখতে পেল না সোমনাথ।

শুভঙ্করীর সেই মুখ থেকে উচ্চারিত হলো, 'গুরুজন কি ভূত? না বাঘ-ভালুক? যে ভয় করতে যাবো? ভক্তিমান্য জিনিসটা তাহলে আছে কী করতে?'

সোমনাথের আবার একবার নিজেকে ওর কাছে নাবালক নাবালক মনে হলো। তবু নিজেকে আত্মস্থ করে বললো, 'তা ভক্তিই বা কোথায়?'

সোমনাথের বালিকাবধূর উত্তর-প্রত্যুত্তর চটপট। সঙ্গে সঙ্গে জবাব, 'ভক্তি কি সত্যি একটা হাতে ধরবার মত জিনিস যে, কোথায় আছে দেখতে পাওয়া যাবে?'

সোমনাথ বুঝে ফেলল, এ মেয়ের সঙ্গে বাক্‌যুদ্ধে নামলে সোমনাথকে গো-হারান হারতে হবে। সোমনাথ তাই চট করে করে লাইন বদলালো। গলা গম্ভীর করে বললো, 'ব্যবহারেই বোঝা যায়।'

হঠাৎ ও পক্ষ স্তব্ধ।

সোমনাথ একটা কট্‌কটে কথা শোনবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল, তাই আশ্চর্য হল। একটু অপেক্ষা করলো, তারপর বললো, 'কই? জবাব নেই যে?'

অবস্থা একই।

সোমনাথের এখন বিপন্ন অবস্থা।

কিসের যেন অস্ফুট একটা ধ্বনি শোনা যাচ্ছে না?

সেরেছে!

এটা আবার কী?

সোমনাথ কি পালাবে?

তাই বা পারা যায় কী করে?

অগত্যাই কাছে এগিয়ে আসতে হয়। ব্যস্ত গলায় বলতে হয়,

'কান্নার কী হলো ? এই !'

নক্ষত্রালোকে দেখা যাচ্ছে আলশের কানায় মুখ গুঁজে দাঁড়িয়ে আছে বৌ। কারণ তার উচ্চতা তখন ওই পর্যন্তই। আলশের খাঁজে পা দিয়ে উঠে বুক চেপে মাথা না ঝোঁকালে বাইরেটা দেখতে পাবার ক্ষমতা নেই।

সোমনাথের প্রশ্ন কোনো কাজে লাগলো না।

শুধু ধ্বনিটা স্ফুটতর হলো।

পালিয়ে প্রাণ বাঁচাবার দুরন্ত ইচ্ছেটাকে প্রশমিত করে সোমনাথ এগিয়ে গিয়ে ওই কার্নিশে ঠেকানো মাথাটায় একটু আলতো নাড়া দিয়ে বলে ওঠে, 'কাঁদবার মতন কী বলেছি শুনি ?'

ওই হাতের স্পর্শে যাকে বলে তড়িৎস্পৃষ্টবৎ চমকে মাথাটা সরিয়ে নিয়ে বৌ কান্না-ভেজা গলাতেও দৃপ্তস্পর্শ এনে বলে, 'আমি যদি এত খারাপ তো তোমরা আমায় তাড়িয়ে দাও না। পাটুলিতে পাঠিয়ে দাও।'

এ-কী কথা !

সোমনাথও প্রায় কাঁদো কাঁদো, 'আমি কি বলেছি তুমি খারাপ ?'

'আবার কী করে বলতে হয় ? বেশ তো আমি পাজী, আমি ছাই, আমার ব্যাভার খারাপ, আমাকে রাখবার দরকার কি তোমাদের ? তাড়িয়ে দিলে তোমরাও বাঁচো আমিও বেঁচে যাই।'

তাড়িয়ে দিলে বেঁচে যাই !

কী জোরালো আর স্পষ্ট প্রকাশভঙ্গী !

সোমনাথের পৌরুষ আবার আহত হয়। এ অভিযোগ তো শুধু সোমনাথের কথার পিঠে কথা হিসেবে নয়, এতে যে এই রায়চৌধুরী বাড়ির অসম্মাননার আভাস।

ক্ষণপূর্বের অপরাধী ভাব পরিত্যাগ করে সোমনাথ শক্ত গলায় বলে, 'এ বাড়ি থেকে চলে যেতে পেলে তুমি বেঁচে যাও ?'

'যাই-ই তো !' বৌয়ের কান্না এবার উথলে পড়ে, সেখানে আমাকে

কেউ বকে না। সব্‌বাই ভালবাসে। এখানে কেউ—'

নাঃ, এই রকম উথলে পড়া কান্নার পর আর শক্ত হওয়া চলে না। অথচ কী যে চলে তাও তো বোঝা শক্ত! এদিকে একটা ব্যাকুলতা যেন ঠ্যালা মারছে। তাই বেচারি তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, 'আর এখানে তোমায় কেউ ভালবাসে না?'

'বাসে নাই তো। শুধু ঠাকুমা —'

কথা অবশ্য শেষ করতে পারে না, দুঃখের আবেগে কণ্ঠ রুদ্ধ।

কিন্তু শ্রোতার কণ্ঠও যে কী এক আবেগে রুদ্ধ।

তবু সে বলে ওঠে, 'আর কেউ না? বাঃ! বাড়ির সব্‌বাই-ই তো—ইয়ে আমিও তো—'

ন' বছরের প্রিয়ার প্রতি পঞ্চদশবর্ষীয় প্রেমিক পতির প্রেম নিবেদনের বহর আর কতটা হতে পারতো কে জানে! রসভঙ্গ হলো।

হাতের আড়ালে হাওয়ার ঝাপট্ বাঁচিয়ে একটা প্রদীপ নিয়ে ছাদে উঠে এলো ভাবিনী দাসী। শুভঙ্করীর বাপের বাড়ির ঝি।

বক্‌বক্ করতে করতে উঠে আসছে, 'খুঁকি! তুই এই টঙে উঠে এসে বসে আচিস? আর আমি তোকে গরু-খোঁজা করে খুঁজে বেড়াচ্ছি। এই ভর সাঁঝের বেলা, সংকারান্তির রাত, একনা একনা ছাতে এসে বসে থাকার কী দরকার রে খুঁকি?'

'একনা'ই বলে!

কারণ তার দৃষ্টিগোচরে ওইটাই পড়েছে। অপর ব্যক্তি তো ছাদের দরজার কাছে গলার শব্দ পেয়েই শিঙি মাছের মত পিছলে সরে গিয়ে ছাদে কোনো এক অন্ধকার কোণের আড়ালে আত্মগোপন করে বসে আছে।

দেওয়ালের আড়াল, তাই 'খুকি' কি উত্তর দিলো বোঝা গেল না। ভাবিনীর খরখরানিটাই শোনা যাচ্ছে। কিন্তু সে শব্দে কে কান দিচ্ছে? বুকের মধ্যে যে হাতুড়ী পেটার শব্দটা উঠছে, তাতেই তো আকাশ বাতাস ব্যাপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

'সে আজিকে হলো কত কাল, তবু যেন মনে হয় সেদিন সকাল।'

তারপর কত কত দিন কেটে গেছে কত আনন্দ মধুর উজ্জ্বল স্মৃতির সম্ভার রেখে রেখে।....বৌকে শাসন করা আর হয়ে ওঠেনি সোমনাথের। যখনি তাল ঠুকে শাসন করতে গেছে, তখনি কেমন করে যেন সেটা ভেস্তে গিয়ে 'ভাব' হয়ে গেছে। সেই 'ভাব' অবশ্যই বহুবিধ ছেলেমানুষী ঘটনার আবর্তে আবর্তিত।

সেই 'ভাব'ই কি ভালবাসা নয়?

ওই ছেলেমেয়ে দুটোর বয়েসের অঙ্ক কষে। তার সঙ্গে 'ভালবাসা' শব্দটা জুড়লে কি হাস্যকর হবে? হয়তো এ যুগ তাই বলবে, কিন্তু কচি মন কি ভালবাসার স্বাদ বোঝে না? ছোটবেলার মন তো ভালবাসা দিয়েই ভরা থাকে—স্বার্থবোধহীন ভালবাসা!

ছোটবেলার মন যদি ভালবাসার স্বাদ গ্রহণ করতে না পারে তো রূপকথার গল্পে আবিষ্ট হয় কী করে তারা? কী করে হয় অভিভূত? যেখানে রাজকন্যা আর রাজপুত্রের প্রেম আবেগ আকুলতা আর মিলন বিরহের চিরন্তন রসস্বাদ।

লজ্জা আর আকর্ষণ, এই দু'রঙা সুতোর টানা-পোড়েনে প্রথম জীবনের সেই দিনগুলির রঙিন ওড়না বোনা হতে থাকে।....আর সেই ওড়নার আবরণের আড়ালে অজ্ঞাতসারে তিল তিল করে সঞ্চিত হতে থাকে মধু, ভরে ওঠে সেই ভাণ্ড।

কিন্তু 'ভাব'টার বাইরের রূপ হচ্ছে স্রেফ ঝগড়া।

খেলা আর ঝগড়া!

খেলাও যত, ঝগড়াও তত।

খুনসুটির শেষ নেই।

যখন তখন মহেশ্বরীর দরবারে নালিশ, মহেশ্বরীকেই সালিশ মানা, মহেশ্বরীর এজলাসেই বিচার।

অপরাধের সঙ্গে সঙ্গেই নালিশ! 'ছাখো ঠাকুমা, আমার পাতানো

খেলাঘর ভেঙে দিলো…ছাখো ঠাকুমা, আমার পুতুলের চুল টেনে দিলো…ও ঠাকুমা, পুতুলের গিন্নী কুলের আচার রোদ্দুরে দিয়েছে, ও এক থাবায় খেয়ে নিলে।'

এমনি আরো কত কী। হরঘড়িই চলছে অপরাধ আর তার নালিশ। আরো কড়া অপরাধও থাকে…ঠাকুমা, কী বলছে শোনো। বলছে শুভঙ্করী না ভয়ঙ্করী।

সেকালের অন্তঃপুর।

শাশুড়ী দিদিশাশুড়ীকে 'আপনি আজ্ঞে' করার প্রচলন ছিল না, আর শুভঙ্করীর তো কথাই নেই, সে তো সোহাগী বৌ।…সেই বৌয়ের মুখ রাঙা, চোখে জল। তৎক্ষণাৎ অপরাধীকে গ্রেফতার করিয়ে এনে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়।

কিন্তু আসামী নির্ভীক।

উত্তর চটপট।

'যেখানে সেখানে খেলাঘর পাতলেই হলো?…ওর জন্যে একটা ঘর তো রয়েছে। দালানে কেন?'

ঠাকুমা জোর গলায় বলেন, 'ওর ঘর বাড়ি, ও যেখানে ইচ্ছে খেলাঘর পাতবে। সব সময় যদি ঘরের মধ্যে থাকতে ইচ্ছে না হয়।'

'মাথাটি খেও না ঠাকুমা, মাথাটি খেও না। এমনিতেই তো সাপের পাঁচ পা দেখছে। ওর ঘরবাড়ি?'

'একশো বার!'

শুভঙ্করী ঠাকুমার পিছনে। সেখান থেকে টিপে দেয়, আমার 'দুগ্‌গা'র চুল টানার কথাটা বল—'

ঠাকুমাকে অগত্যা বলতেই হয়।

শুনে আসামী উচ্চ রবে হেসে ওঠে, 'চুল? হাতে তো উঠে এল একটু কালো পশম। তাতেই দুগ্‌গাবালার মাথার চামড়া ছিঁড়ে গেছে?'

'গেছেই তো—'

পিছন থেকে অভিযোগ সোচ্চার, 'পুতুল বলে বুঝি মানুষ নয় ?'

ঠাকুমা বলেন, 'ওই শোন বলছে পুতুল বলে বুঝি মানুষ নয় ?'

'ওহো হো -এত বড় কথাটা ভুলেই গেছলাম। পুতুলকে মানুষ ভাবা দরকার। মাথায় মলম লাগাতে কবরেজ ডাকতে হবে ঠাকুমা ? বল তো যাই —'

'হাড় জ্বালাসনে খোকা !' মহেশ্বরীর উদাত্ত কণ্ঠ. 'ফের যদি শুনি বৌটাকে জ্বালাচ্ছিস, তোর বাপকে বলে দেবো।'

'বাবাকে ? হুঃ ! বলতে গেলে বাবা তোমায় পাগল বলবেন।'

'আচ্ছা দেখবো কী বলে। ওর পুতুল-গিন্নীর কুলের আচার খেয়ে দিয়েছিস কেন ?'

'কুলের আচার ? রাম বলো ! এইটুকুনই একটু পাথরের রেকাবি, তাতে আচার শুকোয় ?'

'সে ও বুঝতো। তোর সর্দারী কেন ? তুই ওর ঢেঁকিঘরের ঢেঁকি ভেঙে দিয়েছিস ?'

'তা দিয়েছি। একেই তো বুদ্ধির ঢেঁকি, আর ঢেঁকি নিয়ে খেলে কী হবে ?'

'ওরে আমার কে রে ? ও বুদ্ধির ঢেঁকি ? হুঁঃ, তোকে ও এ হাটে বেচে ও হাটে কিনতে পারে তা জানিস ?'

'ওই আহ্লাদেই থাকো। শুনেছিলাম সেখানে নাকি পাঠশালে পড়তে যাওয়া হতো। তা' সে সব বই শেলেট গেল কোথায় ? সমস্ত ক্ষণ তো ঢেঁকি নিয়ে আর হাঁড়িকুঁড়ি নিয়েই কাটছে।'

বলা বাহুল্য উপলক্ষ ঠাকুমা লক্ষ্যটা তাঁর আড়ালে অবস্থিত ক্রুদ্ধ নায়িকা। ক্ষ্যাপানোই আমোদ। ওটাই সান্নিধ্যলাভের উপায় আর কৌশল।

মহেশ্বরীই কি এটুকু না বোঝেন ?

নবীনরা চিরকালই প্রবীণদের 'অবোধ' ভেবে নিশ্চিন্ত থাকে, এবং প্রবীণরা চিরকালই 'অবোধের' ভানে সেটুকু উপভোগ করে। ওটুকুই

সম্মান রক্ষার আড়াল।

মহেশ্বরী তাই ওর কথার উত্তরে দৃপ্ত ঘোষণা করেন, 'পাঠশালে পড়তে যেতো এ কথা তোকে কে বলেছে র‍্যা ছোঁড়া? ও কী দুঃখে পড়তে যাবে শুনি? ওর বাপ বাড়িতে পাঠশালা বসায়নি বুঝি? সেখানেই অন্যের ছেলেমেয়েরা পড়তে আসে। ও নিজের বাড়িতে গ্যাঁট হয়ে বসে লেকাপড়া করেছে। ঘটক মশাই বলছিল, আর একটা দু'টো বছর পড়লেই ছাত্তরবিত্তি পাস করতো নাতবৌ।'

সোমনাথ বিদ্রূপের হাসি হেসে বলে, 'তা সেই কথাই তো হচ্ছে। কী হলো সে সব? কাজের মধ্যে তো খালি খেলা।'

মহেশ্বরী এখন পিঠে চিমটি খেয়ে খেয়ে বলে উঠেন, 'বেশ করবে খেলবে। বৌ মানুষ বেশী পড়ে কী করবে শুনি? বেটাছেলের মতন কাছারি সেরেস্তায় কাজ করতে যাবে?....তাই বলে তুই ওর নাম খাস্ত করবি?'

'নাম খাস্ত? সেটা আবার কী?'

'তুই ওকে বলিসনি শুভঙ্করী না ভয়ঙ্করী?'

'যা সত্যি তাই বলেছি।'

ঠাকুমা বলেন, 'এবার তুই পালা তো ছোঁড়া, চিমটি খেয়ে খেয়ে মলাম আমি।'

এ একটা তরফ।

আবার ও তরফেও ঘাটতি নেই।

'মা, আমার পড়ার ঘরের বইপত্র কে লণ্ডভণ্ড করেছে?'

ফুল্লকুসুম তাঁর ফুলু গালে হাত দিয়ে বলেন, 'ও মা, লণ্ডভণ্ড আবার কে করতে যাবে? করলে তোর আনাড়ী বৌই করেছে। ওকেই বলেছিলাম তোর ঘরটা গুছিয়ে রাখতে।'

'না না, আমার ঘর কারুর গোছাতে-টোছাতে হবে না—'স্বর উচ্চগ্রামে ওঠে, 'গোছানো না লণ্ডভণ্ড কাণ্ড!'

মা ব্যাজার গলায় বলেন, 'চব্বিশ ঘণ্টাই তো খেলা নিয়ে আছে, একটু আধটু কাজকর্ম শিখবে না?'

'শেখাওগে না তোমাদের বাটনা বাটা রান্না করা। মুখ্যুদের যা মানায়।' এ কথাটা সোমনাথ বলে গলাটা বেশ চড়িয়ে।

ফুল্লকুসুম জানেন এ সময়টা শাশুড়ী ঠাকুরবাড়িতে, তাই সতেজে আর সশব্দে বলেন, 'হুঁঃ! তা নয়। ঠাকরুণের সোহাগের নাত বৌকে যাবো রান্না বাটনা শেখাতে? তা হলে আমার ধুদ্ধুড়ি নেড়ে দেবেন না?'

চলে যান রাগ করে।

অতঃপর কোনো এক সময় দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর কোনো স্থানে চোখো-চোখি।...একজন দুষ্টু হাসি হেসে বলে ওঠে, 'কেমন জব্দ? যাও ঠাকুমার কাছে আমার নামে লাগাও?..জিভ ভ্যাঙাও? আর আসবে আমার সঙ্গে লড়তে?'

তৎক্ষণাৎ উত্তর আসে, 'আসবোই তো। যে আমার সঙ্গে লাগতে আসবে, তার সঙ্গেই লড়বো।'

এমনি ঠোকাঠুকি থেকেই বিদ্যুতের সৃষ্টি।

যে বিদ্যুৎ হঠাৎ হঠাৎ চোখের তারায় খুশীর চেহারা নিয়ে ঝিলিক্ দিয়ে ওঠে, মুখের হাসিতে ঝল্সে ওঠে।

অথচ ছেলেখেলাও বজায় আছে।

দৈহিক আকর্ষণের যে স্থূল হিসেব এ আকর্ষণ অবশ্যই সে হিসেবের কোঠায় পড়ে না, তবু সান্নিধ্যের সুখ আছে। 'ওই লোকটা আমার' এই মিষ্টি ভাবনার আস্বাদ আছে। আকর্ষণ তারই।

ক্রমশঃ খেলার ক্ষেত্রটা ক্ষুদ্র গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকে না, বিশেষ বিস্তার লাভ করে। পুতুলের বিয়ের উৎসবের বদলে উৎসব হয় ঠাকুরকে নিয়ে।

মন্দিরে গোপীনাথের যা যা হয়, তার সবই করা চাই নতুন বৌয়ের খেলার ঠাকুর নিয়ে। রথ, দোল, রাস, তুলসীবিহার, চন্দন যাত্রা, ফলদোল।....পৃষ্ঠপোষক স্বয়ং শ্বশুর ভবনাথ, আর পৃষ্ঠবল তৎপুত্র সোমনাথ।

এই ঠাকুর নিয়ে খেলার খেলায় বাড়ির ছোট ছেলেমেয়েগুলো আর দূরে সরে থাকছে না, এসে জুটছে। তাদের মাধ্যমে শ্বশুরের কাছে আবেদন। অতএব ইচ্ছাপূরণের পথ কুসুমাস্তীর্ণ! পূজোর প্রণামী আসে মোটা অঙ্কে।....গৃহিণীরাও এ খেলাকে স্নেহপুষ্ট করে তোলেন। কারণ বৌয়ের চিত্তবৃত্তি যে পুণ্য সঞ্চয়ের দিকে, এটি তারা বুঝে ফেলে প্রসন্ন হচ্ছেন। তাই 'নিরামিষ ঘর' থেকে ছোট ছোট নারকেল নাড়ুর সম্ভার আসে ছোট ধামা ভরতি হয়ে, আসে ছোট পরাত ভরতি হয়ে ক্ষুদে ক্ষুদে ক্ষীরের ছাঁচ।

আর প্রধান ভোগের জন্যে ছোট ছোট লুচি আর কুমড়োর ছক্কা' দই মণ্ডা তো আছেই তার সঙ্গে।

সাজসজ্জার পূর্ণ দায়িত্ব সোমনাথের।

সেটা সর্বাঙ্গসুন্দরই হয়। কারণ প্রকৃত গোপীনাথের উৎসবের সাজ-সজ্জার ব্যাপারে শৈশব-বাল্য থেকেই সোমনাথের অবদান থাকে রীতিমতই। খেলাঘরের ঠাকুরেরও তা থেকে কিছুর ব্যতিক্রম হয় না।

উল্লাস আনন্দে মুখরিত হয়ে ওঠে বাড়ি।

ভবনাথ স্নেহ-বিগলিত কণ্ঠে বলেন, 'মা আমার আনন্দময়ী।'

আনন্দময়ীকে ডেকে ডেকে বলেন, 'তোমার যা দরকার আমায় হুকুম করবে মা জননী, তোমার গোপীনাথও ফেলনা নয়।'

তা আনন্দময়ীর সে হুকুমে চক্ষুলজ্জার বালাই নেই।

কাজেই বিষ্টু ছুতোর এসে রথ বানায়, ঠাকুরের কাঠরা বানায়, সিংহাসন বানায়। হঠাৎ একদিন দেখা যায় বিষ্টু ঠাকুরের পালকি বানাচ্ছে। তার কারুকার্য দেখে তাক লেগে যায়।

সোমনাথ দাঁড়িয়ে পড়ে দেখেশুনে শুভঙ্করীর কাছ বরাবর এসে দুষ্টু হাসি চেপে বলে, 'মনে হচ্ছে সাপের পাঁচ পা দেখেছ।'

শুভঙ্করী এদিক ওদিক তাকিয়ে ঘোমটাটা একটু তুলে বলেন, কেন? কী অন্যায়টা করা হয়েছে?'

'বাবার মাথায় হাত বুলিয়ে দিব্যি একখানা পালকি বানিয়ে নেওয়া হচ্ছে।"

'বাঃ, গোপীনাথ চন্দন যাত্রায় পালকি চড়ে যান না?'

'তা বলে তোমার গোপীনাথও তাই যাবেন?'

'যাবেনই তো। নিজে বুঝি ছোটবেলায় বিষ্টুকে দিয়ে নৌকো বানিয়ে নাও নি? শুনি নি বুঝি?'

সোমনাথ কপালে হাত ঠেকিয়ে বলে, 'উঃ, সে কি এই রকম সহজে? বিষ্টুর বাড়ি গিয়ে গিয়ে ধর্ণা দিয়ে দিয়ে—'

'বাবাকে বললেই এক দণ্ডে হয়ে যেতো।'

'বাবা? হুঁঃ! আহ্লাদী বৌকে যে আশ্‌কারাটি দিচ্ছেন, বেচারা ছেলেটাকে তার অর্ধেকও দিতেন যদি!····কেবল উপদেশ, 'পড়ার সময় অন্য দিকে মন দিও না।'

'ঠিকই বলতেন। তুমি না বেটাছেলে!'

এই একটি যুক্তি আছে, শুভঙ্করীর।

বেটাছেলের সব হওয়া উচিত, বেটাছেলের সুখ-দুঃখ বোধ থাকা উচিত নয়, বেটাছেলের 'কষ্ট' হচ্ছে বলা লজ্জার কথা।

এই যুক্তির ধিক্কারেই বেশ দুরূহ দুরূহ কাজও করিয়ে নেয় শুভঙ্করী সোমনাথকে দিয়ে।···যেমন সেবার 'পৌষালীতে বনভোজনের আয়োজন' —পাড়াসুদ্ধু ছেলেমেয়েকে নেমন্তন্ন করে আসুক····সোমনাথ।

সোমনাথ কেন?

বাঃ, নয়ই বা কেন? একা টুনি কি অন্য কেউ গেলে কেউ মানবে? তা হলে শুভঙ্করীকেই ছেড়ে দেওয়া হোক ওদের সঙ্গে।····তা যখন দেওয়া হবে না, সোমনাথই যাক ওদের সঙ্গে।

আয়োজন হয়ে যায় বিরাট। শুধু ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকে না ব্যাপারটা। মাঝারিরাও নিমন্ত্রণ পায়। সেই যজ্ঞির দায় সামলায় শুভঙ্করী নামের পাকা গিন্নী মেয়েটা। বারবার রাঁধুনীকে সামাল দেয়, 'দেখো বাপু যেন দেরি হয় না, দেখো বাপু যেন কম-টম পড়ে না।'

খিদ্‌মদগার মারফৎ ফরমাস যায়, 'এই তোদের দাদাকে চুপি চুপি বলগে যা, গোয়ালাবাড়ি যেন খবর পাঠায় দই আরো দু হাঁড়ি বেশী লাগবে।....এই তোদের দাদাকে বলগে—ময়রার দোকান থেকে এক ঝোড়া জিলিপি ভাজিয়ে আনতে, লোকে তো এসেই খিচুড়ির পাতে বসে পড়বে না। প্রথমটায় একটু জল খাবে।'

সেই কোন্ ছোটবেলা থেকে এই ব্যবস্থাপনা শুভঙ্করীর।

বলা বাহুল্য দাদাবাবু এ নিয়ে যতই কথা কাটাকাটি করুক, হুকুমটা ঠিকই পালন করবে।

ভবনাথের জননী ছেলেকে ডেকে সগর্বে বলেন, 'দেখছিস, কী নিধি এনে দিয়েছি তোর ঘরে?'

ছেলে পুলকিত গলায় বলেন, 'দেখছি। বুঝছি নিশ্চিন্তি হয়ে মরতে পারবো। রায়চৌধুরী বাড়ির হাল ধরতে পাকা মাঝি এসে বসেছে।'

ফুল্লকুসুম কোনদিনই তেমন চৌকশ নয়, তাই ভাবনা ছিল 'মা গেলে কী হবে?' ভাবনাটা আর থাকছে না।...

রইলোও না ভাবনা।....কৈশোর কাল থেকেই শুভঙ্করী রান্নাবাড়ি আর ঠাকুরবাড়ি, ভাঁড়ার-ঘর আর খাবার দালানে পাক খেতে শিখল তাঁতীর মাকুর মত।....

ওখানে নাত-বৌ আছে?

যাক্ নিশ্চিন্দি।....

এদিকে শীত গ্রীষ্ম বর্ষা বসন্তের আবর্তনে কমলকলি দল মেলে মেলে

শতদল হয়ে ওঠে। কিন্তু তখন চলতে থাকে বিরহ দশা।····সোমনাথ কলকাতায় গিয়ে কলেজ হোস্টেলে ভর্তি হয়েছে। সোমনাথ একটি নামকরা ছাত্র হয়ে উঠেছে। জলপানি পেয়ে পাস করেছে।

যখন ছুটিতে বাড়ি আসে, তখন যে কম্পিত চিত্ত বধূ গভীর রাত্রে এসে ধরা দেয়, তাকে আর দীর্ঘদিনের পরিচিত সেই মেয়েটা বলে মনে হয় না। এ যেন সদ্য-পরিণীতা নবোঢা।

কী অপূর্ব রোমাঞ্চময় সেই দিনগুলি!

পদচারণা দ্রুত হয়ে উঠছে সোমনাথের।

ধীরে ধীরে যথানিয়মে সংসারের পটপরিবর্তন হয়েছে, পুরানোরা বিদায় নিয়েছে, নতুনরা সিংহাসনে বসেছে।

কিন্তু শুভঙ্করা নিজগুণে তার আগেই এ সংসারের সর্বময়ী হয়ে বসেনি কি!····কী অপরিসীম সেবা করেছে মহেশ্বরীর শেষকালে, কী অনলস সেবা করেছে ফুল্লকুসুমের দীর্ঘস্থায়ী রোগশয্যায়! তখন তাঁর উঠতে বসতে, 'হা বৌমা, জো বৌমা!' বিমুখ মন প্রসন্ন হয়ে অনবরত আশীর্বাদ করেছে ওই নতমুখী ধৈর্যশীলা সেবাপরায়ণাকে।

চিরমুগ্ধ সোমনাথও তো চিরদিন ওই শক্তিময়ীর কাছে কৃতজ্ঞ বিনম্র পরাজিত। তা পরাজিতই বৈ কি, তা নইলে সোমনাথকে দিয়ে এমন একখানা অদ্ভুত কাজ করবার সাধ্য আর কারো ছিল?

পায়চারি করতে করতে একবার ভ্রূকুটি করলেন সোমনাথ, অসহিষ্ণুতার চিহ্নস্বরূপ অধর দংশন করলেন।····

পণ্ডিত সমাজে সোমনাথের কত নামডাক, দেশের বিশিষ্ট এবং বিদগ্ধ জনেদের অগ্রগণ্যদের মধ্যে তিনি একজন। কত সম্ভ্রম কত খ্যাতি তাঁর কলকাতার নামকরা নাগরিকদের মধ্যে। যে কোনো বিশেষ সভা সমাবেশে সোমনাথ রায়চৌধুরীর কাছে আমন্ত্রণপত্র আসাটা অপরিহার্য।

যশ সম্ভ্রম মান খ্যাতি, ভাগ্যদেবতা দু'হাত ভরে দিয়েছেন। অথচ সোমনাথের জীবনের নিভৃততম স্থানে কী দুরপনেয় কলঙ্ক!

এক স্ত্রী জীবিতা থাকতে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করেছেন সোমনাথ। বয়সে অন্ততঃ কুড়ি বছরের ছোট একটা মেয়েকে। যদিও অনেক খুঁজে পেতে একটি বেশ বয়স্থা মেয়ে সংগ্রহ করেই স্বামীর জন্য মনোনয়ন করেছিলেন শুভঙ্করী, কিন্তু ওর চাইতে বড় আর জোটেনি।···

সোমনাথ সেই বিবাহ করতে বাধ্য হয়েছেন, যে সোমনাথের বহুবিবাহ নিবারণী সমিতির সদস্য তালিকায় স্বাক্ষর আছে। ওই সমিতির যখনই অধিবেশন বসে, সোমনাথকে গিয়ে সেই অধিবেশনে যোগ দিতে হয়, সকলের মাঝখানে বসতে হয়।

সোমনাথের এই নিভৃত পল্লীগৃহের সংবাদ কী শহর কলকাতার উত্তাল জীবনস্রোতের কাছে গিয়ে পৌঁছেছে?

সোমনাথ বুঝে উঠতে পারেন না।

কেউ তো কোনো কিছু বলে না।

হঠাৎ কোনো প্রশ্ন করে ওঠে না।

সোমনাথ তো যে কোনো জনসমাগমের মধ্যে গিয়ে বসলেই প্রতি মুহূর্তে প্রায় অপেক্ষাই করতে থাকেন, কোন্ দিক থেকে ব্যাঙ্গোক্তি বাণ নিক্ষিপ্ত হয়ে সোমনাথের উপর এসে পড়ে। কে কখন কোন্ দিক থেকে বলে ওঠে, 'কথাবার্তা তো পণ্ডিতের মত? কিন্তু ব্যবহার? সেটা কি ভূতের মত নয়?'

বলে নি কেউ কোনোদিন।

তবু আশঙ্ক'র কাঁটা বিঁধেই আছে।

এক এক সময় সংকল্প করেন, হঠাৎ কোনো একটা অধিবেশনে সবাইকে ডেকে নিজের জীবনের এই অবিশ্বাস্য গ্লানির সংবাদটি জানিয়ে দেবেন। বলবেন, "একদার ভুল আমায় অহরহ পীড়িত করে, গোপনতার গ্লানি কশাঘাত করে। এ সংবাদ জানিয়ে আমি এই সংস্থা থেকে বিদায় নেবো। অথবা আপনারাই আমায় বহিষ্কার করে দেবেন। সত্য গোপনের যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি পেয়ে হয়তো শান্তিই পাবো।"

কিন্তু বলতে গিয়েও বলতে পারেন না।

জিভের আগায় এসে যাওয়া কথা আটকে যায়। না, এ দুর্বলতা নিজের জন্য নয়, দুর্ব্বলতা সম্মুখে উপবিষ্ট শ্রোতৃমণ্ডলীর জন্য। কী সশ্রদ্ধ সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ওরা সোমনাথের দিকে। মনের জগতে কতখানি উচ্চাসন দেয়! যদি একটু কথা বলতে আসে কত বিনীত সমীহের সঙ্গে! সোমনাথ ওদের ওই পবিত্র সুন্দর হৃদয়ের ভাবমূর্তিটি নষ্ট করে দেবেন?

ওরা যে বড় বেশী আহত হবে।

সোমনাথের আকস্মিক সত্য প্রকাশের হাতুড়িটা ওদের বুকের উপর কী সজোরেই না আঘাত করবে! ওদের সেই আঘাতটা স্মরণ করলেই থেমে যান, বলতে আর পারেন না।....এও ভেবেছেন, তবে কি পত্রের মারফৎ জানিয়ে দেবেন? কিন্তু সে পত্র রচনা করবার ভাষা গোছাতে পারেন না। এত বড় পণ্ডিত হয়েও না।

অতএব দিনের পর দিন যায়।

আত্মগ্লানি বাড়তেই থাকে।..তবু যখন শহরের উত্তাল হাওয়া থেকে সরে এসে বাগবাজারের ঘাটে বাঁধা নিজস্ব নৌকোয় চড়ে বসেন, সর্বসন্তাপহারিণী গঙ্গার স্নিগ্ধ শীতল হাওয়া দেহ-মন জুড়িয়ে দেয়।

কিন্তু আজ একটু বেশী ক্ষুব্ধ হয়েছেন।

আজ শুভঙ্করীর সঙ্গে কিছু বোঝাপড়ার প্রয়োজন বোধ করছেন।

এতক্ষণ যে 'নবদুর্গা' নামক একটি পুতুলকে নিয়ে খেলছিলেন, সে তো নিতান্তই মানবিক করুণার বশে। কিন্তু কতক্ষণ পারা যায় করুণা করতে?

কলকাতা থেকে কত কথা নিয়ে এসেছেন, সে সব কি নবদুর্গার কাছে বলবার? কী বোঝে ও?

অথচ শুভঙ্করী!

সোমনাথ আর একবার ঠোঁট কামড়ালেন।

কিন্তু সত্যি, কোথায় শুভঙ্করী ?

বামুন মেয়ের তাড়নায় রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে সে যে দোতলার দালানে উঠে এলো, তারপর গেল কোথায় ?

শুভঙ্করীকে খুঁজতে শেষ পর্যন্ত আমাদের সেই ছাদেই উঠে যেতে হয়। যে ছাদের আলসের ধারে দাঁড়িয়ে ছিল নবদুর্গা, এই কিছুক্ষণ আগে।...অবশ্য নবদুর্গার বহু আগেই এ ছাদের অনেক স্মৃতি লেগে আছে শুভঙ্করীর জীবনের পাতায় পাতায়।

আশ্চর্য! শুভঙ্করীরও হঠাৎ আজ বহুদিন বিস্মৃত সেই আকাশ-প্রদীপ টাঙানোর দিনটা মনে পড়ে গেল।

এক একটা দিন, এক একটা ক্ষণমুহূর্ত কী অক্ষয় রেখায় মনের মধ্যে খোদাই হয়ে বসে থাকে।

সেই দিনটার কথা ভাবতে ভাবতে যেন জীবনের দিনগুলির গোটানো সুতোর গুলিটা খুলে ফেললেন শুভঙ্করী।

শুভঙ্করীর সেই নব যৌবনের দিনগুলির সুতো খুলতে খুলতে এগিয়ে যাচ্ছে পূর্ণ যৌবনের সমারোহময় পরিবেশে। কানায় কানায় ভরা মন: কিন্তু তারপর? তারপর যেন ভাঁটিয়ে আসছে সে দিন ...তা তখনকার দিনে ত্রিশ পার হলেই যৌবনের ভাঁটা পড়াই নিয়ম ছিল। কাজেই ততদিনে শুভঙ্করী সম্পর্কে সবাই হতাশ হতে শুরু করেছে।

আড়ালে আবডালে বলা ছেড়ে এখন সবাই মুখোমুখিই বলছে—'এত রূপ এত গুণ সবই ভস্মে ঘি! নিষ্ফলা গাছের আবার পাতার বাহার!' বলছে, 'কোলে কাঁখে দুটো বাচ্চা-কাচ্চা না হলে আবার মেয়ে জন্ম। ও তোমার রূপ গুণ, বিদ্যে বুদ্ধি সবই বেথা।'

কেউ কেউ আবার সহানুভূতিতে গলে গিয়ে পিঠে হাত বুলোনোর সুরে বলেন, 'আহা মা, একেই বলে সব থাকতে সর্বহারা। যে মেয়েমানুষ 'মা' ডাক শুনল না, তার তো জীবনই মিথ্যে। বাঁজা

রাজরাণীর থেকে বেটার মা হাড়িনীটারও জেবন গৌরবের।'

যাঁরা একটু উচ্চপদস্থ, তাঁরা রায়চৌধুরী বংশের ধারালোপ হওয়ার আশঙ্কায় কণ্টকিত হয়ে ইশারায় ইঙ্গিতে দত্তক গ্রহণের কথা তুলছেন।

না তুলবেন কেন?

যথানিয়মে বংশরক্ষার আশা আর কোথায়?

ন' বছরে বিবাহ হয়েছিল শুভঙ্করীর, দশ বছরে দ্বিরাগমনে এসেছে, তদবধি তো শ্বশুরবাড়িতেই স্থিতি। তেরো বছরেই তো প্রথম গর্ভ হবার কাল। স্বাস্থ্যবতী বাড়ন্ত গড়নের মেয়ে। বলে কত পটকা পটকা মেয়ে বারো বছরেই মা হয়ে বসছে। তা—তা যদি নাই হয়, চতুর্দশ বৎসর কালটা তো পূর্ণ বয়স। তবে? তারপর আরো চৌদ্দটা বছর পার হয়ে গেল। ত্রিশ বছরের কাছে বয়স নিয়ে আর অটুট যৌবন নিয়ে দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে বৌ, এ দৃশ্য কী চোখে সহ্য হয়? রুগ্ন-টুগ্ন হতো, তা হলেও বা মার্জনা ছিল।

এখনো কি লোকে 'বন্ধ্যা' বলে ঘোষণা না করে, নিত্য নূতন মাদুলি কবচের ভার চাপিয়ে চাপিয়ে আশার ছলনা নিয়ে বসে থাকবে? মাদুলি কবচ, ঢিল-বাঁধা, এ সব তো মনকে চোখ ঠারা।

অথচ ওই সুন্দর সুঠাম দেহবল্লরীতে বন্ধ্যার লক্ষণ কোথায়?...

গিন্নীরা নিজেরাই প্রশ্ন তোলেন, নিজেরাই উত্তর দেন।... বলেন, 'কোনোখানে তো বাঁজার লক্ষণ দেখি না, তবে ভেতরের কলকব্জার কোথায় কোন্ ঘাটতি, কে জানে। সবই তো ভগবানের খেলা।'

অতঃপর এই আলোচনা চলতে থাকে, আসামী পূর্বজন্মে কখনো ফলদানের ব্রত করেনি, তাই এজন্মে এমন নিষ্ফলা ভাগ্য।

উঠতে বসতে প্রতি মুহূর্তে ব্যক্তে অব্যক্তে এই দুরপনেয় অক্ষমতার অভিযোগ যেন উদ্যত হয়ে থাকে 'শুভঙ্করী' নামের গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিতা মহিলাটির উপর।

এই অতিথি অভ্যাগত আশ্রিত আমন্ত্রিত আর ঠাকুর দেবতা নিয়মকর্ম অধ্যুষিত বিরাট সংসারের একটি ছুঁচও যাঁর নখদর্পণে এবং

কজার মধ্যে, আর যেখানে তাঁর নিখুঁত নিপুণতার মধ্যে একটুকু ফাঁক খুঁজে পাওয়া যায় না, সেই মানুষটাকে পেড়ে ফেলে ধিক্কার দেবার এমন একটা সুবর্ণ সুযোগ কে ছাড়তে রাজী হবে?

প্রথম প্রথম হেসে উড়িয়ে দিয়েছেন শুভঙ্করী।

বলেছেন, 'হয়নি তাই রক্ষে! কোলে কাঁখে পিঠে বুকে ঝুলসে, এই রাজপুরীর সেবা চলতো কী করে? এ বেশ আছি বাবা! ঝাড়া হাত পা।'

কিন্তু বেশীদিন এ কথা বলা চললো না, কারণ অনেকের কাছেই সহজেই ধরা পড়লো কথাটায় অহঙ্কারের সুর আছে।

'বুঝলাম তুমি খুব কর্মিষ্ঠি, তাই বলে সংসারের এতোগুলো লোককে এতো নস্যাৎ করা? তুমি ক'দিন আঁতুড়ে ঢুকলে, অথবা প্রসব হতে বাপের বাড়ি গেলে, 'রাজপুরী'র রথ একেবারে অচল হয়ে পড়বে? সবাই মিলে চালিয়ে নিতে পারবে না?'

'আর মা ষষ্ঠীর কৃপায় দু'চারটে যদি হয়ই, মানুষ করতে লোক জুটবে না? মা লক্ষ্মীর ঘরে কবে কে ছেলেপিলে নিয়ে নাজেহাল হয়? দাসদাসীরা তবে আছে কী করতে? এক একটা বড় মানুষের ঘরে 'ধাইমা,' 'দুধমা'র মান্য আদর কত!

'আর তো কিছু নয়, এ এক চালাকি। নিজের অক্ষমতার ত্রুটিতে মরমে মরে না থেকে হেসে গা পাতলা করা!'

শুভঙ্করীর সামনে যাঁরা তাঁর রূপ গুণ, বিবেচনা বুদ্ধি, কর্তব্যজ্ঞান, গুরুজনে মান্য, দেবদ্বিজে ভক্তি ইত্যাদির প্রসঙ্গ তুলে বিগলিত হন, তারাই আড়ালে তাঁর দেমাক, তেজ, অহমিকা নিয়ে সমালোচনায় মুখর হন।

সে মুখরতা কি শুভঙ্করীর কান এড়ায়?

শুভঙ্করীর অটুট আত্মস্থতায় ফাট ধরে। শুভঙ্করী সোমনাথের

কাছে এক অদ্ভুত প্রস্তাবটি করে বসেন, 'তুমি আর একটা বিয়ে কর।'

প্রথমটায় শুনে হা হা করে হেসে উঠেছেন সোমনাথ, শুভঙ্করীর মাথার সুস্থতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে কবিরাজ ডাকতে চেয়েছেন, কিন্তু ক্রমশঃই উত্ত্যক্ত হয়ে গম্ভীর হয়ে গেছেন। প্রশ্ন করেছেন, শুভঙ্করী কি চায় সোমনাথ আর কলকাতা থেকে বাড়ি না আসেন ?

কিন্তু এতে শুভঙ্করী দমবেন ? তাঁর জীবনের এই কলঙ্ক কালিমা গায়ে মেখে থাকবেন ? লোকে বলছে না চাঁপদানীর রায় চৌধুরী বংশের ধারালোপ হতে বসেছে দেখেও যে মেয়ে গ্যাঁট হয়ে নিজের আসনে বসে আছে সবখানি জায়গা জুড়ে, একবার ভাবছে না, এর প্রতিকার দরকার ? তাকে কে নিন্দে না করবে ? বিবেক নেই ? লজ্জাশরম নেই ? এমন ধিক্কার নিঃশব্দে বসে বসে কত আর শুনবেন ? এই ধিক্কারই তো ক্রমশঃ সোচ্চার হয়ে উঠেছে। স্বামীর ভালমানুষীতে যে এতো আস্পদ্দা সেটা সবাই বুঝে ফেলেছে।

সোমনাথ বলছেন, 'রায়চৌধুরী বংশের যদি লোপ হওয়াই অদৃষ্টে থাকে, তুমি তাকে সামান্য ওই বালির বাঁধ দিয়ে রোধ করবে ?'

'অন্ততঃ চেষ্টা করেছিলাম, এই আত্মসন্তোষটুকু থাকবে।' বলেছেন শুভঙ্করী।

'ওইটুকুর জন্যে সমস্ত জীবনটা বিকিয়ে দেবার ইচ্ছে হচ্ছে ?'

শুভঙ্করী প্রশ্ন তুলেছেন, 'বিকোনো কেন ? আমার এই রাজপুরীর সংসার আমার হাত থেকে কাড়ে কে ?'

'এই সংসারটুকু বজায় থাকলেই তোমার সব থাকলো ?'

শুভঙ্করী এক অদ্ভুত আলো-জ্বলা হাসি হেসে বলেছেন, 'সেই সবটাই বা কাড়ছে কে ?'

'আমি একটা মানুষ রানীবৌ, তোমার শেলেটে কষে ফেলা অঙ্ক নয়।'

শুভঙ্করী তখন বোঝাতে চেষ্টা করেছেন—ব্যাপারটাকে এভাবে দেখছেন কেন সোমনাথ ? 'প্রয়োজনের খাতিরে কত কী-ই করতে

হয়। এটাকেও তাই ভেবে নিলেই হয়।'

'কিন্তু মুশকিল এই রানীবৌ, ব্যাপারটার মাল-মসলাটা ইট কাঠ চুন সুরকি নয়, তিনটে রক্তমাংসের মানুষ।···

তা শুভঙ্করীর ভাঁড়ারে কি এ কথা কাটানোরও যুক্তি ছিল না?··· ছিল! এমন কত গরীবের ঘরের মেয়ে আছে, যারা শুধু একটু অন্ন বস্ত্র আর আশ্রয় পেলেই কৃতার্থ হয়ে যায়।····তা এই রকম জোরালো আশ্রয়ের প্রতিশ্রুতি পেলে সে কন্যা তো কৃতকৃতার্থ হয়ে যাবে।

'গরিবের কন্যাদায় উদ্ধারও তো একটা পুণ্য।'

সোমনাথ বলেছিলেন, 'ওটা বহু বিবাহলোলুপ সমাজপতিদের তৈরি করা শাস্ত্র।'

'কিন্তু সেকালে তো পুরুষের বিয়ে করাটা একটা ধর্মই ছিল অর্জুন তাঁর দ্বাদশ বর্ষ ভ্রমণকালে যেখানে গেছেন একটা করে বিয়ে করেছেন।'

সোমনাথ রেগে বলেছেন, 'এই সব কুযুক্তি শিখবে বলেই কি তোমায় আমি যত্ন করে লেখাপড়া শিখিয়েছি? রামায়ণ মহাভারত পুরাণ উপপুরাণ পড়তে উৎসাহ দিয়েছি? অর্জুন আর যা যা করতে সক্ষম ছিলেন, সাধারণ মানুষের পক্ষে তা সম্ভব?'

তখন শুভঙ্করী যুক্তিহীন তর্কে নেমেছেন। 'আমায় সবাই ছি ছি করছে, এ আর সহ্য হচ্ছে না।'

'তোমার সহ্যশক্তিটা এতো কম, তা তো জানা ছিল না রানীবৌ! ওই তুচ্ছ কথাগুলোকে তুচ্ছ করতে পার না?'

এই 'রানীবৌ' ডাকটা মহেশ্বরীর অবদান। বাড়ির ছোট ছেলেমেয়েগুলোকে তিনি শুভঙ্করীর জন্য ওই ডাকটি শিখিয়েছিলেন। ····কিশোর বর বিদ্রূপের ছলে ওদের নকল করে বলতো, 'এই যে রানীবৌ!' 'আসতে আজ্ঞে হোক রানীবৌয়ের'—

তদবধি রানীবৌ।

শুভঙ্করী ক্ষুব্ধ হাস্যে বলেছিলেন, 'তোমাদের পুরুষ ছেলেদের জীবনের

সঙ্গে আমাদের মেয়েমানুষের জীবনেব কী আকাশ পাতাল তফাৎ, তা কোনোদিন ভেবে দেখেছ? তোমাদের জন্যে সমস্ত পৃথিবী আর আমাদের জন্যে গণ্ডি-কাটা এইটুকুন একটু জায়গা। মনে আছে—মা, মানে তোমার মা, মাঝে মাঝে বলতেন, "বিষ খেয়ে বিশ্বম্ভরী, সেই বিষেই গড়াগড়ি।" তখন কথাটার মানে বুঝতাম না, এখন বুঝি।'

'একটু উঁচুতে উঠতে ইচ্ছে করে না?'

সোমনাথ গম্ভীর হাস্যে বলেছিলেন, 'আমরা দু'জনেই কি দু'জনের জন্যে যথেষ্ট নয়? মাঝখানে যদি নাই এলো আর কেউ, ক্ষতি কী? …বয়েস হলে দু'জনে তীর্থ ভ্রমণ করে বেড়াবো—'

'আব বংশরক্ষা?'

'ধরে নেবো ওটা নিয়তি। পুনর্বিবাহেই যে সেটা রক্ষা হবে, তার নিশ্চয়তা কী?'

শুভঙ্করীর মুখ লাল হয়ে ওঠে, 'নিশ্চয়তা আছে কি নেই সেটাই তো দেখা দরকার। জেদের মূল উৎসই তো ওই।' শুভঙ্করীর কণ্ঠে জেদ। বাঃ তা হবে না কেন? আমি অপয়া, বাঁজা, নিষ্ফলা গাছ, তা বলে কি সবাই তাই হবে?'

এই শীত-দুপুরে ছাদের রোদহীন দিকের আলসেয় বুক দিয়ে দাঁড়িয়ে শুভঙ্করী সেই পুরানো ছবির অ্যালবামেব পাতা ওলটাতে ওলটাতে হঠাৎ যেন একবার কেঁপে উঠলেন।

এ কাঁপুনি কি শীতের হিমেল হাওয়ার জন্য? না আপন হৃদয়ের নিভৃত নির্জনতায় তুলে রাখা 'শুভঙ্করী' নামের সেই মেয়েটার অসততায়?

সত্যিই কি শুভঙ্করী সেই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে স্বামীকে পুনর্বিবাহে রাজী হতে পীড়াপীড়ি করেছিলেন? সত্যিই কি এই রায়চৌধুরী বংশেব বংশধারা লোপ পাওয়ার ভয়ে অমন আকুল হয়ে উঠেছিলেন?

একেবারে মনের নিভৃতে তাকালে কি তাই দেখা যায়?…নাঃ! মনের অগোচরে পাপ নেই, সেখানে চিন্তা অন্য। সেখানে—একটি কূট

আর পাপ চিন্তা কাজ করেছে। আসুক অন্য স্ত্রী।

দেখা যাক সে তার কতটা মহিমা দেখাতে পারে? যদি পারলো তো শুভঙ্করীর এই ধিকৃত জীবনের জন্যে তো মা গঙ্গা কোল পেতেই আছেন।

কিন্তু যদি সেও তার মহিমা দেখাতে না পারে? তাহলে তো মিলেই গেল অঙ্ক, পাওয়াই গেল প্রশ্নের জবাব।...অক্ষমতা শুভঙ্করীর নয়, অক্ষমতা—

উন্মুক্ত গঙ্গা-বক্ষের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ যেন ভারী অবাক হয়ে গেলেন শুভঙ্করী। শুধু এই জন্যে? ওই সন্দিগ্ধ মনের কূট প্রশ্নটার জবাব পাওয়ার জন্যে?

বিকিয়ে দিয়েছেন জীবনটাকে!

বিলিয়ে দিয়েছেন জীবনের সবখানি!

শুভঙ্করী কি পাগল?

কই, তাতেই বা কতটুকু লোকসান বাঁচলো?...কই কেউ তো শুভঙ্করীকে ডেকে বলতে আসছে না, 'মিথ্যে তোমার ওপর দোষ চাপাচ্ছিলাম আমরা। এখন তো বুঝছি—'

না তা কেউ বলছে না। শুধু বলছে—'সাত-সাতটা বছর কেটে গেল, নতুন বৌও তো বাঁজা তালগাছ হয়ে দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার মানে কপালে নেই! বংশটা লোপ পাওয়াই অদেষ্ট? পুষ্যিপুত্তুর নেওয়াই দরকার ছিল। তখনই যদি পুষ্যি নিতে রাজী হতেন বড়বৌমা, তাহলে আর বুকের ওপর কুলকাঠের আংরা বসিয়ে রাখতে হত না।'

কিন্তু ব্যাপারটা তো আর শুধুই শুভঙ্করীর নয়? সোমনাথেরও তো ভূমিকা আছে এতে। সোমনাথ কি এই চিরাচরিত অতি প্রচলিত প্রথাটিকে 'হাস্যকর অবাস্তব' বলে উড়িয়ে দেন নি? উত্ত্যক্ত হয়ে একবারও প্রস্তাব করলেও বলেন নি কি, কাদের না কাদের একটা ছেলেকে ডেকে এনে ফুল তুলসী দিয়ে পূজো করে ঘরে প্রতিষ্ঠা করলেই সে বংশধর হয়ে গেল? ছিঃ?'

শুনে অন্যেরাও 'ছিঃ' দিয়েছে।

এটা কি একটা 'নতুন ছিষ্টি'? আদি অন্তকাল ধরে এ ব্যবস্থা চলে আসছে না? তবে উনি পণ্ডিত হয়েছেন, কলকেতায় নাকি অনেক নাম ডাক, ওঁর ওপর আর কে কথা কইবে?

কিন্তু এ সব তো অনেক দিনের বাসী কথা। আজ অকস্মাৎ এই অনর্থ অসময়ে সেই বাসী কথাগুলো মনের মধ্যে ভিড় করে উঠে আসতে চাইছে কেন শুভঙ্করীর? ক'দিন বিরহের পরে স্বামী সন্দর্শনে আসার প্রাক্কালে?

'বিরহ' শব্দটা অবশ্য শুভঙ্করী সম্পর্কে প্রয়োগ করতে গেলে হাস্যকর, শুভঙ্করীর জীবনের বহির্দৃশ্যের সঙ্গে ওই শব্দটা কোথায় খাপ খায়?

কিন্তু বহির্জীবনের অন্তরালে?

তা সেখানে তো শুধু পাথর চাপিয়ে চাপিয়ে এই বৃহৎ সংসারের জাহাজী কারখানায় আবর্তিত হতে হতে বয়েসকালটাকে পার করে ফেললো শুভঙ্করী নামের মেয়েটা।

হঠাৎ একসময় চমকে উঠলেন শুভঙ্করী। এই সেরেছে! আমি এখন ছাদের আলসেয় বুক দিয়ে গঙ্গার শোভা দেখতে দেখতে হৃদয়-গঙ্গায় ডুব দিয়ে মরছি।....এতক্ষণে বোধহয় রান্নাশালে হল্লা উঠে গেল।....কতক্ষণ এসেছি তাও তো ছাই বুঝতে পারছি না।....মানুষটার খাবার সময় হয়ে গেল! কী মরণদশা ধরেছিল আমার!

হৃদয়বীণার বেজে ওঠা সূক্ষ্ম তারগুলি কানমলা খেয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল।

তাড়াতাড়ি নেমে এসে মাঝি-মাল্লাদের পাত পাতাবার ব্যবস্থা করে দিতে দিতে মানদা খুড়ীকে পাঠালেন সোমনাথের কাছে।....যেটা সোমনাথের কাছে অসহনীয় অপমানকর মনে হয়েছে।....কিন্তু শুভঙ্করীকে যে আজ ভূতে পেয়েছে। নইলে দোতলার দালানের শেষ প্রান্তে পৌঁছে সামান্য একটুকরো হাসির ধাক্কায় ছিটকে সরে গিয়ে একেবারে

ছাদে উঠে যান?····আর সময়ের আন্দাজ ভুলে গিয়ে স্মৃতির সাগরে ডুবে যান?

অন্য যে কোনোদিন হলে?

ওই দরজাটার শিকল নাড়তে মানদা খুড়ীর মত অবান্তর মানুষটাকে না পাঠিয়ে নিজেই তো জোরে জোরে নেড়ে দিয়ে বলে উঠতেন, 'রাইকিশোরী এবার কুঞ্জভঙ্গ হোক। শ্যামরায়ের কি বাক্য সুধাতেই পেট ভরবে?'

হ্যাঁ এই রকমই তো কথাবার্তা শুভঙ্করীর।

নবদুর্গাকে উপলক্ষ করে সোমনাথের উপরই কৌতুক-বাণ নিক্ষেপ। আজও তো সেই সুরে মন বেঁধে আসছিলেন! কিন্তু দরজার কাছাকাছি এসে সূক্ষ্ম একটু হাসির সুর যেন ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলো।

মানদা খুড়ী ভগ্নদূতের ভূমিকা নিয়ে এসে উদাস গলায় বলে উঠলেন, 'ভাসুরপো জবাব দিয়ে দিয়েছেন, খাবেন না! বেলা হয়ে গেছে।'

শুভঙ্করী ওই কুটিল উদাস মুখটির দিকে একবারও না তাকিয়েই মুখচ্ছবিটি সম্পূর্ণ দেখতে পেলেন, অতএব আত্মস্থই থাকলেন। চমকালে চলবে না, তাহলেই তো মহিলাটিকে কিছু মন্তব্য প্রকাশের সুবিধা দেওয়া হবে।

তাই অবলীলার ভঙ্গীতে বললেন, 'শোনো কথা! এমন বেলা তো কদিনই হয়। অসময়ে বেলের শরবতটা না দিলেই হতো ছাই! বেল বড় ভার করে! ভালবাসেন, তাই ভাবলাম—যাই দেখি গে—'

এবার সেই ছোট সিঁড়ি দিয়ে সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যেই।

ঘরে পা দিয়েই শুভঙ্করী থমকে দাঁড়ালেন।

কেউ কোথাও নেই!

শীত দুপুরের উড়ো উড়ো ঠাণ্ডা হাওয়া শূন্য ঘরে ভেসে আসছে খোলা জানলা দিয়ে। এ ঘরে যে দিকের বাতাসই আসুক, গঙ্গার স্পর্শবাহী। তাই অধিক শীতল।

ওঃ বারান্দায় পায়চারি করা হচ্ছে।

ওই যে একটি দীর্ঘ ছায়া একবার ঝল্‌সে গেল।

ঘর পার হয়ে বারান্দার দরজার কাছে এসে দাঁড়ালেন। শুভঙ্করী কথা বললেন না। মুখের রেখায় মৃদু হাসি।

সোমনাথ পায়চারি করতে করতে যখন ঘুরলেন, দেখতে পেলেন।.... পেলেন বটে, কথা বললেন না। যেমন দুই হাত পিঠের দিকে একত্র জড় করে মুঠো বেঁধে পাক খাচ্ছিলেন, তেমনি পাক খেতে লাগলেন।

শুভঙ্করী একটু অপেক্ষা করে বললেন, 'অত রোদে কেন? এই শীতের বেলাতেও ঘেমে গেছ!'

সোমনাথ তো আর ছেলেমানুষের মত 'কথা বন্ধর' পথে অভিমান প্রকাশ করতে যাবেন না, তাই উত্তর দিলেন। শান্ত গম্ভীর গলায় বললেন, 'বাতাসটা ভাল লাগছে।'

শুভঙ্করী মৃদু হেসে বললেন, 'সে তো দেখতেই পাচ্ছি। মনে হচ্ছে বাতাস খেয়েই পেট ভরে যাচ্ছে। কিন্তু আর সকলের তো তা নয়? চলো খেতে দেওয়া হচ্ছে।'

সোমনাথের প্রশান্ত গৌর ললাটে একটি রেখা পড়ে। তবু তেমনি শান্ত গম্ভীর ভাবে বলেন, 'মানদা খুড়ীকে তো বলে দিয়েছি—'

শুভঙ্করী কপালের উড়ন্ত চুলগুলোকে হাত দিয়ে উলটে উলটে মাথার ঘোমটার মধ্যে চালান করতে করতে বলে ওঠেন, 'যেটা খুড়ীকে বলেছ, সেটাই শোনবার জন্যে তো শুভঙ্করী বামনী আসেনি।'

সোমনাথ বললেন, 'নতুন কিছু বলবার নেই।· ক্ষুধার অভাব বোধ করছি।'

শুভঙ্করী হঠাৎ দুই হাত উলটে বলে ওঠেন, 'সেরেছে! আমার যে এদিকে খিদেয় প্রাণ যাচ্ছে।'

সোমনাথ থমকে তাকিয়ে বলেন, 'তোমাকে খেতে নিষেধ করছে কে?'

শুভঙ্করীর কৌতুকে নাচা চোখে আলোর ঝিলিক, 'কে করছে নিজেই বোঝো।'

এই এক অপরূপ সুন্দর চোখের গঠন শুভঙ্করীর।····টানা টানা পদ্মপলাশের মত নয়, যেমন চোখের অধিশ্বরী নবদুর্গা। পল্লবভারে অবনত বড় বড় সেই চোখ দু'টি যেন কবিতার নায়িকার চোখ।

শুভঙ্করীর ঠিক তার বিপরীত।

গৃহিণী শুভঙ্করীর চোখজোড়া আজো যেন একটা দুষ্ট দুরন্ত চপল মেয়ের চোখ। এই চোখকেই বোধ হয় কবির বর্ণনায় 'খঞ্জন গঞ্জন আঁখি' বলে। সে চোখ সব সময় কৌতুকে নাচে। বাড়ির একটা রাখাল ছেলেকে খাওয়াতে বসিয়েও শুভঙ্করী যখন বলেন, কী রে এক্ষুনি 'আর না আর না' করছিস যে? পেট সত্যি ভরেছে, না 'পেটে খিদে মুখে লাজ?' তখনও তাঁর চোখ এমনি নাচে।

কপালের উপর সদা উড়ন্ত ঝুরো চুলের নীচে ওই চোখ, যেন শুভঙ্করীর মুখে বয়েসের ছাপ ফেলতে দেয় না। অথচ সেই কোন কাল থেকে কর্ত্রীর যাবতীয় গুরুভার বহন করে আসছেন।

সোমনাথ ওই কৌতুকোজ্জ্বল মুখ চোখের থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে বলেন, 'এক জনের অসুখ করলে বা অক্ষুধা থাকলে, আর একজন খাবে না, এটা কোন্ শাস্ত্রে লেখা আছে?'

শুভঙ্করী হেসে উঠে বলেন, 'শাস্ত্রকথার আমি কী জানি? মুখ্যু মেয়েমানুষ।'

'তাহলে?'

'তাহলে আবার কী? সব কথাই কি শাস্তরে লেখা থাকে? না, মানুষ সব কাজ পুঁথি পড়ে করে? অন্ততঃপক্ষে মেয়েমানুষ তা করে না বাবু।'

সোমনাথ ভারী ভরাট গলায় বলেন, 'তা বটে। অন্ততঃপক্ষে তোমার বিবেচনায় মেয়েমানুষের পুরোমাত্রায় অশাস্ত্রীয় কাজের অধিকার আছে।'

'অন্ততঃপক্ষে' শব্দটায় জোর দিলেন সোমনাথ শুভঙ্করীর উক্তি বলে।

শুভঙ্করী হঠাৎ দু'হাত জোড় করে বলেন, 'তোমার সঙ্গে তর্কে নামি

এতো কি সাধ্যি আমার? ঘাট মানছি অপরাধ হয়েছে, এখন চলো। দোহাই তোমার পাঁচ জনের সামনে আমায় অপদস্থ কোরো না।'

সোমনাথ ক্রুদ্ধ ছিলেন, হঠাৎ সে ক্রোধের প্রকাশ দেখতে পাওয়া গেল। সচরাচর যেটা দেখতে পাওয়া যায় না। মুখের রং আগুনের মত লাল হয়ে ওঠে, চোয়ালের পেশী শক্ত দেখায়। বলে ওঠেন, 'তা বটে! সব সময় সেটা দেখে চলতে হবে আমায়! আর অপদস্থ হবার জন্যে মজুত থাকবে সোমনাথ রায়চৌধুরী!'

শুভঙ্করীর মুখের রং ফ্যাকাসে হয়ে যায়। শুভঙ্করী একটুক্ষণ চুপ করে মাটির দিকে তাকিয়ে থেকে আস্তে বলেন, 'আচ্ছা, তাহলে থাক। বামুন মেয়েকে বলিগে—'

কথাটা শেষ হয় না, মাথার কাপড়টা আর একটু টেনে চলে আসতে উদ্যত হন শুভঙ্করী।

নাঃ, এই ফ্যাকাসে হয়ে আসা মুখের কাছে পরাজিত না হয়ে উপায় নেই। সোমনাথের গম্ভীর কণ্ঠ থেকে দ্রুত উচ্চারিত হয়, 'থাক, আর বামুন মেয়েকে বলতে যেতে হবে না। অনর্থক কথা সৃষ্টি। অন্ন করে দিতে বলগে।'

শুভঙ্করী একবার তাকালো, সকৃতজ্ঞ দৃষ্টি। কথা বলেন না। সোমনাথ বল্লেন, 'এখন অসময়, পরে তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে আমার।'

শুভঙ্করী সাবধানে বলেন, 'সে তো আমারও ছিল। সেরেস্তার কত কাগজপত্র এসে রয়েছে সই হবার জন্যে—'

সেরেস্তার কাগজ!

সোমনাথ এখন একটু গম্ভীর হাসির সঙ্গে বলেন, 'ও সব তো আমার থেকে তুমিই ভাল বোঝো।'

'আহা! আর কিছু না। নায়েবমশাইয়ের খেয়ে দেয়ে কাজ নেই তাই আমার কাছে এনে এনে ধরে দেন।'

'সে তো আজ নয়', সোমনাথ শান্ত গলায় বলেন, 'বাবা বেঁচে

থাকতেই তো নিজে হাতে করে তোমায় সব শিখিয়ে দিয়ে গেছেন। জেনেছিলেন—তাঁর এই অপদার্থ ছেলের দ্বারা বিষয় আশয় রক্ষা হবে না।'

শুভঙ্করীর চোখ দু'টো আবার নেচে ওঠে। বলেন, 'অপদার্থ কী আবার! ছিঃ! বল যে এই মহা পণ্ডিত মহা উদার ছেলের দ্বারা হবে না। তা সত্যি, সেটা জেনেছিলেন। সব সময় আমায় বলতেন, 'মনে রেখো মা, ওর মন বিদ্যা আহরণে যেমন উন্মুখ, বিত্ত আহরণে তেমন নয়। কিন্তু বিত্তকে তো তুচ্ছ করা চলে না? যে কোনো মানসিকতায়ই বিত্তের প্রয়োজন; দান ধ্যান ধর্মকাজ বিত্ত ব্যতীত কিছুই হবার নয়, অতএব তোমাকেই সব বুঝে নিতে হবে।'

'তা সে তো ভালই নেওয়া হয়েছে, আবার আমায় জ্বালাতন কেন?'

'বারে! সই-সাবুদগুলো কে করবে শুনি?'

সোমনাথ একটু তাকিয়ে দেখে মৃদু হাস্যে বলেন, 'ভাবছি, ওটাও যাতে তোমার উপর দিয়ে হতে পারে, তার ব্যবস্থা করে দিই।'

শুভঙ্করী ঈষৎ চমকান।

শঙ্কিত গলায় বলেন, 'তার অর্থ?'

'অর্থ আর কিছুই নয়। রায়চৌধুরীদের যাবতীয় বিষয় আশয়ের একচ্ছত্র মালিকানী হবেন শুভঙ্করী দেবী।'

শুভঙ্করী হেসে ফেলে, 'এটা বেশ ভাল সংকল্প। দেখো যেন মতলব জুড়িয়ে যায় না। শুনে যা আহ্লাদ হল! চলো এখন ভাতটা জুড়োচ্ছে।'

এবার সত্যিই নেমে যান।

সোমনাথও যান, তবে ওই ঘরের মধ্যেকার সিঁড়ি দিয়ে নয়, আবার বড় দালান পার হয়ে বড় সিঁড়ি দিয়ে। স্ত্রীর পিছু পিছু নেমে যাওয়া লজ্জার কথা।

নীচের তলায় গোয়ালবাড়ির সামনে আর ঢেঁকি ঘরের চাতালে

দু'প্রস্থ লোকের পাত পড়েছে। উচ্চবর্ণেরা ওদের সকলকে নমঃশূদ্র নামে একই বর্ণে অভিহিত করলেও, ওদের মধ্যেও শ্রেণীভেদ আছে বৈকি। পালকি বেহারারা নিজেদেরকে নৌকা-চালকদের থেকে উচ্চ পর্যায়ের বলে মনে করে, লেঠেল বাগদীরা বেগার-খাটা পাইক বাগদীদের নীচু চক্ষে দেখে, কাজেই সকলের জন্যেই বিভাগীয় ব্যবস্থা। কেউ না ক্ষুণ্ণ হয়। পাত তো পাততেই হবে সবাইকে।

সোমনাথ নেমে এসে দু'-বিভাগই পর্যবেক্ষণ করে মিষ্ট ভাষণে বলেন, 'কীরে বাবা সকল, খেতে বসেছিস? খা, লজ্জা করিসনে।'

কর্তার এই মহানুভব কথায় সকলে সমস্বরে যা বলে ওঠে, তার নির্যাসটুকু হচ্ছে বিগলিত কৃতজ্ঞতা। এ বাড়িতে আবার লজ্জা? তাহলে তো আকাশের ভগবানকেও লজ্জা করতে হয়। রানীমা তো সাক্ষাৎ ভগবতী।

সোমনাথের হৃদয়ের গভীর তল থেকে একটি দীর্ঘশ্বাস উঠলো।

হতভাগ্য সোমনাথ এই আনন্দলোক থেকে নির্বাসিত। 'ভগবতী'র অকরুণা তাকে এই নির্বাসন দণ্ড দিয়ে রেখেছে।

সোমনাথ আহারে বসতেই শুভঙ্করী হাতের পাখাখানা একবার নামিয়ে রেখে রান্নাবাড়ির দিকে এসে তাড়াতাড়ি বলেন, 'বামুন মাসী, এবার তুমি এদিকের ঘরে নতুন বৌকে বসিয়ে দাও। বেলা গড়িয়ে বিকেলে ঢলছে।'

পরাণের ঠাকুমা চোখ কপালে তুলে বলে, 'সোয়ামী এখনো খেয়ে ওঠেনি, এখুনি খেতে হবে?'

'আহা, ছেলেমানুষ! পিত্তি পড়ে যাচ্ছে—'

বামুনমেয়ে অসন্তুষ্ট গলায় বলে, 'পিত্তিকে যে তুমি পড়তে দিচ্ছ বৌমা? ভোর থেকেই তো দেবী পিরতিমের বাহান্ন ভোগ চলছে। বলি নিজের শরীরটা বুঝি রক্ত মাংসর নয়? পাতরের?'

শুভঙ্করী হেসে বলেন, 'সে হিসেব পরে হবে। তুমি দাওগে তো! ....দেখেশুনে খাইও।'

'আর তুমি?'

'আহা, আমি তো বসছিই। ওনার হয়ে গেলেই তুমি আমি দু'জনে বসে খাবো। আর সব মিটেছে তো?....বসবার সময় পরাণকে একটু ডেকে নিও।'

পরাণের ঠাকুমা অপ্রতিভ গলায় বলে, 'সে ছোঁড়ার কি বাকী আছে মা? খিদে খিদে করে মাতা খেয়ে ফেলছিল।'

'আহা, তা হোক। ছেলেমানুষ! সে খাওয়া তো পাঠশালের জলপানির মতন কখন তলিয়ে গেছে। ঠাকুমার সঙ্গে একবার বসবে না?'

দ্রুত চলে আসেন।

তবে অনুভব করেন কুটনোর ঘরের মধ্যে কিছু সমালোচিকার গুলতানি চলছে।....চলবে নাই বা কেন? বামুন মাসীর নাতির বার চার-পাঁচ মাছ ভাতের বরাদ্দ, এটা কোন দাসী চাকরানী সহ্য করতে পারে?....

আবার সতীন নিয়ে আদরের আদিখ্যেতা দেখে গা জ্বলে যাওয়া 'শাশুড়ীবৃন্দের'ও অভাব নেই। তবে আবার ওরই মধ্যে থেকে মানদা খুড়ী আদরের অন্য রহস্য আবিষ্কার করে থাকেন।....

সতীনের আদরের মানে হচ্ছে, সোয়ামীর পাতটি নিজে নিত্যদিন দখল করার কৌশল। ও ছুঁড়ি অন্য ঘরে বসে সোয়ামীর সঙ্গে এক সময়ে খেয়ে পাপ কুড়োক, আর আমি গিন্নী সোয়ামীর পাতে খেয়ে খেয়ে পুণ্যির ছালা বাঁধি।

শুভঙ্করী এসব জানেন।

আড়ালের আবডালে কী ধরনের কথার চাষ চলে সংসারে তা তাঁর অবিদিত নেই। অথচ কেউ যদি সুয়োগিরি করে ওদিকের কথা এদিকে বলে দিতে আসে, শুভঙ্করী হয় তাকে তাড়া করে ভাগান, বলেন, কাজ না থাকে তো হরিনাম করগে যা, পরকালে কাজ দেবে।....নয় হেসে

গড়িয়ে বলেন, আড়ালে লোকে রাজার মাকেও 'ডান' বলে জানিসনে বুঝি এ কথা ? তুইও ওদের দলে নেই, তাই বা কে বলতে পারে ?

আবার স্বামীর কাছে এসে শাটিনের ঝালর দেওয়া হাত পাখাখানা তুলে নিয়ে বসেন কাছে।

এই কাজটি শুভঙ্করীর নিজস্ব।

এ সময় আর কেউ খবরদারি করতে আসে সেটা যে উনি পছন্দ করেন না, তা সবাই জানে। তা ছাড়া আহারে বসে কথা বলেন না সোমনাথ। সেই কোন্ ছেলেবেলায় পৈতের সময় অভ্যাসটা করতে হয়েছিল, তদবধি রেখে দিয়েছেন সে অভ্যাস।

ছেলেবেলায় মা ফুল্লকুসুম কত রাগ করেছেন, 'বছর ঘুরে গেল তবু আবার এ ভেক কেন' বলে ঝঙ্কার দিয়েছেন. কিন্তু বালক সোমনাথ নিজ মতে স্থির। তখন অবশ্য সেটা ছিল খেয়ালের নামান্তর, কিন্তু খেয়ালই তো অভ্যাসে পরিণত হয়, আর অভ্যাস মানেই দ্বিতীয় প্রকৃতি।

আহার শেষে আচমন করে সোমনাথ মৃদু হেসে বলেন, 'মাছিরাও বোধ হয় তোমার বাধ্য প্রজা ? সময় বুঝে ওড়ে ?'

শুভঙ্করী অপ্রতিভ হাস্যে বলেন, 'নতুন বৌকে খেতে দিতে বলে এলাম। ওরা তো হুঁশ করবে না। ছেলেমানুষ, আমার মত এতখানি বেলা অবধি থাকতে কষ্ট তো ?'

সোমনাথ আসনের উপর দাঁড়িয়েই শুভঙ্করীর মুখের দিকে একটি স্থির দৃষ্টিপাত করে বলেন, 'ও ছেলেমানুষ হতে পারে, তবে আমায় ছেলেমানুষ না ভাবলেই ভাল হয়।'

শুভঙ্করী অবাক্ হয়ে বলেন, 'ও মা, ও কি কথা ? তোমায় ছেলে-মানুষ ভাবতে যাবো কেন ?'

'আমাকে ধাপ্পা দেবার চেষ্টা কোরো না রানীবৌ ?' সোমনাথ গম্ভীর বিষণ্ণ গলায় বলেন, 'আগে ভাগে খাইয়ে নিয়ে তুমি তোমার ওই খেলার পুতুলটির হাতে পানের ডিবে পাঠিয়ে দিয়ে কর্তব্য সারতে চাও কিনা সত্যি বল ?'

শুভঙ্করী কি ওই স্থির দৃষ্টির সামনে একটু কেঁপে ওঠেন ? তা নয়তো তাঁর ওই উড়ন্ত পাখির ডানার মত চোখ দুটি নেমে পড়ে কেন ? আস্তে বলেন, 'এ কথা আবার কে বললো তোমায় ?'

'সব কথা কি বলে বলে দিতে হয় ? যাক, তখন বলেছিলাম কিছু কথা আছে তোমার সঙ্গে, সেটা বোধহয় ভুলে গেছ ?'

'বাঃ ভুলবো কেন ? বরং তুমিই ভুলে গেছ আমিও বলেছিলাম সেরেস্তার কাগজপত্র—'

'ঠিক আছে, সেইগুলো নিয়েই উপরে যেও। পানের ডিবেও তাদের সঙ্গে যাবে।'

অর্থাৎ নবদুর্গা সম্পর্কে স্পষ্টাস্পষ্টি নিষেধ।

কিন্তু তাড়াতাড়ি কি এই নীচের তলার সহস্র বন্ধন থেকে ছাড়িয়ে কাটিয়ে যাওয়া যায় ? এখানে যে কাজের শেষ নেই। এবেলার চাকা থামার আগেই ওবেলার চাকায় তেল দিয়ে রাখতে হয়।

তবু আজ শেষ করতে হলো।

বলতে হলো আশপাশের লোকদের শুনিয়ে শুনিয়ে, 'গুচ্ছিরখানি খাতা-পত্তর চাপিয়ে রেখে গেছেন নায়েবমশাই, এইবেলা সেগুলো উদ্ধার করিয়ে নিইগে বাবা ! ক্লান্ত শরীরে ঘুম এসে গেলে আজ আর হয়ে উঠবে না।'

কাকে শোনালেন ?

বামুনদি, হরিমতি, মানদা খুড়া, মুক্ত পিসী, বিধবা মামাতো ননদ লাবণ্য, আশেপাশে তো এরাই। এদের কাছে এতো কুণ্ঠা কিসের ? তা সেটাই হয়তো স্বভাবগত। অথবা তৎকালীন সমাজের রীতি।

বয়েস যতই হোক, স্বামী সন্দর্শনে যেতে হলে একটা ছুতো আবিষ্কার করতে না পারলে স্বস্তি থাকে না। পাঁচজনের নাকের সামনে দিয়ে ড্যাং ড্যাং করে বরের ঘরে ঢুকবে মেয়েমানুষ ? ছিঃ ! আর যাকে বললো ছিঃ, তার রইলো কী ?

শুভঙ্করীর আশেপাশে আরো একজনও অংশ্য ছিল। শুভঙ্করী যাবে একথা আগেই বলে রেখেছেন পান ক'টা নিজের হাতে সেজে, 'গোলাপজলে ন্যাকড়া ভিজিয়ে তাতে মুড়ে ডিবেয় ভরে রেখে খেতে বোস।'

নবদুর্গা অবশ্য শুভঙ্করীর মুখোমুখি কথা বলতে পারে না, তবু ক্ষীণ আপত্তি তুলেছিল। স্বামীর আগে খাবে কেন, সোজাসুজি এ প্রশ্ন না করে বলেছিল, দিদির সঙ্গে খেতে বসতে ভাল লাগে তার। তা সেই ক্ষীণ আপত্তিটুকু টেকেনি।

'পুণ্যিটা না হয় একটু কম হবে রে নব,' বলে হেসে উঠে কথা শেষ করেছিলেন শুভঙ্করী, 'আমার তো ছালা ভরতি পুণ্যি জমছে তার থেকে কিছুটা ভাগ নিস। ভাগ নেবারই তো সম্পর্ক।'

চোখে আলো ঝল্‌সানো সেই হাসির সামনে নবদুর্গা নিজেকে তৃণসম জ্ঞান করে।

অতএব—

ওই গোলাপজল মাখানো পানের ডিবেটি নিয়ে যে তাকেই আবার সেই ঘরে গিয়ে উঠতে হবে, একথা নবদুর্গা বুঝে নিয়ে মরমে মরে যাচ্ছিল।

শুভঙ্করীর করুণার তুলনা নেই, সহৃদয়তার শেষ নেই কিন্তু বিবেচনাটা যদি আর একটু থাকতো!

সব সময় নবদুর্গাকেই স্বামী সন্নিধানে এগিয়ে দেওয়াটাই এমন অভ্যাস হয়ে গেছে শুভঙ্করীর যে, নবদুর্গার পক্ষে যে সেটা কতটা লজ্জার তা খেয়ালই থাকে না। তা ছাড়া ওই মানুষটি! নবদুর্গা যার নাগাল পাবার স্বপ্নও দেখতে সাহস পায় না, তাঁর কথাও তো ভাবতে হয়। সব সময়ই কি তাঁর নবদুর্গার মত তুচ্ছ মানুষটাকে দিয়ে মন ভরে?

কিন্তু এ সব কথা বলতে পারে না নবদুর্গা। মরমে মরে গিয়েও 'বড়'র আজ্ঞা পালন করে।

এখন হঠাৎ শুভঙ্করীর এই সোচ্চার স্বগতোক্তি কানে যেতেই

নবদুর্গার যেন বুকের পাথর নামে। যাক, এখনি আবার তাহলে নবদুর্গাকে যেতে হবে না পান নিয়ে।

এ এক অদ্ভুত ভাব!

যেখানে যাবার উদ্দেশেই আহ্লাদে বুক থরথর করে, যেখানে গিয়ে পৌঁছলেই মনপ্রাণ আত্মা সমেত নিজেকে সেই চরণে বিকিয়ে দিতে ইচ্ছে করে, সেখানে না যেতে হলেও যেন আবার এক ধরনের আরাম।

হয়তো আপন সম্পর্কে তুচ্ছতা বোধ থেকেই এ ভাবের সৃষ্টি। যেন যেটা তার প্রাপ্য নয়, সেটা পেয়ে যাচ্ছে, তাই সেই 'পাওয়াটা' মনকে ভারী বোঝা করে তুলছে।

এখন দিদি পানের ডিবেটা হাতে নিলো দেখে কৃতজ্ঞতায় বিগলিত হলো নবদুর্গা। দিদি অবশ্য এমনি তুলে নিলো না, ডাক দিয়ে বললো, 'কই হে সুয়োরানী, তোমার গোলাপজলে চোবানো পানের খিলির ডিবেটা কই? দাও দুয়োরানীই বয়ে নিয়ে যাক। সেই হুকুম হয়েছে।'

নবদুর্গা ডিবেটা হাতে তুলে দিয়ে বড়বড় চোখ দু'টো তুলে বলে, 'সব সময় তুমি এরকম উলটো কথা বলো কেন বলতো দিদি? নিজে জানো না কে সুয়ো কে দুয়ো?'

শুভঙ্করী ওর ওই চোখ দু'টোর দিকে তাকায়, মনটা মায়া মায়া হয়ে আসে। মনে মনে বলে, ছুঁড়ির চোখ দু'টো যেন সর্বদাই জলভরা। একটু বিদ্যুৎ থাকলে ভাল হতো। মুখে হেসে উঠে বললো, 'ওমা! তুই হলি গিয়ে বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা। তুই সুয়ো হবি না তো কি এই সাত জন্মের পচা পুরনো বুড়িটা হবে?'

পান নিয়ে সিঁড়িতে উঠতে উঠতে একটা দীর্ঘ-নিশ্বাসকে সন্তর্পণে চাপেন। এ নিঃশ্বাস অনুশোচনার। ভাবলেন, আমার জিদের খেলায় এই নিরীহ মেয়েটার ফুলের মত সুন্দর জীবনটুকু পণ ধরলাম। অথচ আমার কীই বা লাভ হলো? আমি কি কাউকে ডেকে ডেকে বলতে পারবো, 'দেখো তোমরা এবার, অক্ষমতাটা কার!'

তবে?

শুধু আমার অন্তরাত্মার সন্তোষ, এই তো? কিন্তু সত্যিই কি সন্তোষ? আমার এই জয়ের থেকে পরাজয়টা ঘটলেই কি আরামের হতো না? সেই সহজ স্বাভাবিক পরাজয়কে গ্লানির বলে মনে না করে গৌরবের চেহারাও তো দিতে পারতাম? বলতে পারতাম, দেখো তো, ভাগ্যিস্ জোর করেছিলাম, তাই না তোমার পিতৃপুরুষের জলের ব্যবস্থা হলো।

তা হলো না। অদ্ভুত একটা অপরাধের ভারে ভারাক্রান্ত বেদনাভরা আত্মতৃপ্তির বোঝা বহন করে চলতে হবে আমায় বাকী জীবনটা।

শুভঙ্করী সিঁড়িতে উঠে যেতেই নবদুর্গা বিধবা ননদ লাবণ্যের কাছে গিয়ে বসে হাসি হাসি মুখে প্রশ্ন করে, 'আচ্ছা ঠাকুরঝি, খানিক আগে পালকির শব্দ শুনেছিলে?'

লাবণ্য এহেন প্রশ্নে অবাক হয়ে বলে, 'পালকি তো কত যায়, কে আবার তার শব্দে কান দিচ্ছে গো? কেন, তাতে তোমার কি দরকার পড়লো?'

নবদুর্গা অপ্রতিভ ভাবে বলে, 'কিছু না এমনি। ভাবছিলাম হয়তো কোনো নতুন বৌ বাপের বাড়ি যাচ্ছে—'

লাবণ্য একটু ভুরু কুঁচকে বলে, 'ও মা! তাইতো। তুমি ধরেছ তো ঠিক! পরশু ঠাকুরবাড়ির ওখানে দত্তগিন্নী এসেছিল ঠাকুরমশাইয়ের কাছে 'দিন' দেখাতে। বললো, বৌ বাপের বাড়ী যাবে। তা' আজকের জন্যেই তো দিন দেখে দিলেন। বললেন, সর্বসিদ্ধি তেরোদশী—'

নবদুর্গা একমুখ হেসে বলে, 'তবে আমার আন্দাজই ঠিক।'

লাবণ্য আচল থেকে পান দোক্তা নিয়ে মুখে পুরতে পুরতে হেসে বলে, 'নতুন বৌয়ের বুঝি দু' দিন বাপের ঘরে যাবার মন হয়েছে?'

'বাঃ! সে কথা কে বলেছে?'

লাবণ্য বলে, 'বলতে হবে কেন? পালকি বেহারাদের 'হুম্-হামে' প্রাণ হু-হু করে উঠে মনে হচ্ছে কে বুঝি বাপের বাড়ি যাচ্ছে। এতেই জানা হলো।'

নবদুর্গা মনে মনে হাসে।

লাবণ্য কী বুঝবে, ব্যাপারটা কী। এতে যে তার 'জীবন মরণ', সে কথা তো কাউকে ডেকে বলা যায় না। তবে নবদুর্গা একটু বিষণ্ণ হয়, বলে 'বাপও নেই মাও নেই, কী আর বাপের বাড়ি।'

লাবণ্য একটু লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি বলে, 'আহা তা' হোক, তবু জন্ম-ভিটে বলে কথা! কাকা পিসী তো আছে।'

'তা আছে বটে।'

নবদুর্গার মন একটু দুলে ওঠে।

লাবণ্য যেন একটা নিস্তরঙ্গ পুকুরে ঢিল ফেলে গেল। এখানের এই ছকে বাঁধা জীবনের খাঁজে খাপ খাইয়ে নেওয়া নবদুর্গার যে আলাদা কোন অস্তিত্ব ছিল সে কথা যেন ভুলেই গিয়েছিল নবদুর্গা।

এক হাতে একগোছা কাগজপত্র, আর এক হাতে পানের ডিবে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন শুভঙ্করী। ইতিমধ্যে যে সকাল থেকে পড়ে থাকা শাড়িখানা বদলে একটা কাচা শাড়ি পড়ে নিয়েছেন, তা সোমনাথ বুঝতে না পারলেও অন্য কোন মহিলার চোখে পড়লেই ধরা পড়তো।

এই বদলটা শুভঙ্করীর সাজের পর্যায়ে পড়ে না, এ হচ্ছে স্বামীর মনোবৃত্তি অনুসরণ। সোমনাথ মানুষটি নিজে অতিরিক্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। অন্যকেও সেই মতই দেখতে চান। এই তো সেদিন জগখুড়োর গায়ে একখানা জীর্ণ বিবর্ণ র‍্যাপার জড়ানো দেখে, তাকে কোনো কথা না বলে, শুভঙ্করীকে ডেকে প্রশ্ন করলেন, 'ক'দিন আগে আফজল যে ক'খানা শাল মলিদা গছিয়ে দিয়ে গেল, তার দরুন কিছু আছে?'

শুভঙ্করী অবাক্ হয়ে বলেন, 'থাকবে না কেন? একখানা মাত্তর তো খড়দার গুরুদেবকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। কেন বলো তো?'

'না, মানে জগখুড়ো দেখলাম কী যাচ্ছেতাই একটা গায়ে দিয়ে বেড়াচ্ছেন।'

শুভঙ্করী মৃদু হেসে বলেন, 'বুঝেছি। হবে।'

শুভঙ্করী জানেন কোনো রকম কুশ্রী দৃশ্যই সোমনাথ সহ্য করতে পারেন না। শুভঙ্করীকে তাই স্বামী অন্দরের দিকে আসবার উদ্দেশ্যে সংসারের সমগ্র দৃশ্য সামলে বেড়াতে হয়।

এখন শুভঙ্করীর পরনে একখানি চওড়া কালোপেড়ে ফরাসডাঙ্গার শাড়ি, গায়ে একখানি চওড়া পাড সাদা ধবধবে শাল। খেয়ে উঠে শীতটা ধরেছে। বেলাও তো গড়িয়ে এলো।

সোমনাথ গম্ভীর হাস্যে বলেন, 'সময় হলো?'

শুভঙ্করী দিব্য সপ্রতিভ হাস্যে বলেন, 'অনেক কষ্টে। পাকঘরের পাকচক্কর তো সোজা নয়।'

'তা সেইটাই তো তোমার কাছে সবচেয়ে দরকারি।'

শুভঙ্করী বলেন, 'ওমা! স্বামী শ্বশুরের ঘর, গৃহদেবতার সংসার, এর বাড়া দরকারি আর কিছু আছে নাকি?'

'তা বটে! ওদের দাপটে স্বামীটাও ফালতু হয়ে যায়, কেমন?'

শুভঙ্করী তাড়াতাড়ি স্বামীর পা ছুঁয়ে একটু প্রণাম করে নিয়ে বলেন, 'কী যে বলো! তোমার জিনিস বলেই সব আদরের, দরকারের।'

সোমনাথ নিজের গায়ের শালখানা ভাল করে জড়িয়ে নিয়ে ব্যঙ্গ মিশানো শান্ত গলায় বলেন, 'ওই সব বলে নিজেকে দিব্যি সরিয়ে নিয়ে আমার গলায় একটা খুকি গছিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্দি হয়ে থেকে জব্দ করার কৌশলটা ভালই শিখেছ।'

শুভঙ্করী এখন ভিতরে ভিতরে একটু ভয় খান। স্বামীর মুখে এ ধরনের কথা বড় একটা শোনেনি কখনো।....তবু জোর করে হেসে বলেন, 'এতে আবার জব্দ করার কী হলো? চিরদিনই তো রাজামশাইদের বড় রানী ছোট রানী থাকে গো—'

'রাজা হবার বাসনা কোনোদিন দেখেছ আমার?'

শুভঙ্করী তবু সহজ হবার চেষ্টায় বলেন, 'বাসনা না থাকলেই বা

কি! ভগবান তোমায় রাজামশাই করে পাঠিয়েছেন, করবে কী? যাক এখন এই খাতাপত্তরগুলো একটু দেখুন তো রাজাবাবু।'

সোমনাথ সংক্ষেপে বলেন, 'এখন থাক। ভাল লাগছে না।'

শুভঙ্করীকে ডেকে বলে পালঙ্কে বসাতে হয়নি, তিনি নিজ অধিকার গৌরবেই পালঙ্কে উঠে গুছিয়ে বসেছেন।....ভাল লাগছে না শুনে চোখে অনেকখানি হাসি ঝরিয়ে বলেন, 'ভাল লাগছে না? কেন? এবারে তোমাদের মিটিঙে হেরে এসেছ বুঝি?'

'মিটিঙে? কোন্ মিটিঙে?'

'বাঃ! কী করতে গিয়েছিলে এবার কলকাতায়? তোমাদের বিদ্যোৎসাহিনী সভার স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ক মিটিঙে না?'

'ওঃ হ্যাঁ! সে তো গত সোমবারেই মিটে গেছে।'

'তাতে তোমার কী হলো? জয় না পরাজয়?'

সোমনাথ স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারের একজন সমর্থক পাণ্ডা, সেটা শুভঙ্করীব জানা।

সোমনাথ গম্ভীর হাস্যে বলেন, 'এটা একদিনের সভার জয় পরাজয়ের ব্যাপার নয়। সে দিন স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারের পক্ষে কিছু বেশী লোক ছিলেন, পরবর্তী সভায় হয়তো তার বিপরীত হতে পারে।'....

সোমনাথ একটু ক্ষুব্ধ হাসি হেসে বলেন, 'সব চেয়ে বেদনার কী জানো রানীবৌ, মহা মহা পণ্ডিতজন অনেকেই এর বিপক্ষে।'

'ওমা, তাই নাকি?' শুভঙ্করী তাঁর চাঁপার কলির মত একটি আঙ্গুল গালে ঠেকিয়ে বলেন, 'নিজেরা পণ্ডিত হয়ে মুখ্যুদের দুঃখু বোঝেন না?'

'নাঃ।'

'কী বলেন গো তাঁরা?'

'তাঁরা বলেন, লেখাপড়া শিখলেই স্ত্রীলোকের চিত্ত বহির্মুখী হয়ে যাবে, গৃহ-সংসারের প্রতি আর মন থাকবে না, শিশুপালনে অবহেলা আসবে ইত্যাদি ইত্যাদি।'

'ভাল।' বলে একটু হেসে বলেন শুভঙ্করী, 'কিন্তু, যার যা স্বভাব সে তা করবেই।....আমাদের মটর ঠাকুরঝিকে তো কেউ বিদ্যেবতী বলে গাল দিতে পারবে না? শত্রুতেও না। কী বলো, তা তাঁর ব্যাভারটার কথা ভাবো? ঠাকুরঝি গঙ্গাস্নানের ছুতোয় সকাল বেলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে বেলা দুপুর অবধি পাড়া টইল দিয়ে বেড়িয়ে যখন ঘরে ফেরেন, তখন ঠাকুরজামাই বেচারার অর্ধেক রান্নাবান্না হয়ে গেছে।'

'রান্না?' সোমনাথ ভুরু কুঁচকে বলেন, 'ব্রজেন রান্না করে?'

'তা না করে উপায়? গিন্নীর ভরসায় ফেলে রাখলে কুচোকাচার দুর্গতি। তাদের চান করানো, দুধ খাওয়ানো সবই তো ঠাকুরজামাইয়ের ঘাড়ে।'

সোমনাথ বিরক্ত গলায় বলেন, 'তা তিনি ঘাড়টা পাতেন কেন?'

'কী করবেন? জীবে দয়ার বশে। কচি-কাঁচা কটা সময়ে খেতে না পেলে?'

'চমৎকার!'

'তাহলেই দেখো, মন যার বহির্মুখী, তার অক্ষর জ্ঞানটুকু না থাকলেও বহির্মুখী।'

সোমনাথ হেসে ফেলে বলেন, 'তোমায় নিয়ে গেলে হয় সভায়। মঞ্চে উঠে লেক্‌চার দিতে পারবে। যুক্তি-টুক্তি ভাল দিতে পারবে।'

শুভঙ্করী বলেন, 'ঠাট্টার কিছু নেই, যাঁরা বলেন লেখাপড়া শিখলেই বারমুখো মন হয়, তাদের সামনে মটর ঠাকুরঝির দৃষ্টান্ত তুলে ধরলে ভাল হয়। শুধু কি সকালেই? সারাক্ষণই তো উনি এ বাড়ি ও বাড়ি বেড়াচ্ছেন। পান দোক্তা খাচ্ছেন, পিক্ ফেলছেন, আর গাল-গল্প করছেন।'

'দোষ ব্রজেনটারই।' সোমনাথ বলেন, 'গোড়া থেকে রাশ টানতে হয়।'

শুভঙ্করী মুখ টিপে হেসে বলেন, 'এইটি বোধ হয় তোমার নিজের

মনের কথা? গোড়া থেকে রাশ না টানলেই বিপদ।'

সোমনাথ ভরাটি গলায় বলেন, 'বাঃ! খুব চটপট আমার মনের কথাটা ধরে ফেলেছ তো?'

'নিজেই নিজেকে ধরেছি।' শুভঙ্করী বলেন, 'আমি তো তোমার একখানা দজ্জাল দস্যি অবাধ্য পরিবার। আমাকেও তো তুমি এঁটে উঠতে পারো না? সেটা গোড়ায় রাশ টানার সুবিধে পাওনি বলেই, না?'

সোমনাথ মৃদু স্বরে বলেন, 'তা বটে। বলে খেয়াল করিয়ে দিলে।'

শুভঙ্করী কৌতুকে চোখ নাচিয়ে বলেন, 'তা তাতে তোমার লোকসান কিছু হয়েছে কী? তা বলো বাবু।'

সোমনাথ ওর ওই কৌতুক হাসিভরা মুখের দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকান, যেন একটা দুর্বোধ্য লিপি পড়তে চেষ্টা করেন। ওর এই হাসি, এই কৌতুকচ্ছটা, এ সব কি নির্ভেজাল খাঁটি? নাকি ছলনা? সাজানো? ভেজাল?

ঠিক পড়ে উঠতে পাবেন না। মৃদু স্বরে বলেন, 'লাভ লোকসানের হিসেব কি এতো সহজে হয়? তোমার হয়ে গেছে হিসেব?'

শুভঙ্করী চমকে উঠে বলেন, 'আমার? আমার আবার কিসের হিসেব?'

সোমনাথ ওঁর দিকে বদ্ধ গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেন, 'কেন, লাভ আর লোকসানের।'

শুভঙ্করীর বুকটা যেন থরথর করে ওঠে।

কী বলতে চান সোমনাথ।

তবু শুভঙ্করী সহজভাব দেখাতে ডিবে খুলে একটা পানের খিলি নিয়ে লবঙ্গটা খুলে ফেলে দিয়ে খিলিটা মুখে পুরে বলেন, 'এক এক সময় তোমার কথার মাথামুণ্ডু বোঝা দায় হয়। আমার আবার কিসের লাভ লোকসান?'

সোমনাথ গভীর গাঢ় গলায় বলেন, 'কিসের তা ভালই জানো।

লাভ একটা কানাকড়ি, লোকসান জীবনের সবটাই। তবে আরো দুঃখ সবটাই তোমার একার নয়। মাঝির ভুলে নৌকাডুবি হলে মাঝি একাই ডোবে না, সবাই ডোবে।'

আবার আরো মৃদু গম্ভীর গলায় বলেন, 'অবশ্য ভুলের দায়ের সবটাই তোমার উপর চাপানো আমার পক্ষে মূঢ়তা। কৃতকর্মের ফল নিজেও এড়াতে পারি না।'

শুভঙ্করী মুখের পান থাকতে থাকতে আবার একটা পান নিয়ে লবঙ্গ খুলতে খুলতে বলেন, 'না তোমার কথার মানে বোঝা আমার কম্মো নয়। পণ্ডিতের সঙ্গে মুখ্যুকে জুড়ে দিলে এই দশাই ঘটে।'

সোমনাথ ওই শক্তিময়ীর মুখের দিকে একটুক্ষণ নির্নিমেষে তাকিয়ে দেখেন।

শক্তিময়ী বৈ কি! কী অবলীলায় মনের ভাব গোপন করে হাসতে গল্প করতে পারে।

একটু তাকিয়ে থেকে বিচিত্র একরকম ক্ষুব্ধ কৌতুকের হাসি হেসে বললেন, 'তুমি তো অনেক নিয়ম কানুন শাস্ত্র পালা মানো জানি, হিন্দু স্ত্রীর যে স্বামীর কাছে মিছে কথা বলা মহাপাপ সেটা জানো না?'

'মিছে কথা!' শুভঙ্করী আবার সেই চাঁপার কলি সদৃশ আঙুলের ডগা গালে ঠেকিয়ে বলেন, 'ওমা! মিছে কথা আবার কখন বলতে গেলাম আমি তোমার সঙ্গে? বলো তো শুনি?'

সোমনাথ মৃদু হেসে বলেন, 'আইনতঃ অবশ্য প্রমাণ করা যাবে না। থাক সে কথা - একটা কথা তোমায় বলবো ভাবছি। নতুন বৌয়ের বোধহয় একবার পিত্রালয়ে যাবার বাসনা হয়েছে মনে হয়।'

শুভঙ্করী অবশ্যই এ প্রসঙ্গের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। চকিত হয়ে বলেন, 'কেন? তোমায় বলেছে কিছু?'

'আমায়?'

সোমনাথ যেন একটু পরিতাপের হাসি হেসে বলেন, 'আমায় বলবে? তাই মনে হয় তোমার?'

'মনে তো হয় না। কিন্তু—তুমি হঠাৎ বললে।'

'বললাম নিজের অনুমানে।....তুমি তো একটা নিরীহ নিপাট অবোধ খুকিকে আমার কাছে গছিয়ে দিয়ে দূরে থেকে মজা দেখো, আমি তো মানুষ, মনুষ্যত্বের দায়েও আমাকে তার সঙ্গে কথা বানিয়ে বানিয়ে কথা বলতে হয়, খুকি ভোলাতে গল্প বলতে হয়। সেই অবসরে মনে হলো কথাটা।....কোথায় যেন পালকির শব্দ হচ্ছিল, কেমন যেন উন্মনা হয়ে উঠলো, বলল, নিশ্চয় কোনো বৌ বাপের বাড়ি যাচ্ছে।'

শুভঙ্করী কি সতীনের প্রতি স্বামীর এই মমতার মনোভঙ্গী দেখে ঈর্ষিত হন?....নাঃ, শুভঙ্করী অমন ইতর নয়। শুভঙ্করীও মমতার গলায় বলেন, 'উন্মনা হতে অবিশ্যি পারে। বিয়ে হয়ে ইস্তক তো এখানেই আছে। কিন্তু বাপের বাড়ি বলতে আর ওর আছে কী? সেই তো এক অখণ্ডে কাকা, আর এক আধ-পাগল পিসী। সাত জন্মে নামও করে না। নেমন্তন্ন করে পাঠাই, আসে না। তত্ত্ব-তাবাস পাঠালে বলেও না।'

সোমনাথ গম্ভীর হাস্যে বলেন, 'নাম করবে, তত্ত্ব-তল্লাশ করবে. এমন হলে কি আর সতীনের উপর মেয়ে দেয়?'

শুভঙ্করী যেন একটু চমকে যান।

এই 'সতীন' শব্দটা কি তিনি কোনোদিন তাঁর সভ্যভব্য পণ্ডিত স্বামীর মুখে শুনেছেন? আর শুভঙ্করী সম্পর্কে 'সতীন' শব্দটা কি কেউ কোনোদিন উচ্চারণ করেছে? মানদা খুড়ী, পরাণের মা কোম্পানী যখন ওই শব্দটা উচ্চারণ করে, সেটা অন্য অর্থে।....শুভঙ্করীর যে 'সতীন' নিয়ে আদিখ্যেতা সেই কথাটা নিয়েই বলাবলি করে ওরা।

নবদুর্গা শুভঙ্করীর সতীন, এ কথাটা কান সহা, কিন্তু শুভঙ্করী?

না, ওটা কানে সহা ছিল না।

তাই প্রায় চমকেই উঠলেন শুভঙ্করী। তারপর জোরে হেসে উঠলেন, 'তা' বটে। তবে মেয়েটা এতই কাঁচা আর বোকা যে

সতীন যে কী বস্তু সেটা বুঝতেই পারে না।'

সোমনাথ ওই হাসিতে কাঁপা চোখের দিকে তাকিয়ে একটু তিক্ত হাসি হেসে বলেন, 'হ্যাঁ। আমিও তাই দেখছি। সেই জন্যে তখন ওকে পাকা আর চালাক করে তোলবার জন্যে দুর্মতির শিক্ষা দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করছিলাম সতীনকে ভালবাসাটা নেহাৎ মূঢ়তা। তাঁকে হিংসে করতে হয়, রেষারেষি করতে হয়, নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে হয়—'

শুভঙ্করী ওই তিক্ত হাসির দিকে তাকিয়ে দেখলেন। তারপর চাপা হাসি ভরা মুখে বললেন, 'পারলে শেখাতে?'

সোমনাথ সহসা কোল থেকে তাকিয়াটা ঠেলে ফেলে দিয়ে পালঙ্ক থেকে নেমে পড়ে পায়চারি করতে করতে বলে উঠেন, 'শক্ত ভিৎ, একদিনে কি আর নড়ানো যায়?'

'তা চেষ্টা চালিয়ে যাও।' বললেন শুভঙ্করী।

'তাই ঠিক করেছি।'····সোমনাথ আবার পায়চারি করতে করতে প্রায় অস্ফুট গলায় বলেন, 'অন্যায়ের কিছু তো প্রায়শ্চিত্তের দরকার?'

শুভঙ্করীর মনের মধ্যে যে উত্তরই আসুক তাকে সংবরণ করে পরিস্থিতি হালকা করে ফেলতে, খুব অমায়িক গলায় বলেন, 'তা সত্যি! আশা হচ্ছে, চেষ্টা চালিয়ে চালিয়ে তোমার ঘোষাল কাকার মতন ন্যায়ের সংসার গড়ে তুলতে পারবে।'

সোমনাথ বোধহয় অন্যমনস্ক ছিলেন, সচকিতে বলেন, 'কার মতন কী?'

'আহা, তোমার ঘোষাল কাকার মতন গো। ওনার সংসারে অন্যায়ের বালাই নেই তা জানো তো?'

ঘোষাল কাকার উল্লেখে সোমনাথেরও হাসি এসে যায়।

তাঁরও এই একই দশা।

প্রথমা স্ত্রী 'বন্ধ্যা' বলে ঘোষিত হলে বংশরক্ষার্থে আবার দ্বিতীয়াকে গৃহে আনেন। দুর্ভাগ্যক্রমে এক্ষেত্রেও ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয়।

আর সেইটা হওয়া ইস্তক প্রথমা ভীমমূর্তি ধারণ করেন এবং দ্বিতীয়া ভয়ঙ্করী মূর্তি।

সবাই জানে হারু ঘোষালের বাড়ির ত্রিসীমানায় কাক চিল বসতে পায় না, লোকেরা বরং এক আধ মাইল বেশী হাঁটে, তবু ও পথ দিয়ে হাঁটতে চায় না, কদর্য গালমন্দর ভাষা কানে আসার ভয়ে।

বেচারি হারু ঘোষাল!

তাঁকে পালা করে দুই স্ত্রীর মনোরঞ্জন করতে হয়, দুই স্ত্রীর খিদ্‌মদগারি করতে হয়, দুই স্ত্রীর রান্নাঘরে পুরো ওজনে খেতে হয়।

দুই সতীনের চুলচেরা ভাগ।

এতটুকু উনিশ বিশ হলেই রসাতল তলাতল।

সোমনাথ একটু এগিয়ে আসেন।

শুভঙ্করীর খুব কাছাকাছি এসে আস্তে ওর দুই কাঁধে হাত রেখে বলেন, 'সব সময় তোমার এতো হাসি আসে কী করে বল তো?'

'ওমা!' শুভঙ্করী একটা হাত তুলে কাঁধে-রাখা ওই হাতটার উপর একটু চাপ দিয়ে বলেন, আসবে না কী দুঃখে?'

'সত্যিই তোমার কোনো দুঃখু নেই?' সোমনাথ গভীর গাঢ় গলায় বলেন।

শুভঙ্করীর সেই খঞ্জন আঁখি হঠাৎ যেন গড়ন বদল করে। শুভঙ্করীও তেমনি গভীর গাঢ় গলায় বলেন, 'কিসের জন্যে? তুমি কি আমায় ত্যাগ করেছ?'

সোমনাথ কাঁধটা ছেড়ে দিয়ে মৃদু ক্ষুব্ধ হাসি হেসে বলেন, 'তা বটে! অবস্থাটা যে উলটো সেটা ভুলে যাচ্ছিলাম।'

শুভঙ্করী একটু থেমে বোধহয় কথাটা অনুধাবন করে নিয়ে বলে ওঠেন, দুগ্‌গা দুগ্‌গা। তোমার যদি মুখে কিচ্ছু আটকায়! ওই যাঃ সন্ধ্যে হয়ে এলো, যাই। ঠাকুরের আরতির সময় হয়ে আসছে।'

সোমনাথ বাধা দেন না, শুধু বলেন, 'গৌরকে দিয়ে নায়েব

মশাইয়ের কাছে একটা খবর পাঠিয়ে দিও। সন্ধ্যাহ্নিক সেরেই যেন চলে আসেন।'

আরতির দীপ তৈরি করতে করতে কথাটা তুললো লাবণ্য, 'নতুন বৌয়ের বোধহয় একবার বাপের বাড়ি যাবার মন হয়েছে—'

একই কথা পর পর দু' বার।

শুভঙ্করী চকিত হলেন, চমকিত হলেন। এবং তখন যে প্রশ্নটা করেছিলেন, এখনো সেইটাই করলেন, 'তোমার কাছে বলেছে নাকি?'

লাবণ্য তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, 'না না, মোটেই না। তুমি থাকতে আমায় বলতে যাবে কেন? এমনি মনে হলো। কখন নাকি পালকির শব্দ শুনেছে, তাই শুধোচ্ছিল, কোনো নতুন বৌ বাপের বাড়ি গেল নাকি। তাতেই মনে হলো। পালকির হুম-হামে প্রাণ হু-হু করছে বোধ হয়। বে হয়ে এস্তক এইখেনেই তো হড়ে পড়ে আছে। যতই সুখে থাক, তবু জন্মস্থান বলে কথা! পিঠাহ মণ্ডা মেঠাই খেলেও মানুষের একদিন মুড়ি চালভাজা খেতে সাধ যায়।'

লাবণ্য বড় বেশী কথা বলে মনে হলো শুভঙ্করীর। কথা বলার একটা সুযোগ পেলে আর ছাড়ে না। শুভঙ্করী তাই আর কথার ফ্যাকড়া বাড়াতে দিলেন না, সংক্ষেপে বললেন, 'দেখি জিগ্যেস করে।'

তবু লাবণ্য কথার সূত্র পেয়ে গেল। বললো, 'জিগ্যেস? নতুন বৌকে? আছো কোথায়? মনের বাসনা মুখ ফুটে বলবে ও?'

শুভঙ্করী এই মাতব্বরীতে বিরক্ত হলেন। বললেন, 'তা হলে আর মনোবাসনা পূর্ণ হবার উপায় নেই। তার সতীন তো আর অন্তর্যামী নয়?'

আর কথা বাড়ানোর উপায়ও নেই, আরতির ঘণ্টা বেজে উঠেছে, ঘা পড়েছে কাঁসরে।

আরতি কালে পরিবারের সকলকেই এখানে এসে জুটতে হয়,

চিরকালীন নিয়ম।…সোমনাথকেও আসতে হয়েছে বৈঠকখানা থেকে, সঙ্গে অতএব নায়েবমশাইও। আরতি অন্তে কথাটা তাঁকেই জিজ্ঞেস করলেন সোমনাথ,—'ত্বপুরবেলা পালকিতে গেল কে? চরণ কবরেজ? সেরেস্তার কেউ? কোনো বৌ ঝি?

'তা শেষোক্তটাই ঠিক।'

নায়েবমশাইয়ের জানা ঘটনা। দত্তদের বৌ বাপের বাড়ি গেল।

দশচক্রে ভগবান ভূত।

ধরে নেওয়া হয়েছে পালকির শব্দে নবত্বর্গার প্রাণ হু-হু করেছে বাপের বাড়ি যাবার জন্যে।

অতএব—

কিন্তু মেয়েমানুষ কি যেচে বাপের বাড়ি যায়? তাতে মান মর্যাদা বজায় থাকে? না সে হয় না।…শুভঙ্করীর সে জ্ঞান টনটনে।

তলে তলে মান মর্যাদা বজায়ের ব্যবস্থা হয়ে যায় শুভঙ্করীর সুকৌশল নৈপুণ্যে।

ক'দিন পরেই হঠাৎ নবত্বর্গার সেই বাউণ্ডুলে কাকাটির আবির্ভাব ঘটে এ বাড়িতে। অনেকদিন মেয়েটাকে না দেখে মন উচাটন হয়েছে। তাই এসেছেন। আর দিদি অর্থাৎ নবত্বর্গার পিসী নাকি মেয়েটাকে স্বপ্নে দেখে একবার চোখে দেখবার জন্যে উতলা হয়েছেন, অতএব একবার যদি নবুকে—

কাকা নবত্বর্গার হলেও, প্রথম আপ্যায়ন শুভঙ্করীর কাছেই। গলায় আঁচল জড়িয়ে প্রণাম করে খাটো গলায় অভিমানযুক্ত অভিযোগ-বাণী উচ্চারণ করেন, 'কাকার বুঝি এতকালে মেয়ে ত্বটোকে মনে পড়লো?'

মেয়ে ত্বটো!

কাকা একটু চমকালেন, তারপরই সামলে নিতে গিয়ে হ য ব র ল করে যা বললেন, তার অর্থ, 'মন তো সব সময়ই কাঁদে কিন্তু সময়ের

অভাব, শরীর খারাপ, দিদির হাঁপানি, গরুর খড় কাটবার লোক নেই, ইত্যাদি ইত্যাদি।'

শুভঙ্করী সব কথায় সায় দিয়ে বিপুল জলযোগের ব্যবস্থা করে নবদুর্গাকে পাঠিয়ে দিলেন।

নবদুর্গাকে দেখে কাকা আর একবার চমকালেন। এই মহারানীর মত মেয়ে কিনা তাঁর সেই ভাঙা কুঁড়ের জন্যে উতলা হয়েছে? আবার একবার মেয়েকে দেখলেন নিরীক্ষণ করে। দেখলেন তার পরিবেশ রাজ-ঐশ্বর্য্য বললেই হয়।

তবে? উঁহু, ব্যাপারটা অতো সরল নয়, নিশ্চয় ভিতরে অন্ত কোনো গভীর গোপন ব্যাপার আছে। জীবনে ব্যর্থ অপদার্থ লোকেদের যা স্বভাব হয়ে থাকে। তারা সব কিছুরই অন্তরালে অন্য কিছু দেখতে পায়।

তবু উপরে সরল স্নেহের ভাব দেখিয়ে বললেন, 'কী রে? বাড়ির জন্যে মন কেমন করেছে?'

নবদুর্গা এ কথার সূত্র ধরতে পারলো না। শুনে এসেছে কাকাই হঠাৎ মন কেমনে অস্থির হয়ে ছুটে এসেছেন, পিসীমা নাকি দুঃস্বপ্ন দেখেছেন। এখন প্রশ্নটা উলটো খাতে কেন? তা যাই হোক, বলতে তো পারে না, কই? কে বললো মন কেমন করছে।

বলতেই হলো, 'তা তোমরা তো মেয়েটাকে বিদেয় করে নিশ্চিন্দি হয়ে বসে আছ। একবার দেখতে ইচ্ছে করে না বুঝি?'

'তা তো ঠিক, তা তো ঠিক—চিরকালের জায়গা।' সায় দিলেন কাকা।

মহারানী মেয়ের কথায় সায় না দিয়ে পারা যায়?

তারপর অবশ্য জুড়ে দিলেন, 'কিন্তু এই রাজ-ঐশ্বর্য্য ছেড়ে সেই ভাঙা কুঁড়েয় গিয়ে কি দুটো দিনও থাকতে পারবি মা?'

নবদুর্গা লজ্জায় লাল হয়ে বলে, 'কি যে বল কাকা! পিসীমা বুড়ো হচ্ছেন, কবে আছেন কবে নেই।'

তারপর জলখাবারগুলো শেষ করবার জন্যে পীড়াপীড়ি করতে থাকে।

'জামাইকে দেখছি না—' সভয় সমীহে প্রশ্ন করেন কাকা।

নবদুর্গা নতমুখে বলে, 'হঠাৎ কী কাজ পড়ায় কলকাতায় চলে যেতে হয়েছে দু'চার দিনের জন্যে।'

কাকা এ সংবাদটিকেও সুলক্ষণ মনে করেন না। জামাইয়ের অসাক্ষাতে সতীন মাগী মেয়েটাকে বিদেয় করবার তাল করছে না তো? সন্দেহের গলায় বলেন, 'তা জামাইয়ের অনুপস্থিতিতে নিয়ে যাবো, এটা কি ঠিক হবে?'

কিন্তু মেয়ে অম্লান মুখে বলেন, 'তা আমি কি জানি? দিদি যা ভাল বুঝবেন।'

'দিদি যা ভাল বুঝবেন?' কাকা চাপা গর্জনে বলেন, 'কেন? তিনিই সর্বেসর্বা নাকি? তোর কোন এক্তিয়ার নেই? জামাই ফিরে এসে তোকে দুষবে না?'

অনেকদিনের অদেখা হলেও নবদুর্গা তার কাকাকে ভালই চেনে। দেখলো স্বভাবের কোনো পরিবর্তন হয়নি। হেসে ফেলে বললো, 'দিদি থাকতে আমাকেই দুষতে যাবেন কেন? ও নিয়ে মিছে তুমি ভাবনা কোরো না কাকা।'

কিন্তু ভাবনা কোরো না বললেই হলো? ভাবনা কি লোকের হুকুমে বা পরামর্শে চলে? কাকা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেরা করতে থাকেন।

তবে বেশীক্ষণ অবশ্য ভাবনায় থাকতে হয় না। শুভঙ্করী কথাটার আঁচ পেয়ে আকাশ থেকে পড়েন। 'ওমা, আজই আপনাকে ছাড়ছি না কি? এসেছেন যখন দু'চারদিন থাকুন। জামাইয়ের সঙ্গে দেখা না করে গেলেই হলো? সংসারে তো 'করণ-কারণ' বলে কিছুই নেই, নিয়ে দিয়ে ঠাকুরের পাল পার্বণ! তা সে তো কতবারই খবর গেছে, আপনার তো আসার সময়ই হয় না। এবার যখন পায়ের ধুলো পড়েছে।....'

কথাটা সত্যি।

'বড়লোকের বাড়ি কে যাবে ?'

বলে ছুতো করে নেমতন্ন এড়িয়েছেন মুকুন্দরাম। এবারের পরিস্থিতি অন্য।

'তা জামাই ফিরছেন কবে ?'

'বড় জোর চার পাঁচ দিন।'

সে ক'টা দিন শ্বশুরই না হয় জামাইবাড়িতে জামাই আদরে থাকলেন। ওদিকে শুভঙ্করী ভারে ভারে জিনিস জমা করতে থাকেন নবদুর্গার সঙ্গে দেবার জন্যে। এতদিন পরে বাপের বাড়ি যাচ্ছে মেয়ে, হাত নাড়া দিয়ে পালকি থেকে নামবে নাকি ? গোরুরগাড়ি বোঝাই তত্ত্ব-তাবাস যাবে না তার সঙ্গে ?

দেখে দেখে রেগে জ্বলে যাচ্ছেন মহিলাকুল। আদিখ্যেতার একটা সীমা থাকা উচিত। আবার কেউ কেউ এ সন্দেহ করছেন জন্মের শোধ বিদেয় দিচ্ছে না তো ? যার জন্যে নিয়ে আসা তাই যখন সফল হলো না, তখন আর চোখের ওপর চক্ষুশূল সতীনকে রাখা কেন ? সোয়ামী তো বড়র কথাতেই ওঠেন বসেন, ছোটটা তো ন্যাকা চণ্ডী, আপন গণ্ডা বুঝতে জানে না।....কাকার অভাবের সংসার, তাই ছ-মাস এক বছরের মতন রসদ দিয়ে—

তা কথাটা মিথ্যেও নয়।

শুভঙ্করীর ব্যবস্থাটা তাই। তাঁর মতে দোষের কিছু নেই। মেয়ের জমির চামরমণি মিহি চাল মেয়ের বাপ কাকা খায় না ? চিকন সোনা মুগ ? গুড় নারকেল ? ঘানির তেল ? ঘরের গরুর গাওয়া ঘি ? গোয়ালা বাড়ির খাঁটি ভঁয়সা ? জমির আলুর বস্তা ? তা ছাড়া যাত্রাকালে মিষ্টিমাষ্টি চিঁড়ে মুড়কি এ সব তো দিয়েই থাকে লোকে।

কিন্তু শুভঙ্করীর মতের সঙ্গে তাঁর প্রতিপাল্য পরিজনের মতের মিল হবে এমন তো হতে পারে না।....সমালোচনার ঝড় বইতে থাকে অন্তরালে, এবং তার ঝাপট কিছু কিছু নবদুর্গার কাছেও এসে এসে পড়ে।

নবদুর্গা কখনো বিব্রত হয় কখনো ভীত।

খুব সংকুচিত হয়ে প্রশ্ন করে, 'এত কেন দিদি ?

শুভঙ্করী হেসে ভয় উড়িয়ে দেন। 'ওমা, কতকাল পরে দেশে যাচ্ছিস, পাড়াপড়শী সখী সামন্তী সবাইকে হাত মেলে দিবি থুবি না ?
....প্রথম প্রথম আমি যখনি বাপের বাড়ি গেছি, আমার সঙ্গে নৌকো বোঝাই জিনিস গিয়েছে।'

নবদুর্গা হেসে ফেলে বলে, 'আবার নৌকো বোঝাই এসেওছে নিশ্চয় ?'

শুভঙ্করী হেসে উঠে ওর মাথাটা নেড়ে দিয়ে বলেন, 'দুষ্টু বুদ্ধিতে ওস্তাদ।...আমার তখন বাপ মা ঠাকুমা ঠাকুর্দা, তোর কে আছে বল ?'

মা বাপ ঠাকুমা ঠাকুর্দার কথাই তোলেন শুভঙ্করী, অবস্থার কথা এড়িয়ে যান।

দিন পাঁচেক পরে ফেরেন সোমনাথ।

নৌকোয় নয়, গাড়িতে।

কৃতজ্ঞতায় চোখে জল আসে নবদুর্গার। সেই কথা মনে রেখেছেন উনি।

সোমনাথের কিন্তু মুখ গম্ভীর থমথমে।

কে জানে কী হয়েছে সেখানে।

শুভঙ্করী লক্ষ্য করলেন, কিন্তু প্রশ্ন করলেন না। না বোঝার ভান করে অন্য কথা পাড়লেন।....খুড়-শ্বশুরের সঙ্গে দেখা করা আশু কর্তব্য সেটা মনে পড়িয়ে দিলেন।

এখন সোমনাথ বিস্মিত হলেন, 'পাঠানো হয়নি নতুন বৌকে ?'

শুভঙ্করী হেসে বলেন, 'বাঃ, তুমি না ফিরলে ?'

'সে কী ! আমি তো বলেই গিয়েছিলাম।'

শুভঙ্করী হেসে উঠে বললে, 'তা বললে কি হয় ? যাত্রাকালে একবার চরণ-ধূলি না নিয়ে যেতে মন সরে ?'

তা সেই চরণ-ধূলি গ্রহণের সময় ঘোমটার অন্তরালে যে ঘটনা ঘটে, সেটা অন্তরালেই থেকে যায়।...স্বামী সস্নেহ গাম্ভীর্যে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করেন, 'সাবধানে থেকো। যে ক'দিন ইচ্ছে থেকো, ইচ্ছে হলেই চলে এসো।'

তাড়াতাড়ি চলে এসো নয়, ইচ্ছে হলে চলে এসো।

কিন্তু একদা কি ওই কথাটা বলতে জানতেন না সোমনাথ নামের মানুষটা ?...বলতেন নাকি বাপের বাড়ি গিয়ে সব ভুলে যাওয়া হবে তো ?

বলতেন বৈ কি! আর তার উত্তরে জলে পাখনা ভেজানো একজোড়া খঞ্জন পাখি ভেজা পাখা ঝাপটে নিয়ে বলে উঠতো, 'হবেই তো। বাপের বাড়ি গেলে আবার কেউ শ্বশুরবাড়ির কথা মনে রাখে নাকি ?'

'আচ্ছা ঠিক আছে।'

গুরুগম্ভীর ঘোষণা, 'ওই জামাই অষ্টমী না কি ওইতে কে যায় দেখা যাবে।'

'জামাই অষ্টমী। হি হি হি!'

ঝরনা-ঝরা শব্দের ধাক্কায় ধাক্কায় কথার শেষটা গড়িয়ে যায়, 'কী জ্ঞানবান ব্যক্তি। বলে দেবো বাবাকে, আপনার ছেলের এই বিদ্যে হচ্ছে। অষ্টমী নয় মশাই জামাই ষষ্ঠী।...কে না যায় দেখা যাবে। দেখবো গুরুজনের কথা লঙ্ঘন করার সাহস কার আছে।'

অদ্ভুত ডাকাবুকো মেয়ে।

কোনো কিছুতেই ভয় খেতে জানে না।

মনে মনে খেলেও মুখে প্রকাশ করবে না। ওই নির্ভীকতার আকর্ষণেই তো কিশোর ছেলেটা প্রথম আত্মসমর্পণ করে বসেছিল।

আর অন্য একজন ?

অদ্ভুত এক পরিস্থিতিতে পড়ে নতুন করে যার সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা ? সে মানুষটা যেন ভয় দিয়েই গড়া।

অহেতুক ভয় !

কত বিচিত্র প্রকৃতির মানুষ নিয়েই এ ভুবনের কাজ কারবার !

সোমনাথই কি একটি বিচিত্র চরিত্রের নয় ?

সোমনাথ তাঁর সেই প্রথমা প্রিয়ার দুর্মতিতে ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ বিদ্রোহী— তবু তাঁর আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবার ভয়ে আর একজনের প্রতি কতবড় একটা অন্যায় অবিচার করে চলেছেন দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর।

কিন্তু সে যদি অমন কাদামাটির পুতুল না হতো ? যদি কঠিন ধাতুর প্রতিমার মূর্তিতে আপন অধিকারের সিংহাসন দখল করতে চাইতো ? কী করতেন সোমনাথ ?····জানেন না সেটা সোমনাথ। তাঁর ভদ্রর মার্জিত মনের প্রকৃতিতে অশান্তিকে বড় ভয়। বড় ভয় জীবনের গভীর গোপনতম স্থানটির উদ্‌ঘাটনে।

এই জন্যই তিনি তাঁর দ্বিতীয়ার প্রতি একান্ত কৃতজ্ঞ।

তবু—

তবু সেইটুকুই কি সব ?

সোমনাথ রায়চৌধুরীর জীবনের পরিধি কি শুধু ওইটুকু ?

কলকাতা থেকে ফেরার সময় ইস্তকই দেখছিলেন শুভঙ্করী স্বামীর মুখের চেহারা গম্ভীর ভারাক্রান্ত। যেন কোনো আঘাতে আহত।

বাড়ির অন্য অনেকেই লক্ষ্য করেছে এটা, এবং ব্যাপারটা যেন নবদুর্গাকে ধরে করে বাপের বাড়ি পাঠানো ঘটিত। সেই কথা ভেবে নিঃসংশয় হয়ে বিচিত্র ধারায় আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু শুভঙ্করী তো ওইতে নিঃসংশয় হতে পারেন না ? শুভঙ্করী অনুমান করছেন কারণ অন্য। কলকাতায় কিছু ঘটেছে। কী ঘটেছে ? কী ঘটতে পারে ? জানা দরকার। যদিও এই মানুষ 'মানুষ' হয়ে ওঠা পর্যন্ত ছেলেবেলার সেই মানুষটা আর ছিল না। এ মানুষ সম্পূর্ণ নিজের মধ্যে সংহত কাউকে আপন সুখ দুঃখ চিন্তা দুশ্চিন্তার শরীক

করতে রাজী নন, তবু শুভঙ্করী তো নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন না।

বিকেলে বলে দিয়েছেন, রাত্রে শুধু দুগ্ধ পান করে থাকবেন। অতএব শরীরের দোহাই দিয়ে মনটাকে আবৃত রাখতে চান।

কিন্তু ডাকাবুকো শুভঙ্করী তো তাতেই ভয় খেয়ে ছেড়ে দিতে পারেন না।

শুভঙ্করী যথাক্ষেত্রে আবির্ভূত হলেন। হাতে নিয়ে এলেন একটি ঝকঝকে কাঁসার থালার উপর বসিয়ে রাখা সরপোষ ঢাকা ধবধবে রূপোর গ্লাসে গরম দুধ, ছোট্ট রুপোর রেকাবিতে দুটি সুগোল কাঁচাগোল্লা এবং রুপোর ডিবেয় গুটি কয় ছাঁচি পানের খিলি।

এ পান শুভঙ্করীর নিজের হাতে তৈরী কেয়া খয়ের দিয়ে সাজা, কাঁচাগোল্লা দুটি ঘরের গরুর দুধে নিজের হাতে বানানো। সব সময় নবদুর্গার হাতে চালান দিলেও, সোমনাথের আহার্য বস্তুর সব কিছুই শুভঙ্করী নিজের হাতে তৈরি করেন। এ সেই কোন্ ছোটবেলা থেকে।

ঘরের কোণে বসানো পাথরের ত্রিপদীর উপর থালাটা বসিয়ে রেখে শুভঙ্করী নিজে বসলেন পালঙ্কের ধারের পাথরের জলচৌকিটায়। যেটা দিয়ে ওঠা হয়।

সোমনাথ পালঙ্কের উঁচু গদির বিছানায় শুয়ে আছেন, বুক পর্যন্ত একখানা পাতলা বালাপোষ ঢেকে, চোখের উপর ডান হাতটা আড় করে চাপা।

শুভঙ্করীর ঘরে ঢোকা টের পেয়েও চোখের থেকে হাত সরালেন না।

বহুদিন পরে শুভঙ্করীর রাত্রে এই শয়নকক্ষে পদার্পণ। হ্যাঁ, বহুদিনই। যতদিন নবদুর্গার আবির্ভাব।

নবদুর্গাকে নিয়ে এসে পর্যন্ত শুভঙ্করী স্বেচ্ছায় এ ঘরের দখলি স্বত্ব ত্যাগ করেছেন। নিত্য নতুন সাজে সাজিয়ে সতীনকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

প্রথম প্রথম সোমনাথ ক্ষোভে বিরক্তিতে স্তব্ধ হয়ে থাকতেন,

পাশের বসবার ঘরের ফরাসে রাত্রি যাপন করতেন, এবং এ নিয়ে কথা তুলতে এলে শুভঙ্করীকে কোন্ ভাষায় ধিক্কার দেবেন তা মনে মনে ঠিক করতেন। কিন্তু আশ্চর্য, খবরটা যে শুভঙ্করীর জ্ঞানগোচরে পৌঁছেছে এমন মনে হতো না।

অবশেষে অনুভব করলেন, সেটা পৌঁছবার কথা নয়। নতুন বৌ যতই নিরীহ আর ছেলেমানুষ হোক, তবু মেয়েমানুষ। মেয়েমানুষ তার জীবনের নিভৃতের এই বঞ্চনার খবর কারো কাছে প্রকাশ করতে যায় না। বিশেষ করে জীবনের শরীকের কাছে। কে জানে তাতে স্বস্তি পেলেন, না অস্বস্তি পেলেন! তবে প্রত্যাশা খর্ব হলো।

আরো পরে একদিন ঘটনার মোড় নিলো। ঘটলো অন্য ঘটনা। একদিন চুপচাপ বেচারি মেয়েটা তাঁর ফরাসের বিছানার ধারে এসে দাঁড়িয়ে মিনতির গলায় বললো, 'আপনি কেন আমার জন্যে অসুবিধে ভোগ করবেন, আমি ওদিকে লাবণ্য ঠাকুরঝির ঘরে শুতে যাচ্ছি।'

সোমনাথ সচকিত হলেন।

সেটা তো আবার একটা লোক-জানাজানি কেলেঙ্কারী! তাড়াতাড়ি উঠে বসে বললেন, 'না না আমার কোনো অসুবিধে নেই, বেশী রাত্ত অবধি পড়াশুনো করাই আমার অভ্যাস।'

ক্ষীণ কণ্ঠ উচ্চারণ করলো, 'কিন্তু সারারাত?'

'এই বইটই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়ি আর কি! যাও যাও তুমি শুয়ে পড়গে—'

আরো অস্ফুট কণ্ঠ উচ্চারণ করে, 'নিজের বিছানায় পড়াশুনো করলেই হয়। আমি তো—'

'আমি তো' টা কী তা শেষ করেনি।

কিন্তু পরে বুঝেছিলেন সোমনাথ, বলতে চেয়েছিল, 'আমি তো মাটিতে শুই।' বলে উঠতে পারেনি তবু নতমুখে দাঁড়িয়ে আছে দেখে অস্বস্তি আসে। বয়েসে কম, কিন্তু দীর্ঘছন্দ গঠন ভঙ্গিমা যুবতী নারীজনোচিত। তাই আস্ত একটা মানুষ দাঁড়িয়ে আছে বলেই মনে হচ্ছিল।

সোমনাথ বোধহয় ওকে ভাগাবার জন্যেই গম্ভীর হলেও ঈষৎ কৌতুকের গলায় বলেছিলেন, 'তোমার কি একা ভয় করে ?'

'না—'বলে ও ঘরে চলে গিয়েছিল নববধূ নবদুর্গা। ওই না-টা যেন একটু স্পষ্ট শুনিয়েছিল। একটা আর্তনাদের মত।

তারপর ?

তারপর যেন খুব অস্পষ্ট একটা স্বর ঘরের বাতাসে ভেসে ভেসে যেন খোলা জানলার পথে গঙ্গার কোলে গিয়ে বিলীন হচ্ছিল।

অস্বস্তি বোধ করলেন সোমনাথ।

উঠে পড়ে দেখলেন মেঝেয় পাতা কার্পেটের উপর পড়ে সেই দীর্ঘচ্ছন্দ দেহটি যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে। সোমনাথ প্রায় শিউরে উঠে বললেন, 'এ কী! এখানে কেন? পায়ের ধুলোর ওপর? ছি ছি! বিছানায় উঠে শোও।'

সাড়া পেলেন না।

বিছানার দিকে তাকিয়ে দেখলেন।

নিভাজ নির্মল দুগ্ধফেননিভ শয্যা, কোনোদিন কারো স্পর্শ পড়েছে বলে মনে হলো না।

ধীরে কাছে এসে গম্ভীর সস্নেহ কণ্ঠে বললেন, 'ওঠো, বিছানায় উঠে শোও। আমি এ ঘরেই বইটই নিয়ে আসছি।'

উঠে বসলো, কিন্তু পালঙ্কে উঠে শোবে এমন ভাব প্রকাশ পেলো না। দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে বসেই থাকলো। সোমনাথ একটু ইতস্ততঃ করলেন, তারপর একটু নীচু হয়ে ওই গুঁজে থাকা মাথাটায় একটা হাত রেখে আরো নরম গলায় বললেন, 'কথা না শুনলে আমি কিন্তু খুব রাগ করবো।'

ছিপছিপে পাতলা লম্বা দেহটা যেন চমক খেয়ে উঠে দাঁড়ালো। সোমনাথ পালঙ্কের ধারে পা ঝুলিয়ে বসে একটু হেসে বললেন, 'সেকেলে কাণ্ড, আধমানুষ ভোর উঁচু পালঙ্ক! চৌকিটার সাহায্যে উঠে পড়।'

তদবধি এই প্রকাণ্ড পালঙ্কটার একাংশের অধিকারিণী নবদুর্গা। একাংশের, কিন্তু অর্ধাংশের কী ?

শুভঙ্করীর ব্যবহারে কিন্তু এই দীর্ঘ ব্যবধানের চিহ্ন প্রকাশ পেলো না। যেন রোজই আসেন, যেমন আগে আসতেন।

পালঙ্কের ধারে দাঁড়িয়ে উদ্বিগ্ন গলায় বললেন, 'কী গো, জ্বর-জাড়ি হলো না তো ?'

সোমনাথ চোখের উপর থেকে হাত না নামিয়েই সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন, 'না।'

শুভঙ্করী তবু এগিয়ে এলেন, আস্তে স্বামীর কপালে একটু হাত ঠেকিয়ে বললেন, 'কী জানি বাবু, দত্ত জ্যেঠিমার নাতি বলছিল কলকাতায় হঠাৎ কোথা থেকে এক জ্বর এসেছে ডেঙ্গু না ডাঙ্গু কী যেন নাম। মানুষকে একেবারে জেরবার করে দিচ্ছে। ভয় হচ্ছে।'

সোমনাথ এখন চোখের ঢাকাটা সরিয়ে একটু বিদ্রূপের গলায় বলেন, 'কলকাতার খবর তা হলে তোমার নখদর্পণে ? অমন একজন সংবাদদাতা যখন জুটেছে।'

'আহা ! সব সময় তার কথা শুনতে যাচ্ছি নাকি ? বলছিল তাই শুনতে পেলাম। সকাল থেকে দেখছি তোমার মুখের চেহারা যেন কেমন কেমন। নিত্যি কলকাতায় যাওয়া আসা—'

সোমনাথ এখন উঠে বসেন।

দেওয়ালে লাগানো দেওয়ালগিরির মধ্যে জ্বলছে মৃদু মোমের আলো। ঠাণ্ডার জন্যে বাইরের দরজা জানলা বন্ধ, ঘরের মধ্যে যেন পরীর দেশের স্নিগ্ধ সুষমা। অথচ ঘরের মালিকের মনের মধ্যে তীব্র দাহ।

উঠে বসে সেই দাহর গলায় বলেন, 'কলকাতায় যাওয়া আসা এবার ছাড়বো ঠিক করেছি। ছাড়তে হবে।'

শুভঙ্করী ওই মৃদু মোমের আলোতেও স্বামীর মুখের রেখা ধরবার

চেষ্টা করেন। কিছু একটা ঘটেছে সেখানে মনে হচ্ছে। কিন্তু কী?

তবে জিগ্যেস করার ধার দিয়ে যান না, হেসে বলে ওঠেন, 'তুমি ছাড়বো বললেই কলকাতা তোমায় ছাড়বে? তোমার সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিতরা, তোমার সেই বাংলা শিখিয়ে সাহেব বুড়ো, তোমার এতো এতো সব সভা—'

'সব ছেড়ে দেবো! দিতে হবে।'

সোমনাথ স্বভাববহির্ভূত ঈষৎ উত্তেজিত গলায় বলেন, 'শ্রদ্ধা সম্মানের অনেকখানি উঁচু আসনে বসিয়ে রেখেছে ওরা আমায়। জানে না আমার যথার্থ পরিচয় কী! আর আমি সে পরিচয় গোপন করে সেই শ্রদ্ধা সম্মানের পশরা কুড়োচ্ছি। কিন্তু হঠাৎ যেদিন আসল পরিচয়টা প্রকাশ হয়ে পড়বে? ভাবতে পারো সেদিন কী লজ্জা! কী গ্লানি!'

কথাটা কি সোমনাথ শুভঙ্করীকেই বলছেন? না নিজেকে?

শুভঙ্করী অনুভব করলেন, তিনি উপলক্ষমাত্র। কথাগুলো উনি নিজেকেই বলছেন। শুভঙ্করা তো ঠিক ধরতে পারছেন না কথার অর্থটা?

কিসের পরিচয়?

গ্রামের গৌরব, শহরের পণ্ডিতদের মধ্যে একজন, কুলে মানে বংশ-গৌরবে সমাজের অগ্রগণ্য এই রূপবান বিত্তবান বিশাল মানুষটার মধ্যে এ কী অদ্ভুত চিন্তার জ্বালা?

বলে না উঠে পারলেন না, 'ব্যাপারটা কী বল তো? কিসের পরিচয়? তোমার আবার কোথায় কিসের ভয় লজ্জা?'

সোমনাথ স্থির গম্ভীর গলায় বলেন, 'সত্যি ভুলে যাচ্ছ? না ভুলে যাবার ভান করছ?'

'কী যে বলো! তোমার কাছে আবার ভান করবো কিসের।'

সোমনাথ ক্ষুব্ধ হাসি হেসে বলেন, 'আমার কাছেই তো সেটা করে আসছো এযাবৎ। তবু সত্যিই ভুলে গেছ ধরে নিয়েই বলি তাহলে—

গত কাল অপরাহ্নে আমাদের বহু বিবাহ নিবারণীর যে সভা হলো, তার পরিচালনার দায়িত্ব ছিল আমার। সভা অন্তে যখন সভাকক্ষ থেকে বেরিয়ে আসছি তখন দু'টি যুবকের কথা কানে এলো—'

একটু থামলেন সোমনাথ।

তারপর ঈষৎ ব্যঙ্গের গলায় বললেন, 'একজনের বক্তব্য, সোমনাথ বাবুর বক্তৃতা-টক্তৃতা তো বেশ জোরালো, কিন্তু নিজের না কি দুটো বিয়ে! অন্যজনের তীব্র প্রতিবাদ, স্বয়ং ভগবান এসে বললেও একথা বিশ্বাস করতে রাজী নয় সে। খুব মৃদুস্বরেই বলছিল, তবু কানে এসে গেল। বিষের তীরের মত এসে ঢুকে গেল। তদবধি মাথার মধ্যে তাব ক্রিয়া চলছে। ঠিক করেছি কলকাতার সমাজে স্পষ্ট ভাষায় সত্য প্রকাশ করে সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে চলে আসবো।'

শুভঙ্করী কি ভয় খান না?

খান।

তবু তিনি স্বভাব ধর্মে ভয় চাপা দিয়ে জোর গলায় বলেন, 'এটা বাবু তোমার বেশী বাড়াবাড়ি। যেন কী এক মহা পাতকের ব্যাপার। তোমাদের রাজা রামমোহনও তো শুনেছি তিন তিনটে বিয়ে করেছিলেন।'

সোমনাথ আরো ক্ষুব্ধ গলায় বলেন, 'রাজা দশরথও তাই করেছিলেন। ইতিহাসে তিনটি কেন, তিনশোর নজীরও আছে। সেই পথটাই নিশ্চয় আদর্শের পথ নয়।'

শুভঙ্করী একটুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে বলেন, 'যা হয়ে গেছে, তার তো চারা নেই। এখন দু'টোর মধ্যে একটা কমলেই কি তোমার কলঙ্ক কমবে? তা কমবে না, তখন সে চেষ্টা করতে যাবো না। মনে কর—' একটু হেসে ফেলে বললেন, 'মানুষ যেমন পিঠের কুঁজ, পায়ের গোদ, আর হাতের ছ'টা আঙুল মেনে নিয়ে বয়ে বেড়ায়, তেমনি দু'টো পরিবার নিয়ে বয়ে বেড়াতে হবে তোমায়। উপায় কী?'

উদাহরণগুলি চমৎকার!

সোমনাথ অস্থির ভাবে কোলে রাখা বালিশটাকে মুচড়ে মুচড়ে দলিত করতে করতে বলেন, 'জ্ঞান দানের পদ্ধতিও চমৎকার! কিন্তু সোমনাথ রায়চৌধুরীর অবস্থাটা যে এখন নিরুপায়ের, সেটা বলে না দিলেও জানার অসুবিধে নেই।'

শুভঙ্করী বলেন, 'অবস্থাটা যখন নিরুপায়ের তখন এতো ভেবে আর কী হবে? দুধটা গরম থাকতে খেয়ে ফেলো।'

সোমনাথ জানেন এ নিয়ে তর্কে বৃথা শক্তিক্ষয়। বিনা বাক্যে দুধ সন্দেশ খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ে বলেন, 'আলোটা নিভিয়ে দিয়ে যেও।'

যেও!

শুভঙ্করী তো আজ যাবার জন্যে আসেন নি।

নীচের তলায় ওদের শুনিয়ে শুনিয়ে বলে এসেছেন, 'কি জানি কেমন থাকবেন! চেহারাটাও ভাল দেখাচ্ছে না, খাব না বললেন। দেখি ভজাকেই বার ঘরটায় থাকতে বলি, কি আমিই থাকি।'

হিতৈষী মানদাখুড়ী তাড়াতাড়ি আগ বাড়িয়ে বলেছেন, 'আবার ভজা কেন? তুমিই থাকোগে না।'

লাবণ্য সেই গোয়ালে ধোঁয়া দিয়ে বলেছিল, 'তাই থাকো গে না বাপু। লজ্জার তো কিছু নেই।'

শুভঙ্করী শাশুড়ী মানদার কান বাঁচিয়ে বলেছিলেন, 'না, লজ্জার আবার কী আছে? পর পুরুষ তো আর নয়।'

শুভঙ্করী চলে এলে ওদের মধ্যে যে কথায় স্রোত বইলো, তা শুনতে পেলে অবশ্য লজ্জায় মাথা কাটা যেতো তাঁর।

ঝোঁকের মাথায় সোয়ামীকে সতীনের হাতে সমপর্ণ করে দিয়ে এখন গিন্নী পস্তে মরছেন, এইটাই এ আলোচনার বিষয়বস্তু।

কিন্তু সত্যিই কেন শুভঙ্করীর আজ এ সংকল্প? দীর্ঘদিনের রুদ্ধ বসনা কি হঠাৎ রুদ্ধদ্বার খুলে বেরিয়ে আসতে চাইছিল? নাকি····শুধুই মমতা?

ওই মানুষটা যে ভিতরে ভিতরে কত নিঃসঙ্গ হয়ে গেছে তা তো শুভঙ্করীর চোখ এড়ায় না।

আর সেটা অনুভবের সঙ্গে সঙ্গে একটা সূক্ষ্ম অথচ তীব্র অপরাধবোধ কি তাঁকে অহরহ পীড়া দেয় না ?

সোমনাথের এই যন্ত্রণার জন্য তো শুভঙ্করীই দায়ী।

কিন্তু তেমন অন্তরঙ্গ হয়ে কাছে এসে বসবার সুবিধে আর কই ?

লজ্জা! লজ্জাই তো এসে বাধা দেয়।

কতদিন নবদুর্গাই তো মিনতি করেছে—'দিদি, তুমিই যাও না। আমি তো ছাই একটা কথাও কইতে জানি না—'

'জানিস না শিখবি—'

শুভঙ্করী হেসে উঠে বলেছেন, 'আমরা তো এখন মরবারও সময় নেই রে। সেই রাত দুপুরের আগে ছুটি হবে না।'

অথচ হয়তো তখন সমস্ত হৃদয়খানা ব্যগ্র হয়ে উঠেছে সেই মানুষটার নিতান্ত কাছাকাছি গিয়ে বসে পড়তে। সেই কিশোরকাল থেকে সোমনাথের একটা বিলাসিতা চুলেব মধ্যে আঙুল চালিয়ে চালিয়ে আরাম করিয়ে দেওয়া।....কিন্তু কত কতদিন হয়ে গেল শুভঙ্করী তা করেননি। নবদুর্গাকে শিখোবার চেষ্টা করেছিলেন। নবদুর্গা শিউরে উঠে বলেছিল, 'ওরে বাবা, অতবড় মানুষটার মাথায় হাত দেওয়া যায় ? না দিদি, ও আমার কর্ম নয়!'

কিন্তু শুভঙ্করীর আজ ভয়ানক ইচ্ছে হয়েছে ওই ঈষৎ রুক্ষু এলো-মেলো চুলগুলোর মধ্যে আঙুল চালিয়ে আদর করি। তাই না লোকলজ্জাকে সবলে সরিয়ে ফেলে—

অথচ সোমনাথ স্থির গলায় নির্দেশ দিলেন, 'যাবার সময় আলোটা নিভিয়ে দিয়ে যেও।'

শুভঙ্করীর মুহূর্তের জন্য ইচ্ছে হলো কোনো কিছু না করে এই দণ্ডে ছুটে পালিয়ে যান। কিন্তু পরমূহূর্তেই নিজেকে স্থির করে নিয়ে বললেন, 'আর যদি না যাই ?'

সোমনাথ পাশ বালিশ আঁকড়ে ঘুমের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন, বালিশ

থেকে মাথাটা তুললেন, তারপর ঈষৎ কৌতুকের গলায় বললেন, 'তেমন অভাবিত ঘটনা যদি ঘটে, তাহলে থাক। সারারাত ধরে মোম গলুক।'

মোম গলুক!

মোম গলুক!

কিন্তু মোম কি এমন নিরুত্তাপ শীতলতায় গলে?

মোম গলতে উত্তাপের দরকার।

তা সে উত্তাপের উপকরণ বোধহয় কোথাও কোনখানে মজুত ছিল, শুধু অপেক্ষা করেছিল একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের। অগ্নিস্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠলো।

ঘরের মধ্যেকার সেই সিঁড়ির দরজাটা, যেটা একটু আগে শিকল তুলে দিয়েছিলেন শুভঙ্করী দুধের গ্লাস নামিয়ে রেখে, সেই শিকলটা খুলে নেমে যেতে গিয়ে আর যেতে পারলেন না। দুটি সবল বাহুর আবেষ্টনের মধ্যে পড়ে আবার উঠে আসতে হলো তাঁকে।

শীতল শয্যা আর উষ্ণ বহ্নিপাশের মধ্যে হারিয়ে যেতে যেতে শুনতে পেলেন শুভঙ্করী 'রাগ করলে চলবে কেন? অবিশ্বাস্য কথা বিশ্বাস করতে একটু সময় লাগে বৈ কি!'

বিজ্ঞ বিচক্ষণ গম্ভীর পণ্ডিত সোমনাথ রায়চৌধুরীও কি হারিয়ে গেলেন, না অবিন্যস্ত চুলের মধ্যে আবেগ মধুর মমতাময় কয়েকটি আঙুলের ডগার স্পর্শে বড় দরকার ছিল এইটির। বেদনাহত ক্ষুব্ধ হৃদয় যেন একটি পরম আশ্রয় খুঁজছিল। পেয়ে গেল হৃদয় সেই আশ্রয়। যে আশ্রয় চির চেনা, চিরকালের।

এই উষ্ণ কোমল নারীদেহখানিও তো তাই।

চির চেনা।

সোমনাথ রায়চৌধুরী নামের মানুষটার সদ্য যৌবনের অপটু আলিঙ্গনের মধ্যে যার উন্মেষ। কোমল কলিকা থেকে ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হয়েছে একটির পর একটি দল মেলে।

বিয়ের পর একবার মাত্র বাপের বাড়ী এসেছিল নবদুর্গা, 'জোড়ে'

আসতে হয় বলে। শুভঙ্করী তো সে বিয়ের কোন অনুষ্ঠানে ত্রুটি থাকতে দেন নি। প্রায় জবরদস্তি করেই স্বামীকে পাঠিয়েছিলেন 'জোড়ে' যাবার নিয়ম পালন করতে। কিন্তু সে নিয়ম পালন স্রেফ নিয়ম পালনই। নবদুর্গাকে ইলছোবা গ্রামে পৌঁছে দিয়েই কলকাতায় চলে গিয়েছিলেন সোমনাথ কাজ আছে বলে।

কাজ তো ছিলই।

কাজ তো থাকেই।

সপ্তাহে তিনদিন সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা, সপ্তাহে দুদিন মরিশ সাহেবকে বাংলা শেখানো, যখন তখন আহূত জনসভায় পৌরোহিত্য। আরো কত কী ?

সোমনাথ চলে যাবার পর নবদুর্গা গোটা কয়েক দিন ছিল, সে ক'দিন শুধু প্রতিবেশিনীদের কৌতূহল মেটাতে মেটাতেই কেটে গিয়েছিল।

কৌতূহল এবারেও, তবে সেবারের মত নয়। সেবারে অবিরত প্রশ্নের মাধ্যমে সবাই জেনে নিতে চেষ্টা করেছিল নবদুর্গার সগুলব্ধ রাজত্বের ঐশ্বর্যের বহরটা কতখানি, এবং পরবর্তী বিস্ময়পীড়িত মন্তব্যের প্রশংসার ছিল—ঘুঁটেকুড়ুনীর রাজরানী হওয়ার এমন দৃষ্টান্ত আর কবে কে দেখেছে ?

এবারে তা নয়।

এবারে অবিরত প্রশ্নবাণ, হঠাৎ চলে আসবার কারণ কী ? ওদিকে থেকে বলে কয়ে কাকাকে সাজিয়ে গুছিয়ে 'ইচ্ছুক' করে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা তো কারো অবিদিত নয়। কাকাতে পিসীতে দু'জনে মিলে সংবাদ সরবরাহের ভার নিয়েছিলেন।

তাই প্রতিটি পরিচিত জনের মুখের কথায় মুখের রেখায়, 'কেন ? কেন ? কেন ?' কী হল হঠাৎ ? কোন গোলমেলে ঘটনা ঘটেছিল ?

অবশ্য এটাও ভাবছে সবাই 'গোলমেলেই' যদি হবে, তাহলে সঙ্গে এতো উপহার উপঢৌকন কেন ?....পিসী তো আহ্লাদে আশঙ্কায়

ডুকরে কেঁদেই উঠলেন, 'হ্যারে সঙ্গে এতো মালপত্তর কেন? জন্মের শোধ পাঠিয়ে দেয়নি তো?'

অবাক্ নবদুর্গা পিসীকে শান্ত করেছে আশ্বাস দিয়ে দিয়ে। আর মনে মনে এই ভেবে হেসেছে, ওরা তো জানে না সেই দেবতার মত, আর ভগবতীর মত মানুষ দুটিকে। ওরা সাধারণ মানুষের মাপকাঠি দিয়ে মাপছে তাঁদের।

তবু এই অভ্যর্থনা আর কৌতূহলের ঝড় ভালও লাগছে। এই ইলছোবা গ্রামে নবদুর্গার না ছিল কোন আদর না ছিল কোন প্রতিষ্ঠা। উঠতে বসতে কাকার গালাগালি আর ভাতের খোঁটা এবং পিসীর আক্ষেপ বাণী। তিনি কি হাত আওড়াতেন 'অতি বড় সুন্দরী না পায় বর'। সত্যি তো—তেরো পেরিয়ে চোদ্দয় পা দেয় দেয়, চোদ্দপুরুষ নরকস্থ হয়ে বসে আছে, সেই মেয়ের এখনো বর জুটলো না। রূপের চুপড়ি নিয়ে কি ধুয়ে জল খাবে?

অবশেষে জুটে গেল বর।

রাজার মতন বর।

খুঁতের মধ্যে সতীন।....তাতে কী? ও লোকের দশটা বৌ পোষবার ক্ষমতা আছে। তা ছাড়া সতীন তো বাঁজা। নবদুর্গার কোলে যেই সোনার চাঁদ ছেলে আসবে, সে মাগীর গোয়ালঘরে ঠাঁই হবে।

এই পরিস্থিতি থেকে বিদায় নিয়ে গেছে নবদুর্গা নামের কিশোরী মেয়েটা। আজ এই ভরা যৌবনাকে দেখে তাকে মনে আনতেই শক্ত লাগছে লোকের।

রূপ ছিল বটে মেয়েটার, তবে এতো?

এই বহুবিধ শরাঘাতের মধ্যেও কিন্তু ভারী একটা মুক্তির স্বাদ পাচ্ছে নবদুর্গা!

ঐশ্বর্যের বন্ধন থেকে মুক্তিও যে একটা আরামদায়ক মুক্তির স্বাদ-গাহী, সে কথা জানা ছিল না নবদুর্গার। আসবার আগে ভেবেছিল বেশীদিন থাকতে পারবে না, ক'দিন থেকেই ফিরে যাবে চাঁপদানীতে।

তাই সোমনাথ যখন সস্নেহ গম্ভীর কণ্ঠে বলেছিলেন, 'ইচ্ছে হলেই চলে এসো—'তখন মনে মনে বলেছিল, সে ইচ্ছে তো এখন থেকেই শুরু হয়ে যাচ্ছে।

সেই শ্রীহীন সৌষ্ঠবহীন আগ্রহহীন ভগ্ন পিতৃভিটের তেমন কোনো আকর্ষণ অনুভব করছিল না, কিন্তু এসে পড়ে দেখল এ এক অদ্ভুত ভাল লাগা।

মুহূর্তে মুহূর্তে যেন বিস্ময়ের আর আনন্দের বিদ্যুৎ চমক। কী আশ্চর্য, ঘাটের ধারের সেই নোনা আতার গাছটা আজও তেমনি অক্ষয় অটুট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।····মুখুয্যেদের ভাঙা পাঁচিলের গায়ে যে চাঁপাগাছটা বিশাল শাখাপত্র নিয়ে সরু পথটা প্রায় ছায়াচ্ছন্ন করে রাখত, তেমনি রয়েছে সে। ওই গাছটা সারা গরমকাল পাড়াসুদ্ধ ছেলের লীলাক্ষেত্র ছিল। পাঠশালায় যাবার প্রাক্কালে একবার চাঁপা গাছটাকে না ঠেঙিয়ে যেতো না কেউ।

কমলিদের বাড়ির ছাদের আলশেয় এখনো তেমনি করে ইঁট চাপা দিয়ে কাপড় ঝুলিয়ে ঝুলিয়ে শুকোতে দেয়, মুকুন্দ বৈরাগী এখনো তেমনি সকাল বেলা খঞ্জনি বাজিয়ে বাজিয়ে নামগান করে বেড়ায়।

দক্ষ ঠানদি এখনো পাড়ায় পাড়ায় লোকের ঝি-বৌকে জ্ঞান দিয়ে দিয়ে ফেরেন। গ্রামের বৌ-ঝির চালচলন ঠিক রাখাই তাঁর পেশা। ঠানদির পিঠের গড়নটা একটু কুঁজো হয়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই পরিবর্তন হয়নি। এখনো খনখনে গলা, খটখটে চলন, টনটনে জ্ঞান।

অবাক্ অবাক্! নবদুর্গার ছেলেবেলার খেলার জায়গাগুলো ঠিক তেমনিই আছে। সেই কাঁঠাল গাছের মোটা গুঁড়ির নীচের দিকে দুটো মোটা ডালের ফ্যাকড়া, যাতে দড়ি বেঁধে দোলনা টাঙিয়ে দুলতো নবদুর্গা। অবিশ্যি তেমন সুখকর মুহূর্ত নবদুর্গার কমই আসতো, একটুক্ষণ খেলতে না খেলতেই পিসী হাঁক দিতো, 'নবু, এই নবু! কোন্ চুলোয় গিয়ে বসে আছিস নিচ্চিন্দি হয়ে? ডেকে গলা ফাটিয়ে ফেললাম।'

নবদুর্গাকে না দেখতে পেলেই যেন তার সৃষ্টি রসাতলে যেতে বসতো। তবু 'জ্যোছনারাতের' জবরদস্তিতে খেলতে আসতে হতো। ভটচায্যিদের ভবানীর সঙ্গে 'জ্যোছনারাত' পাতিয়েছিল নবদুর্গা। সেও অবিশ্যি ভবানীরই চেষ্টায় আর পরিকল্পনায়। ভবানীই ঠোঁট উলটে বলেছিল, 'সই, গঙ্গাজল, সাগর মকর, দেখনহাসি আতর, ল্যাভেণ্ডার, চামেলী ফুল, এসব বাবা বড্ড সেকেলে হয়ে গেছে, আয় তোর সঙ্গে আমি 'জ্যোছনারাত' পাতাই।'

শুনে নবদুর্গার চোখ কপালে, 'ও আবার কী পাতানো রে? ডাকবো কী করে?'

'কেন, 'জ্যোছনারাত জোছনারাত' করেই। ছোট মাসী তো তার বন্ধুর সঙ্গে 'ভোরের শিউলী' পাতিয়েছে। ডাকে না তাই বলে?'

'জ্যোছনারাত' তার প্রাণের বন্ধু।

কিন্তু সেই জ্যোছনারাত নবদুর্গার বিয়ে দেখতে পায়নি। সে তখন তার শ্বশুরবাড়িতে বিষ্ণুপুরে।

এ পক্ষে এমন কিছু ঘটার বিয়ে হয়নি নবদুর্গার, যে বিয়েতে কাকা ভাইঝির সইকে শ্বশুরবাড়ি থেকে নেমন্তন্ন করে নিয়ে আসবে। ঘটা অবশ্য ও পক্ষেও কিছু ঘটেনি, তবে বরের বাড়ি থেকে কনের বাড়িতে তত্ত্ব এসেছিল বিস্তর। এতো বিস্তর যে গ্রামসুদ্ধু সবাই একবাক্যে বলেছিল, স্মরণের মধ্যে কারুর এমন তত্ত্ব আসা তারা দেখেনি।

সেই তত্ত্ব 'জ্যোছনারাত' দেখতে পেলো না এ দুঃখ রাখবার জায়গা ছিল না নবদুর্গার।

ইলছোবায় পা দিয়েই নবদুর্গা জ্যোছনারাতের কথা শুনলো এখন বিষ্ণুপুরেই আছে, তবে আসবে শীগগির ইলছোবায়।

'আসবে তো? ঠিক?'

'আসবে বৈ কি?'

ভবানীর মেজখুড়ী মুখ টিপে হেসে বলেছিল, 'না এসে যাবে কোথা?'

নবদুর্গা এ কথার তাৎপর্য বুঝতে পারেনি। বলেছিল, 'কেন? কী হয়েছে?'

'নতুন কিছু নয়', খুড়ী আর একটু মুখ বাঁকিয়ে উত্তর দিয়েছিল, 'বছর বছর যা হয়। অগতির গতি তো এই বাপের বাড়ি। বৌটাকে ন' মাস পর্যন্ত খাটিয়ে অন্তদন্ত সার করে বাপের বাড়ি ফেলে দিয়ে যাওয়া, তারা খাইয়ে মাখিয়ে আঁতুড় তুলে কোলের ছেলেকে ছ' মাসেরটি করে পাঠিয়ে দিক, আবার বছর ঘুরতেই—'

এরপর আর অবোধ্য কিছু থাকে না।

কিন্তু বুঝে ফেলে বুকটা যেন ধ্বক্ করে ওঠে নবদুর্গার। হঠাৎ মনে হল জ্যোছনারাতের সঙ্গে তার যেন আকাশ পাতাল ব্যবধান ঘটে গেছে। অনেক দূরের মানুষ হয়ে গেছে ভবানী! নবদুর্গা তার নাগাল পায় না।

কাল্পনিক এই কষ্টে চোখে জল এসে গেল নবদুর্গার। তাড়াতাড়ি চলে গেল, 'আচ্ছা এলেই যেন খবর পাই' বলে।

জিগ্যেস করতে পেরে উঠলো না, ক'টি ছেলেমেয়ে জ্যোছনারাতের।

বাড়ি ফিরে এসেও বারে বারেই চোখটা ভিজে আসে নবদুর্গার।

একটা রুদ্ধ অভিমানের ভারে বুকটা যেন পাথর হয়ে থাকে। কার ওপর এই অভিমান জানে না নবদুর্গা।···মনে হচ্ছে তার আজন্মের প্রিয় সখীই তার সঙ্গে বুঝি বা একটা দারুণ দুর্ব্যবহার করেছে।

নবদুর্গা কি তাহলে এখনই চাঁপদানীতে ফিরে যাবে?

একটি পরম আশ্বাসের বাণী তো রয়েছে বুকের সম্বলে, ইচ্ছে হলেই চলে এসো।

এই মুহূর্তেই তো চলে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে নবদুর্গার।····কিন্তু কেন?

'কে? নবু? এসেছো? এসো মা।'

এখন পিসীর কাছে আদরের সীমা নেই নবদুর্গার। তাই নবদুর্গা ভবানীদের বাড়ি থেকে ফিরতেই পিসী উথলে ওঠেন, 'সেই কখন বেরিয়ে

গেলি—আমি তোর জন্যে হন্যে হয়ে ঘরবাব করছি।'

নবদুর্গা অবাক্ হয়, 'কেন পিসী ?'

'আহা মা, তোমার জন্যে দু'খানা মুগ সাপটা আর মিঠে আলুর পুলি করে রেখেছি, তা' কখন যে তোমার খাবার সময়। এই তো বেলা গড়িয়ে গেল, এরপর রাতে ভাত খেতে বসে হয়তো বলে বসবে—খিদে নেই।'

নবদুর্গার মুখে এলো, খিদে আমার এখন নেই।....কিন্তু সে কথা তো বলা যায় না, তাই বলে, 'ওমা মুগ সাপটা ? মিঠে আলুর পুলি ? বাবাঃ আমি এসেছি পর্যন্ত তুমি রোজ দিন কত যে খাটছ পিসী। কত খাবো ?'

পিসী বিগলিত গলায় বলেন, 'এসব যে তুমি বড় ভালবাসতে মা। জিনিসের অভাবে কবে আর হাত মেলে করতে পেরেছি ? এখন হয়েছে 'তোর ধন, তোকে খাওয়াচ্ছি হ্যা ত্যাখ মোর কলাটি।' সবই তো তোমার আনা—'

নবদুর্গা লজ্জিত গলায় বলে, 'কী যে বলো পিসী ! সে সব যেন এখনও আছে ! মধুসূদন দাদার দইয়ের ভাঁড় বুঝি ?'

পিসী আরো বিগলিত হলো, 'না মা। সে কথা বললে চলবে না। অপরিযাপতো জিনিস সঙ্গে এনেছো তুমি। তবু ভাল যে সতীন মাগী ব্যাগড়া ত্যায়নি।'

আসা পর্যন্তই তো দেখছেন পিসী সতীন সম্পর্কে নবদুর্গার কী সসম্ভ্রম সমীহ এবং ভালবাসা, তবু এই ধরনের কথাই বলে থাকেন তিনি।

নবদুর্গা ক্ষুব্ধ হয়, 'কি যে বল পিসী। যা দিয়েছেন তিনিই তো দিয়েছেন। আমি তো জানিও না। বলেছি তো তোমায়, সতীন বললে তাঁকে ছোট করা হয়। মায়েব পেটের বড় বোনের মতই।'

পিসী বেজার গলায় বলেন, 'কী জানি মা, কোন্ সগ্‌গো থেকে এসেছেন তিনি।....আমার তো সন্দ হয়, তোমায় কিছু গুণতুক করে রেখেছে।'

এখন নবত্নর্গা হেসে ফেলে। না হেসে পারে না। 'আমায় গুণতুক করে তাঁর লাভ ?'

পিসী আরো বেজার গলায় বলেন, 'লাভ লোকসান আর তুমি কি বুঝবে মা ! চিরকালের ন্যাকা তুমি। নচেৎ এ চিন্তা তোমার আসে না, তোমার পেটেও একটা বাচ্চাকাচ্চা আসে না কেন ? তিনি বাঁজা বলে তুমিও বাঁজা হবে ? তুকতাক না হলে এমন হয় ?'

একটু আগেকার রুদ্ধ অভিমানের ভার প্রবল একটা জলোচ্ছ্বাস হয়ে উছলে উঠতে চায়। কষ্টে তাকে সামলে নিয়ে বলে 'তিনিই জোর করে বিয়ে দিয়েছিলেন পিসী,' বলেই চলে যায় অন্য ঘরে।

আর মনে মনে সংকল্প করে, কালই আমি বলবো কাকাকে ওখানে খবর পাঠাতে, যাতে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করেন দিদি। আমি আর এদের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারি না। এদের যেন বড় ছোট, বড় নীচ লাগে। ওখানেও এ ধরনের কথার চাষ আছে, কিন্তু তারা তো নবত্নর্গার নিজের লোক নয়। তাদের নীচতায় নবত্নর্গার এমন কষ্ট আসে না।

নবত্নর্গার তো এরাই সব থেকে আপন।

এই পিসী আর সেই কাকা। যে কাকা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে খাল্গি জানতে চান, 'কতখানি জমিদারি জামাইয়ের, আর তার আয় কত ?'

কিন্তু নবত্নর্গার সংকল্প কাজে পরিণত হলো না।

মুখুয্যে বাড়ির স্থবল এসে হাজির।

'কী রে বড়লোকের গিন্নী, আছিস তাহলে এখনো গরীব কাকার বাড়ি ?'

স্থবলও নবত্নর্গার আশৈশবের খেলুড়ি।

এসে পর্যন্ত দেখা হয়নি। কলকাতায় চাকরি করছে, ডেলি-প্যাসেঞ্জারী করে। আজ রবিবার, ছুটি তাই —

সেই বাল্যসাথীর চেহারাটা আর এখন 'বালক' তুল্য নেই, হঠাৎ

দেখলে হয়তো মাথায় কাপড়ই টানতো নবদুর্গা, কিন্তু ওর বাচনভঙ্গিতে যেন অনেকগুলো বছর পিছিয়ে গিয়ে সেই খেলাঘরে পৌঁছে গেল নবদুর্গা।

হেসে ফেলে বললো, 'ও আবার কী কথার ছিরি?'

'যা সত্যি তাই বলছি। তুই এসে ইস্তক যা মহিমা শুনছি। দেখা করতে আসতে তো ভয়ই করছিল।'

নবদুর্গা সেই অনেকগুলো বছর পিছিয়ে যাওয়া বয়সের ভঙ্গিতে বলে ওঠে, 'থাম থাম আর বানানো কথা বলতে হবে না। নিজেরই চাড় ছিল না তাই বল। কবে কোন্ জন্মের একটা খেলুড়ি ছিল মনে রাখতে তোর ভারী বয়ে গিয়েছিল কিনা! এখন শুনছি কলকাতার অফিসের বাবু হয়েছিস।'

নিজের কথায় যেন নিজেই মোহিত হয়ে যায় নবদুর্গা। এমন-এমন খোলা গলায় ঝরঝরিয়ে কথা বলতে পারে সে? ভারী ভাল লাগছে তো।

সুবল ওর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে দেখে কৌতুকের গলায় বলে, 'তা তোকে দেখে মা জ্যেঠিমার কথাগুলো অতিশয়োক্তি বলে মনে হচ্ছে না। চেহারাখানা যা বাগিয়েছিস! প্রায় ইংলণ্ডেশ্বরীর মাসতুতো বোন।'

নবদুর্গা মুখে আঁচল ঠেকিয়ে জোর হাসিটাকে আটকে বলে, 'ইংলণ্ডেশ্বরী! দেখেছিস বুঝি তাঁকে?'

কল্পনার চোক্ষে দেখেছি।

'খুব বাহাদুর! আয়, বোস।'

সুবল এদিক ওদিক তাকিয়ে চাপা গলায় বলে, 'তিনি কোথায়? সেই দেবী চামুণ্ডাটি?'

'কে?' অবাক্ হয় নবদুর্গা।

'নাঃ! এখনো দেখছি সেই রকমই ন্যাকা মার্কা আছিস তুই। পিসী! পিসী!'

ধ্যেৎ, দুর্বুদ্ধি ছেলে ! পিসীকে ওই সব বলা ?'

'যা সত্যি তাই বলছি। যাক গে, নেই তো ?'

'না। ঠাকুরবাড়ি গেছেন।'

'ভালই করেছেন ! আহা—' সুবল দুহাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বলে, 'ঠাকুর ওঁকে কৃপা করুন, দেব দ্বিজে মতি হোক।'

নবদুর্গা তার কাকার রাজাসন নড়বড়ে টুলটা টেনে এনে বলে, 'বোস।'

সুবল তাতে বসে পড়ে বলে, 'যাক তাহলে বলেই যাই ! মা অবিশ্যি আসবে, তবে আমার দিক থেকে বলে রাখি, সামনের সোমবার দুপুরে আমাদের ওখানে খাবি। অর্থাৎ নেমন্তন্ন।'

নবদুর্গা বলে, 'ওমা ! এসেই তো সেই রাত্তিরেই তোদের বাড়ি থেকে মাছ ভাত এলো আমার জন্যে। আবার কেন ?'

সুবল একটু রহস্যব্যঙ্গ হেসে বলে, 'আছে কারণ। এটা হচ্ছে নেমন্তন্ন।'

নবদুর্গা উল্লসিত গলায় বলে, 'কিসের ? তোর বিয়ের নাকি ?'

'বিয়ের !' সুবল কপালে হাত চাপড়ে বলে, 'হা অদৃষ্ট ! আছিস কোথায় ? এতদিন এসেছিস আর এখন সীতা কার পিতা ? বিয়ে ! সে তো তামাদি হয়ে গেছে। এ হচ্ছে পুত্রের অন্নপ্রাশন !

পুত্রের !

সুবলের ছেলের !

সত্যি নবদুর্গা ছিল কোথায়। এসেছে তো ক'দিন, কই সুবলের এতখানি পদোন্নতির খবর তো শোনেনি। ···তা নবদুর্গাই কি তেমন খুঁটিয়ে সব জিগ্যেস করেছে ? কখন করবে ?····এসে পর্যন্ত তো নবদুর্গা নিজেই প্রশ্নের স্রোতে ভেসে যাচ্ছে, প্রশ্ন করবার অবকাশ আর পাচ্ছে কই ?

সুবল অফিসে যায়, সুবলের টিকি দেখা যায় না এইটুকুই শুনেছে সুবলের বিষয় আর কথা হয়নি।

কিন্তু নবদুর্গারও কি সত্যি বালাসাথী সম্পর্কে তেমন ঔৎসুক্য ছিল? নবদুর্গা কি তার এই চির চেনা মানুষগুলোকে বসে বসে স্মরণ করেছে কোনোদিন?

মনে পড়ছে না।

নবদুর্গা যেন এতোদিন একটা ঘোরে কাটিয়েছে। সেখানে যেন নিত্য নিয়ে শাড়ির উৎসব। সেই সমারোহময় সংসারের পালাক্রমে ঘনিয়ে ওঠা দিনগুলো যে কোথা দিয়ে কেটে যায়। আর রাত্রিগুলো?

সেও তো একটা অস্পষ্ট আচ্ছন্নতা।

কিন্তু সুবল!

সেই সুবল! ছিপ তৈরি করে করে মাছ ধরা আর চার যোগাড় করে বেড়ানো যার প্রধান কাজ ছিল, আর কাজ ছিল অবলীলায় অন্যের বাগানের ফলভার হালকা করে নিজের করে নেওয়া।

সেই সুবল এতো মাতব্বর হয়ে গেল যে তার বৌ ছেলে, ছেলের অন্নপ্রাশন।

বিস্ময়ের আঘাতে কিছুটা স্তব্ধ হয়ে গেলেও নবদুর্গা তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে বলে 'ও বাবা, এতো মাতব্বর হয়ে গেছিস তুই?'

এখন সুবল লজ্জা লজ্জা গলায় বলে, 'আর বলিস না। ঠাকুমা বুড়ীর জ্বালায় ওই সব গেরো! নাতবৌয়ের মুখ না দেখলে না কি তাঁর সগ্‌গে যাওয়াও হবে না।...অথচ এই মরে সেই মরে। আর আমায় ফাঁদে ফেলে দিয়ে বুড়ী এখনো দিব্যি জলজ্যান্ত হয়ে উঠে ডাঁটা চিবোচ্ছে।

এতো মজার করে কথা বলে সুবল।

মনের ভাবটা যেন হালকা হয়ে যায়।

নবদুর্গা আবার হেসে ফেলে বলে 'ছিঃ, ওরকম বলতে আছে?'

'আমি তো বুড়ীকে উঠতে বসতে 'মর' বলি।'

'বড় কাজ করিস। চিরদিন একরকম রয়ে গেলি।'

'তা' ছু' পাঁচ রকম হবার ভাগ্যটা আর হলো কই বল? এ কি মেয়েছেলে? যে এই ছিল পাঁশকুড়ুনী, সেই হলো মহারানী। রাজা পাত্র এসে বিয়ে করে নিয়ে গেল সোনার মটুক পরিয়ে—'

হঠাৎ যেন একটা বিষণ্ণতার ধাক্কায় মনটা বিকল হয়ে যায় নবদুর্গার।....এরা যতটা ভাবে, নবদুর্গা কি সত্যিই ততটা সুখী? একেবারে অন্তরের অন্তঃস্থলে সেই সুখের স্বাদটা কোথায়?

নিজেকে নিয়ে বিশ্লেষণ করতে জানে না নবদুর্গা, হঠাৎ ওই বিষণ্ণতা অনুভব করে।

তাই আস্তে বলে, 'তবে তো চারখানা হাত গজালো।'

'হাত না গজাক, ডানা তো গজায়। তা' যাস সে দিন। তবে বলিসনি কাউকে আমি এসে নেমতন্ন করে গেছি।'

'ওমা, কেন? বলবো না কেন?'

'আরে বাবা, বুঝছিস না, বেহায়া বলে নিন্দে হবে। তাছাড়া— একটু দুষ্টু হাসি হেসে বলে, 'বৌ শুনলে হয়তো সন্দেহ করে বসবে, বাল্যসখীর ওপর এখনো প্রাণের টান রয়ে গেছে আমার।'

'ধ্যেৎ! এতো ইয়ে তুই।'

সুবল হেসে হেসে বলে, 'আমি ওকে ক্ষ্যাপাতে বলে রেখেছি কিনা তোর সঙ্গে আমার গলায় গলায় ভাব ছিল, নেহাৎ একেবারে সমবয়সী বলে সুবিধা হলো না।'

'আঃ সুবল। বড্ড ইয়ে হয়েছিস দেখছি। ক্ষ্যাপাবার আর জিনিস খুঁজে পেলি না?'

'আরে বাবা, এর চাইতে বেশী ক্ষ্যাপা আর কিসে ক্ষেপবে? ক্ষেপলে যা তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠে, দেখবার মতন। নভেল-টভেল বোঝে। বলে কিনা তা হলে বল প্রতাপ-শৈবলিনী!'

নবদুর্গা এবার ঘরে গিয়ে দুটো মোয়া আর এক গ্লাস জল নিয়ে এসে বলে, 'খা তো। নির্ঘাৎ তোর খিদে পেয়েছে, তাই আবোল তাবোল বকছিস।'

সুবল খেতে খেতে বলে, 'ঠাট্টা করলে কি হবে, ভেতরে ভেতরে আফসোসটা যে একেবারেই ছিল না, তা বলা যায় না, বুঝলি ? এখন তোকে দেখে শোক আরো উথলে উঠছে। তু'চার বছর আগে যে কেন জন্মালাম না ছাই।'

নবতুর্গা এখন গম্ভীর হয়ে বলে, 'খালি খালি ওই রকম ছাই-পাঁশ ঠাট্টা করলে কিন্তু যাব না বলছি।'

'এই মরেছে !'

সুবল তু'হাত উলটে বলে, 'এখনো তেমনি বোকাই আছিস তাহলে ? আচ্ছা বাবা আচ্ছা। আর ঠাট্টা টাট্টা নয়। যাস।....আর শোন খু—ব সেজেগুজে যাবি বুঝলি ?'

সেজেগুজে !'

নবতুর্গা ওর তুষ্টুমী হাসিমাখা মুখটার দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে, আহা ! বিয়ের সময় একবার উদ্দিশ করা হলো না, এখন ছেলের ভাতে আমি সেজেগুজে যাবো।'

'বিয়ের সময় ! হায়রে ! গরিবের আবার বিয়ে। নেহাৎ ডুবে মরার জন্যে গলায় একটা কলসী ঝোলানো। এই বৈ তো নয়।....যাক —যাস সেজে-গুজে। 'একজন' বেশ হিংসেয় জ্বলেপুড়ে মরবে।'

হাসতে হাসতে চলে যায়।

যেন একখানা হালকা সাদা নির্মল মেঘ নীল আকাশের ওপর দিয়ে ভেসে যায়।....নবতুর্গা অনুভব করে, সব কথাই ওর আপন খুশীর প্রকাশ। মালিন্য নেই কোনোখানে। থাকলে এভাবে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে গড়গড়িয়ে এমন সব কথা বলতে পারতো না।....ছেলেবেলা থেকে ছেলেটা ওই রকমই। মজা করে ভিন্ন কথা বলতো। বাপকে বলতো পিতৃদেব। মাকে বলতো স্বর্গাদপি গরিয়সী ! ..জ্যাঠাইমাকে বলতো দেবী সিংহবাহিনী ! আর নবতুর্গাকে মাঝে মাঝেই বলে উঠতো, তুর্গে তুর্গতিনাশিনী !

আশ্চর্য ! নবদুর্গা ওর এমন একটা বন্ধুকে প্রায় ভুলেই গিয়ে বসেছিল। বেটাছেলে যে মেয়েমানুষের বন্ধু হতে পারে না, এমন কোনো কথা নেই। ছেলেবেলার খেলুড়ি সমবয়সী, বরং বয়সে নবদুর্গা দু'চার মাসের বড়ই। ভাব ছিল খুবই। অথচ মনেই পড়েনি কতোদিন।

আচ্ছা, সুখী হবার জন্যে কি অনেক ঐশ্বর্যের দরকার? সুবলের তো ঐশ্বর্যের বালাই নেই। কত সামান্য মাইনের চাকরি করছে, তবু কেমন আহ্লাদে ভাসছে।

মানুষ যদি সব্বাই খুব গম্ভীর টম্ভীর না হয়ে সুবলের মতন হালকা হাসিখুশী হতে পারে, সংসারটা কি কিছু খারাপ হয়?

খারাপ কেন? ভালই তো হয়। সব সময় বুকের মধ্যে একটা পাথরের চাঁই বসানো থাকে না।

কিন্তু কেউই হালকা হতে পারে না। সবাই যেন কিসের ভারে ভারাক্রান্ত। এই দেখো না কেন, চাঁপদানী থেকে এসে পর্যন্ত নবদুর্গা লক্ষ্য করছে, কেউ তাকে 'তুই' বলছে না, সবাই 'তুমি' করে কথা বলছে। গুরুজনরাও। এমন কি কাকা পিসী পর্যন্ত। অথচ সুবল সেই পুরানো কালের মত সোজা সিধে 'তুই' করে কথা বলতে শুরু করে দিলো।

মনটা কী ভাল হয়ে গেল।

ওর কাছাকাছি যে থাকবে, সেই হালকা হয়ে যাবে। হালকা থাকবে।

নিজের সাময়িক মনোভাব নিয়ে যে কথা ভেবেছিল নবদুর্গা সেটা যে একেবারেই ভুল তা টের পেলো সুবলের ছেলের 'ভাতে' নেমন্তন্নে এসে।

সুবল নামের ওই পালক-হালকা লোকটার সঙ্গে যে মেয়ে ঘর করছে, সে একখানি জগদ্দল পাথর। তার মুখ দেখলেই মনে হয় বিশ্বের যাবতীয় নিমপাতার সম্ভার বুকে নিয়ে বসে আছে সে। আর বসে আছে পাথর সম।

ওই ভয়টা। ভার ঠেলবার ভয়েই কি সুবল সে চেষ্টার ধারে কাছে না গিয়ে নিজেকে পালক করে ফেলে উড়ে বেড়ানোটাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করেছে ?

নেমন্তন্নে এসে আরো একটা অভিজ্ঞতা হলো নবদুর্গার, গ্রামসুদ্ধ সবাই যেন নবদুর্গার সম্পর্কে তীব্র ভাবে সচেতন। নবদুর্গা যে এখনো পর্যন্ত 'মা' হতে পারেনি, এটা যেন পৃথিবীর আশ্চর্যতম ঘটনা। তা ছাড়া নবদুর্গার এই অসম বিবাহের মূল শর্তটাই যে ছিল ওই মা হওয়া : সে কথাটা সবাই একবার করে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে নবদুর্গাকে প্রত্যক্ষে, পরোক্ষে।

কেউই যেন সেটা ভুলতে পারছে না।

কারণ ভুলতে পারছে না যে নবদুর্গার প্রতিষ্ঠা অন্যমনস্ক হয়ে থাকতে পারছে না নবদুর্গার গায়ের স্বর্ণাভরণের ওজন সম্পর্কে। এতো সব পরে বাপের বাড়ি আসতে চায়নি নবদুর্গা, কিন্তু শুভঙ্করী ওর আপত্তি নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'এ মা, ন্যাড়া বোঁচা হয়ে গেলে বাপের বাড়ির দেশের লোক বলবে কী ? নিন্দে করলে তো শুভঙ্করীকেই করবে।'

এরপর আর উপায় কী, গায়ে সের দেড়েক কি দু'সের সোনা চাপিয়ে রাখা ছাড়া ? গা থেকে খুলে রাখা তো চলছে না। পিসী বলেছেন, 'খবরদার, অমন কাজটি কোরো না মা, চেনো তো ঘরের কুমীরটিকে ?'

এই কুমীরটি অবশ্য কাকা।

নবদুর্গা লজ্জায় আর সে কথা উত্থাপন করতে পারেনি। আর এখন আরো লজ্জা পাচ্ছে নেমন্তন্ন বাড়িসুদ্ধ সবাইয়ের গভীর দৃষ্টি সেই দেড় দু' সেরের দিকে। ওর জন্যে যেন বেচারি নবদুর্গা হয়ে উঠেছে একটা 'দ্রষ্টব্য'।

শুধু একজন তার ব্যতিক্রম।

সে হচ্ছে সুবলের বৌ সরসী। তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে সে

যেন এই সর্বাঙ্গলঙ্কারমণ্ডিতা দীর্ঘাঙ্গী সুন্দরী মেয়েটাকে দেখতেই পাচ্ছে না। নবদুর্গা নিজে থেকে একবার ভাব করতে এলো ছেলের ছুতো নিয়ে। নিজের গলার তিনগাছা হারের থেকে একগাছা খুলে ছেলের গলায় পরিয়ে দিয়ে বলে উঠলো, 'ওমা, এক্ষুনিই যে খুব চুলবুল করছে গো, খুব চালাক হবে দেখছি তোমার ছেলে! কার মতন দেখতে হয়েছে বল তো মায়ের মত না বাপের মত?'

বৌ এতো কথার কোনো উত্তর না দিয়ে ছেলের গলা থেকে হারছড়া খুলে নিয়ে বিছানার পাশে রেখে ছেলেকে বেশ বাগিয়ে কাঁথায় মুড়ে নিয়ে বেশ একটু গুটিয়ে বসলো।

নবদুর্গা আহত হলো। বলে উঠলো, 'ওমা ও কি হারটা খুলে দিলে কেন?'

বৌ বেজার মুখে ছেলের গায়ের উপর একখানা হাত আড়াল করে সংক্ষেপ উত্তর দিলো, 'বড়দের গায়ের গরম ছোটদের সহ্য হয় না অসুখ করে।'

শুনে তো নবদুর্গা হাঁ।

কতো বয়েস সুবলের বৌয়ের?

চোদ্দর বেশী কিছুতেই নয়, অথচ এই অগ্রাহ্য করার কৌশলটা কী পরিষ্কার শিখে নিয়েছে। তার সঙ্গে কী মদগর্ব ভাব! যেন বিশ্বভুবনে ছেলের মা আর কখনো কেউ হয়নি।

ভাব জমলো না, চলে এলো।

নিজেকে কেমন যেন অপদস্থ অপদস্থ লাগছে! সেই অকার-অভিমানটা যেন আবার উথলে উঠতে চাইলো।

ঠিক এই সময় ঘটলো সেই অভাবিত ঘটনাটি। কাকা হাঁপাতে হাঁপাতে এসে জানান দিলেন, নবদুর্গার শ্বশুরবাড়ি থেকে একটা লোক এসেছে, জিগ্যেস করতে নবদুর্গা এখন যাবে কি না। যাবার ইচ্ছে হলে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করা হবে।

নবদুর্গা যেন হাতে চাঁদ পায়। মনে হয় লোকটা যেন ঈশ্বর

প্রেরিত। তাই তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, 'কী রকম লোক?'

এই প্রশ্নটা অহেতুক।

লোক যে রকমই হোক, নবদুর্গার কী?

সেই কথাই বলে নিয়ে বলে, 'আমি আর কী দেখা করবো। তুমিই বলে দাও না—সুবিধে মতন লোক পাঠাতে। যেতেই হবে এবার।'

কাকা চোখ কপালে তুলে বলেন, 'সে কী হয়? তোমার লোক, তুমি দেখা করবে না? দেখো ভাল করে বলে কয়ে, যদি আর দু দিন রাখেন।'

মমতা ঝরে পড়ে কাকার কণ্ঠ থেকে।

ওই লোক মারফৎও অনেক উপঢৌকন এসেছে। কণ্ঠে মমতা মধু ঝরবে না?

এতো লোকের সামনে লজ্জা পায় নবদুর্গা। কাকাকে তো চেনে সবাই। তাঁর পূর্ব ব্যবহারও সকলের জানা। তাড়াতাড়ি বলে, 'বলতো তো বাগদী প্রজাটজা মতন, তাকে আবার বলবো কইবো কী? থাকা তো হলো ক'দিন, এবার যাওয়াই যাক।'

কিন্তু নবদুর্গার এবারের যাত্রা বুঝি বিশেষ জটিল। ফেরায় বাধা। তাই কোথায় ছিলেন 'জোছনারাতে'র পিসী, তিনি এগিয়ে এসে হৈ-চৈ করে ওঠেন, 'ও মা সে কি কথা? ক'দিন বাদ ভবানী আসছে, আর তুমি চলে যাবে? আহা! বটুর চিঠিতে তুমি এসেছ খবর পেয়ে কতো উথাল-পাথাল করছে মেয়েটা।'

তবে?

এরপর আর কী করতে পারে নবদুর্গা।

বলতে পারবে, তা হোক, আমি চলেই যাই! ভাগ্যে থাকে দেখা হবে ভবিষ্যতে কখনো।

না, এমন অসভ্য নবদুর্গা নয়।

তাই নবদুর্গাকে বাল্যসখীর আসার আশায় থেকে যেতে হয় আপাততঃ।

কিন্তু এখানে এসেই যে আগ্রহ ব্যাকুলতা ছিল সখীর জন্যে সে ব্যাকুলতাকে কি খুঁজে পাচ্ছে? পাচ্ছে না।

মনে হচ্ছে ইংলণ্ডেশ্বরীর মাসতুতো বোন হওয়া সত্ত্বেও নবদুর্গার যেন সখীর কাছে মুখ দেখাবার মুখ নেই।....সখী এসে যেন ওই সুবলের বৌয়ের মতই নবদুর্গার দিকে অবজ্ঞা আর তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকাবে।

*   *   *

সখী আসার সম্ভাবনার দিনই সকালে হঠাৎ প্রস্তাব করে বসলো নবদুর্গা, 'এসে পর্যন্ত শিববিষ্ণু মন্দির দেখতে যাওয়া হয়নি। পিসী চলো না যাই -'

পিসী অবশ্য এতোটা খাটুনির প্রস্তাবে উৎসাহিত হন না, স্তিমিত মুখে বলেন, 'সে আর কী দেখতে যাবে মা, মন্দিরে তো বিগ্রহ নেই, সববস্ব ভেঙে পড়েছে—ধ্বসে পড়া অবস্থা।'

নবদুর্গা তবু নির্বেদ প্রকাশ করে।

ছেলেবেলায় তো ওই বিগ্রহহীন ভাঙা মন্দিরই দেখতে যেতো তারা দল বেঁধে।....মন্দিরের গায়ের সেই সব কারুকার্য কি আর এই ক' বছরে ধ্বংস হয়ে গেছে? সেই দেয়ালে দেয়ালে গোষ্ঠলীলা রাসলীলা বস্ত্রহরণ ইত্যাদির চিত্রগুলি তো পোড়ামাটির কাজ, যেমন ছিল তেমনিই আছে নিশ্চয়। নবদুর্গাদের তো খেলতে যাবার জায়গাই ছিল ওইখানে।....আবার কবে আসা হয় না হয়, দেখে না গেলে আফসোস থেকে যাবে।

অগত্যাই রাজী হন পিসী, তবে নিজে সঙ্গে যেতে পারেন না, সঙ্গে দেন ঘোষাল গিন্নীকে। ডাকাবুকো মানুষ, হাঁটতে পারেন খুব।

কিন্তু নবদুর্গা? সে কি খুব ডাকাবুকো?

ঘোষাল গিন্নী বিগলিত স্নেহে বলেন, 'কিন্তু তুমি কি মা অতোখানি হাঁটতে পারবে? পায়ে ব্যথা হবে হয় তো।'

'কী যে বলেন খুড়ী?' নবদুর্গা বলে, 'চিরটা কাল তো ওইখানেই ছিল আমাদের আড্ডা। আমি, জোছনারাত, সুশীলা, সুরবালা

দল বেঁধে আসতাম -'

'ত্যাখন পেরেছ মা,' ঘোষাল গিন্নী হেসে বলেন, 'পান্তো আমানি খাওয়া শরীল ছেলো, এখন—দুধ ঘি ননী মাখনের শরীল।'

'আচ্ছা আপনি দেখবেন।' বলে এগিয়েই পড়ে নবদুর্গা।

আশ্চর্য! কিছুতেই কি এরা সহজ হতে দেবে না নবদুর্গাকে?

আরো একটা সঙ্গী জোটে। ঘোষাল গিন্নীরই এক বিধবা ভাইঝি : বেড়াতে এসেছে পিসীর কাছে। মন্দির দেখা হবে শুনে উৎফুল্ল হলো।

এক সঙ্গে আড়াই পা হাঁটলেই নাকি বন্ধু হয়ে যায়। সুখদার সঙ্গেও অতএব বন্ধুত্ব হয়ে গেল নবদুর্গার।

সত্যিই বন্ধুত্ব হয়ে গেল! বড় সরল মেয়ে।

তা'ছাড়া নবদুর্গার দেহের সোনার ভার তো তাকে ভারাক্রান্ত করলে না। তার তো শূন্য দু'খানা হাত আর শূন্য পাড় একখানা ধুতিই চরান পরিচ্ছদ। বস্ত্রালঙ্কারের ঘাটতি নিয়ে হীনমন্যতার অবকাশ নেই।

সত্যিই মন্দিরের ভগ্নদশা, চূড়াগুলি লতাগুল্মে আচ্ছন্ন, জনমানব-বর্জিত ঠাঁই। পূজো পূজো অভিনয়ও বোধ করি বহুদিন লুপ্ত হয়ে গেছে, তাই বিগ্রহ স্থানান্তরিত। কিন্তু শিল্পকীর্তির চিহ্নরেখাগুলি আজও জায়গায় জায়গায় দেদীপ্যমান। সেগুলিকে কেউ স্থানান্তরিত করেনি।

মন্দিরের চালার নীচে যেখানে রাসলীলার দৃশ্য, এক কৃষ্ণ বহু হয়ে বহু গোপিনীর সঙ্গে নৃত্য করছেন, সেই শিল্প সম্ভারের কাছে দাঁড়িয়ে পড়ে সুখদা বলে ওঠে, 'দেখেছ ভাই একেই বলে দেবতার বেলায় লীলা খেলা, পাপ লিখেছে মানুষের বেলা। কুলীন বামুনরা একশো গণ্ডা বিয়ের জন্যে কত নিন্দে, আর ঠাকুরটির ষোলোশো গোপিনী।'

নবদুর্গা ওর এই অদ্ভুত তুলনায় প্রথমটায় হেসে উঠেই হঠাৎ কেমন বিষণ্ণ হয়ে যায়। তারপর বলে, 'মানুষের সঙ্গে কী তুলনা চলে ভাই? মানুষের সাধ্যি আছে দু'টো মানুষকে সমান চক্ষে দেখবার? সমান ভাবে ভালোবাসবার? নেই।'

সুখদা এখানে সদ্য আগন্তুক, নবদুর্গার জীবনের ঘাটতির খবর এখনো তার কানে আসেনি। কিন্তু কানে এলেই বা কী হতো? সুখদা কি অবাক্ হতো? না নবদুর্গার জন্যে সহানুভূতি আসতো তার? পুরুষের একাধিক বিয়ে সতীনের ওপর মেয়ে দেওয়া, অথবা মেয়ের বুকের ওপর সতীন এসে পড়া, এসব তো সমাজে সংসারে ডাল ভাত। আকছারই হচ্ছে। অতএব সুখদা এ খবরে বিচলিত হলো না।

সুখদা শুধু এখন একটু বিষণ্ণ হাসি হেসে উত্তর দিলো, 'কী জানি ভাই, তোমাদের ওই সব ভালবাসা যে কী বস্তু তা তো কখনো জানলাম না। ভগবান সে গুড়ে বালি করে দিয়েছে। বিয়ের অষ্টমঙ্গলার মধ্যে স্বামীকে সাপে দংশালো। ব্যস সব খতম। বয়েস তখন সবে সাড়ে দশ। তদবধি হবিষ্যি গিলছি আর একাদশী ঠেলছি।'

নবদুর্গা শিউরে উঠে।

নবদুর্গার মুখ দিয়ে শুধু অস্ফুটে উচ্চারণ হয়, 'সাড়ে দশ!'

সুখদা বলে, 'তাই তো! দশ বছরের ওপর আর পাঁচটা মাস গেছে।'

নবদুর্গার একটা নিঃশ্বাস পড়ে।

কতো ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর দুঃখ আছে মানুষের। সেগুলো ভাবলে নিজেদের দুঃখ ছোট হয়ে যায়। সেই তুচ্ছ দুঃখ নিয়ে 'আবর্তিত হচ্ছি' ভাবলে লজ্জা করে।

কিছু বলতে হবে ভেবেই বলে, 'বাপের বাড়িতেই থাকো?'

সুখদা হেসে উঠে বলে, 'না তো কি শ্বশুরবাড়িতে? তারা তো সঙ্গে সঙ্গেই অপয়া লক্ষ্মীছাড়ি সর্বনাশী বলে ঝাঁটা মেরে বার করে দিয়েছে।'

নবদুর্গা অবাক্ হয় না, কারণ এমন ঘটনার ক্ষেত্রে এই রকমই হয়, এ তার জানা। তবু নবদুর্গা উত্তেজিত হয়। বলে, 'তোমার কী দোষ? তুমি কি সাপ ধরে এনেছিলে?'

সুখদা এ কথায় খিলখিল করে হেসে ওঠে।

সরল চিত্তের সরল হাসি।

বলে, 'তুমি যে ঠিক আমার মতনই বললে ভাই। আমিও ওই কথাই বলে ফেলেছিলাম! যখন ঘাটে গিয়ে শাঁখা নোয়া ঘোচাচ্ছিল কোন একজন শাশুড়ী তখন দুম্‌দুম করে আমার পিঠে কিল মেরে মেরে ঘাটের ওপর হুমড়ি খাইয়ে ফেলে দিয়ে বলেছিল, শাঁখা ভেঙে হাত ভেঙে হাতে ফুটে গেছে বলে আবার উঃ করা হচ্ছে? লজ্জা করে না কালামুখী রাক্ষুসী! তখন বলে বসেছিলাম আমার কী দোষ? আমি কি সাপ ধরে এনেছিলাম?....ওঃ তারপর সে কী লাঞ্ছনা! মনে করলে এখনো কান্না পেয়ে যায়। আচ্ছা ভাই, তুমিই বল, যে মেয়েমানুষ বিধবা হলো, সব থেকে ক্ষতি তো তারই হলো? তবে তাকে ধরে সবাই মিলে মারধোর গালমন্দ করে কেন?'

নবদুর্গা শুধু অস্ফুটে বলে, 'আশ্চয্যি!'

তারপর ভাবে চাঁপদানী গিয়ে সেই মানুষটাকে জিগ্যেস করবো, 'এতো অন্যায় অত্যাচার কেন? মেয়েমানুষ কী ভগবানের সৃষ্ট জীব নয়? আর বলবো, বিদ্যেসাগর প্রাণপাত যা করে মরলেন, তাতে আর ক'টা বিধবার দুঃখু ঘুচলো? ও পথ দিয়ে সুবিধে হবে না। আপনি এমন পণ্ডিত বিচক্ষণ জ্ঞানী মানুষ, ভাবুন না কিসে এই সব দুঃখী মেয়েগুলোর কোনো উপায় হয়।'

সুখদা বলে ওঠে, 'তুমি কি রাগ করলে ভাই?'

'ওমা কেন?' উত্তর দেয় নবদুর্গা, 'রাগ করতে যাবো কেন?'

'গম্ভীর হয়ে গেলে দেখছি।'

'ও এমনি, তোমার দুখের কথায় মনটা কেমন—'

আরো কিছু বলছিল, ঘোষাল গিন্নীর কাংস কণ্ঠ ধ্বনিত হলো, 'তোরা দুটোতে যে একেবারে জমে গেলি? ঘরে ফিরতে হবে না? কমখানি পথ? রোদ চড়কো হয়ে উঠলো।'

গজগজ করতে করতেই ফেরেন ঘোষাল গিন্নী, 'ঠাকুর নেই দেবতা নেই, ভাঙা ইঁটের বোঝা দেখতে ভূতো খাটুনি।'

কিন্তু এই দুটো মেয়ে সে দিকে কান দিচ্ছিল না। নিজেরা মৃদু গলায় কথা বলতে বলতে চলছিল। সেই সূত্রে সুখদার জীবনের কাহিনী জানা হয়ে যাচ্ছিল নবদুর্গার।

বাড়ি ফিরেই দেখে নবদুর্গা ভবানী ওদের দাওয়ায় বসে। নবদুর্গাকে দেখে একেবারে হৈ-চৈ করে ওঠে। যদিও শারীরিক অবস্থা তার হৈ-চৈ-এর উপযুক্ত নয়, কিন্তু কণ্ঠস্বরটাকে তো বহুদূর পর্যন্ত পাঠানো যায়।

'আমি আসছি জেনেও তুই সক্কালবেলা বাড়ি ছাড়া হয়ে গিয়ে বসে আছিস জ্যোছনারাত। তুই কি চাস এতোদিন পরে এসেই তোর সঙ্গে আড়ি দিই? বড়লোকের গিন্নী হয়ে খুব দেমাক হয়েছে, না?'

নবদুর্গা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচে।

নবদুর্গা কৃতজ্ঞতায় বিগলিত হয়। এবং অতঃপর দুই সখীর আলিঙ্গনটা হয় দেখবার মত।

অনেকদিন পরে সোমনাথকে কবলিত করতে সক্ষম হয়ে কাগজ-পত্রের বোঝা নিয়ে হাজির হয়েছিলেন নায়েব সুখচরণ গাঙ্গুলী। অনিচ্ছুক সোমনাথ উলটে পালটে দেখতে দেখতে বলেন, 'আপনি আর আপনার বৌমাই তো এসব ভাল বোঝেন নায়েবমশাই।'

সুখচরণ ঘাড় নেড়ে বলেন, 'আমার কথা বাদ দাও বাবা, এই করে চুল পাকালাম, তবে হ্যাঁ বৌমাকে বলিহারী দিতে হয়। যেমন পরিষ্কার মাথা, তেমনি বিচার বিবেচনা বুদ্ধি কৌশল। কিসে ভাল কিসে মন্দ এমন চট করে বুঝে নেন, তাক লেগে যায়। কর্তাবাবুর শিক্ষাটা সার্থক।'

সোমনাথ মৃদু হেসে বলেন, 'তবে আর আমায় ভোগাতে এলেন কেন?'

ঘরে কেউ নেই, ধারে কাছে প্রতিপক্ষের ছায়াটিও নেই, তথাপি সুখচরণ গলা খাটো করে বলেন, 'এসেছি সাধে? মা জননী আমার

যেমন দীয়াবত তাতে ঠিক মতন খাজনা-পত্তর আদায় করাও তো কঠিন। এই তো দেখুন নায়েবের বিবৃতি? লম্বা ফর্দ। অজন্মার ছুতো করে ব্যাটারা কেউ খাজনা দেবে না, আর মা জননী আমার দেলদরিয়া হয়ে দিচ্ছেন, 'না না মাপ করে দিন নায়েবমশাই, পেটেই খেতে পাচ্ছে না, খাজনা দেবে কোথা থেকে?'

সোমনাথ কাগজপত্রগুলো [illegible] একটু টেনে নিয়ে বলেন, 'তা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। সত্যি [illegible] অজন্মা যখন—'

নায়েবমশাই ঈষৎ অবজ্ঞার হাসি হেসে বলেন, 'জানতাম তুমিও এই কথাই বলবে। জমিদারের যতই [illegible] হও, বিষয় বুদ্ধিতে চির-কালই কাঁচা। [illegible] [illegible] যতটা বলছে, সবটা [illegible]....এমন অজন্মা [illegible], [illegible] কারোও করেনি। সুড়সুড় করে সবাই ঠিক ঠিক দিয়ে দিয়েছে, কিছু বাধা হয়েছে?'

সোমনাথ ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলেন 'সুখে স্বচ্ছন্দে নিশ্চয়ই দেয়নি। প্রাণে মরে দিয়েছে। সেইভাবে আদায় করাটা কি ঠিক?'

সুখচরণ আর একটু বিজ্ঞ হাসি হেসে দেয়, 'টাকা কে কবে সুখে স্বচ্ছন্দে দেয় বাবা? ট্যাঁক থেকে টাকা বার করতে হলেই তো অ-সুখ, অ-স্বাচ্ছন্দ্য এসে যায়। ব্যাটাদের তো সবে আজ চরাতে আসিনি? চরাতে চরাতে বুড়ো হলাম। না দিয়ে পার পেতে পারলে উপুড় হস্তটি করবে না।'

'কিন্তু অজন্মাটাও তো মিথ্যে নয় নায়েবমশাই?'

'বুঝলাম মিথ্যে নয় কিন্তু এভাবে খয়রাতি কারবার চালালে বিষয় সম্পত্তি আর কদিন রাখতে পারবে বাবা? কর্তারা যা খুদ কুঁড়ো রেখে গেছেন, তা তো দুদিনেই ফুঁকে যাবে।'

সোমনাথ মৃদু হাসেন।

তারপর বলেন 'সেকালের কর্তাদের তো শুনেছি আরো অনেক রকম 'কারবার' থাকতো, তাতেও যদি ফুঁকে না গিয়ে থাকে, তাহলে গরীব

প্রজাদের কিছু খাজনা মাপ করলেই কি আর তা যাবে?'

নায়েবমশাইয়ের মতবাদের সঙ্গে সোমনাথের মতবাদ খাপ খায় না, অতএব তিনি একটু উত্তেজিত না হয়ে পারেন না, এবং সেটা চাপতেও চেষ্টা করেন না। উত্তেজিত গলাটা না চেপেই বলে ওঠেন, 'তাঁরা যেমন দু'হাতে উড়িয়েছেন, তেমনি দশ হাতে আহরণও করেছেন। বিষয় আশয় যে বাড়াতে চেষ্টা করতে হয়, এই কথাটি তো বাপু তুমি কোনোদিন শেখোনি?'

নিজের যুক্তিতে নিজেই মোহিত হয়ে গিয়ে নায়েবমশাই বলেন, 'তবেই বলো! ভবিষ্যৎটাও তো ভাবতে হবে!'

সোমনাথ বড় একটা কখনো গলা খুলে হাসেন না, এখন একটু হেসে ওঠেন সেরকম।....হেসে বলেন, 'ভবিষ্যৎ? আমার আবার কার ভবিষ্যতের চিন্তা নায়েবমশাই?'

শুনে নায়েবমশাই একটু মলিন হয়ে যান।

সেই উত্তেজিত উদ্দীপ্ত ভাবটা যেন নিভে যায়। কারণ এ বক্তব্যের অন্তর্নিহিত অর্থ তো হৃদয়ঙ্গম হয়। আস্তে বলেন, 'কারো জন্যে চিন্তা থাকবে না সে তোমার দুর্ভাগ্য। কিন্তু নিজের জীবদ্দশাটাও তো ভাবতে হবে। বৌমাদের কথাও ভাবতে হবে? তা ছাড়া, এই ঠাকুর-দেবতা, করণ-কারণ, বিগ্রহ সেবা, আশ্রিত জন—এদের ভাবনাও তো ফেলবার নয়!'

সোমনাথও এখন বিষণ্ণ হন।

অন্য কিছুর জন্যে যতটা নয়, 'বৌমাদের' শব্দটার জন্যে। শব্দটা বড় কানে লেগেছে। বিষণ্ণ কণ্ঠে বলেন, 'প্রজারা যদি দু'টো খেয়ে পরে টিকে থাকে, এ সবও টিকবে নায়েবমশাই। ওদের মেরে যে বাঁচা, সে বাঁচা ক'দিনের?'

নায়েবমশাই অবশ্য এ আদর্শে প্রভাবিত হন না, বলেন, 'কর্তামশাইও প্রজাপালকই ছিলেন, প্রজাপীড়ক নয়। কিন্তু তাঁর দৃষ্টি প্রখর ছিল। কোন্ ব্যাটারা সত্যি অভাবগ্রস্ত, আর কোন্ ব্যাটারা তার

ভান করছে, তা ধরে ফেলতেন। তুমি কি ভাবছো সবাই খাজনা দিতে অপারগ? বেশির ভাগই ছুতো করে ফাঁকি দেবার তাল। তোমার আর মা জননীর ছুজনেরই দযার শরীর, নিপাট মন। তোমরা ওদের হারামজাদ্‌কি বুঝতে পাববে?'

কপালটা ঈষৎ কুঁচকে যায় সোমনাথের। বলেন, 'কিন্তু অজন্মাটা তো মিথ্যে নয়।'

'মিথ্যে নয়, তবে যতটা গাবাচ্ছে ততটাও নয়। তোমাদের ভালমানুষ পেয়েই—'

কথার মাঝখানে বিরতি পড়ে। হারু কামার ফিরে এসেছে নবতুর্গাদের কাছ থেকে।

'ঠাককণ এখন আসা করবেন না।' কাঁধের গামছাখানা উঠোনে পেতে বসে পড়ে বলে, তেনার সই না কে যেন শউয়বাড়ি যে আসবে, তেনার সাথে দেখা করাব দরকার।'

কথাটা শুনে সোমনাথের মধ্যে হঠাৎ যেন একটা মুক্তির আনন্দ আসে। তবে তৎক্ষণাৎ লজ্জিতও হন। গম্ভীরভাবে বলেন, 'ঠিক আছে, তুই মুখ ধুয়ে আয়, জলপানি খা।'

আর শুভঙ্করী?

তাঁর মধ্যেও কি ওই একই অনুভূতির খেলা খেলে যাচ্ছে না? বলা যায় না। শুভঙ্করীর হৃদয়ের ভাব বোঝা শক্ত।

তবে দেখা গেল তিনি 'দোল' উপলক্ষে তত্ত্ব পাঠাবার যোগাড় করছেন নবতুর্গাকে।

দোলের তো এখন বেশ ক'দিন দেরি।

তাতে কি? বিয়ে হয়ে ইস্তকই তো এখানে বাস। তেমন করে তত্ত্ব-তাবাস পাঠাবার সুবিধেই হয় না। বলেন, 'আমার আমলে পাটুলিতে কত তত্ত্ব গিয়েছে।'

তবে যাদের কাছে বলেন, তারা তৎক্ষণাৎ জবাব দেয়, 'তেমনি কত কত এযেছেও বাছা।'

'তোমাদের কেবল ওই কথা।'

শুভঙ্করী অসন্তুষ্ট হন। বলেন 'ওর মা বাপ ভাই দাদা কে আছে শুনি?'

কিন্তু এই সূত্রেই কী হঠাৎ পাটুলির কথাটা বার বার মনে পড়ছে শুভঙ্করীর? শুভঙ্করীর তো মা বাপ আছেন, দাদা না থাক ভাইও আছে, কিন্তু শুভঙ্করী কেন তাদের সঙ্গে এমন যোগশূন্য হয়ে আছেন?

শুভঙ্করী সেই বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা কালটাকে পিছিয়ে নিয়ে গিয়ে মনে পড়াতে চেষ্টা করেন, কবে থেকে এমন অবস্থা? ঠাকুর্দা ঠাকুমা মারা যাওয়ার পর থেকে? নাঃ, তা ঠিক নয়, এ অবস্থা শুভঙ্করীর দুর্মতির ঘটনা থেকে। কোন্ মা বাপ হাস্যমুখে সহ্য করতে পারে—মেয়ে শত সৎ পরামর্শ উপেক্ষা করে খাল কেটে কুমীর আনলে? নিজের হাতে নিজের চিতা সাজালে?

এমন হিতকথাও বলেছেন তাঁরা—'দত্তক' নেওয়ায় আপত্তি থাকে (যদিও ওই আপত্তিটা অনাসৃষ্টি অদ্ভুত) তো নিজেরই ছোট বোনটার গোটা আষ্টেক ছেলেমেয়ে রয়েছে, তাদের থেকেই একটাকে নিয়ে গিয়ে মানুষ কর না। বোনটাও একটু হালকা হয়ে বাঁচুক, তোরও প্রাণটা শীতল হোক। মা আর মাসী, তফাৎ তো নেই।

কিন্তু সে হিতকথা শোনেনি মেয়ে।

তদবধিই -

স্বভাবতই একটা বিচ্ছিন্নতা এসে গেছে। তা ছাড়া মন কেমনের সময় কোথা? একেই ছোট মেয়ে তেমন অবস্থাপন্ন ঘরে পড়েনি, (কারণ রূপের দিকে ঘাটতি) তায় আবার সে গুটি আষ্টেক সন্তানের জননী। এক জোড়া আবার যমজ, পেরে ওঠে না বেচারা, তাই অধিকাংশ সময় বাপের বাড়িতেই থাকে। তার সংসার নিয়েই মা ব্যতিব্যস্ত।

অতএব পাটুলির জমিদার বাড়িতে চাঁপদানীর জমিদার গিন্নীর ছবিটা ক্রমেই ঝাপসা হয়ে এসেছে। যেমন ঝাপসা হয়ে এসেছে দেওয়ালে ঝোলানো নব-বরবধূর টোপর মুকুট মালা পরা ফটোখানা। প্রথম সন্তানের বিয়েতে অনেক খরচা আর হাঙ্গামা করে কলকাতা থেকে সাহেব ফটোগ্রাফার আনিয়ে যে ফটোখানি তুলিয়েছিলেন জগগোবিন্দ পিতৃদেব রাধাগোবিন্দর আদেশে। রাধাগোবিন্দরই সাধ ছিল পৌত্রীর বিয়ের ফটো তোলানোর।

মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে দেবার পর দেওয়াল থেকে ফটোখানা নামিয়ে নামিয়ে, জলভরা চোখে নিরীক্ষণ করে দেখতেন শুভঙ্করীর মা, আর মনে মনে ষাট বানাতেন সে তো সুখে আছে ভাল আছে রাজরানী হয়েছে, তবে চোখে জল আসে কেন? জোর করে চোখ মুছেছেন।····কিন্তু ক্রমশঃ সে ছবির দিকে আর চোখও পড়েনি। তারপর ভুলেই গেছেন ছবিটা সিঁড়ির সামনে দালানের দেওয়ালেই ঝুলছে।

নিয়মমাফিক তত্ত্ব-তাবাস যায় আসে, পূজোয় শীতে রথে দোলে আর জামাইষষ্ঠীতে। এদিক থেকে ভাই ফোঁটায় ওই পর্যন্ত। সেই লেন-দেনের মধ্যে হৃদয়ের ব্যাকুলতা তত পায় না, যতটা প্রকাশ পায় প্রথা পালনের নিয়ম নিষ্ঠা।

পালে পার্বণে মেয়ে যেতে পারে না। কী করে যাবে? তার বাড়িতেই যে বারোমাসে তেরো পার্বন। বাপ ভাই-বা এদিকে আসবে কী করে? করণ-কারণ তো তাদেরও রয়েছে।

যেবার ভাই একটা পাস করে জলপানি পেয়েছে খবর পেয়ে শুভঙ্করী তাকে নেমন্তন্ন করে আনিয়েছিল, সেইবারেই যা সুধাগোবিন্দ দিদির বাড়ি ক'দিন থেকে গিয়েছিল। তা সেও তো কতদিন হয়ে গেল।

ভাইয়ের বিয়েটা একটা সম্ভাবিত ঘটনা হতে পারতো, কিন্তু কোন্ বয়েসে যেন একটা শক্ত ফাঁড়া আছে বলে বিয়েটা এখনও পিছিয়ে আছে।

অর্থাৎ এক কথায় সম্পর্কের অবস্থাটা এখন যেন নিস্তরঙ্গ সমুদ্র। সেখানে স্নেহ ভালবাসা, বিরহ ব্যাকুলতার ঢেউ বিশেষ আলোড়ন তোলে না।....কিন্তু সহসা সেই নিস্তরঙ্গ সমুদ্রে একটি প্রবল তরঙ্গ উঠলো।

উত্তাল হয়ে উঠলো পাটুলির জমিদার বাড়ি।

শুভঙ্করী নিজে থেকে বাপকে একটা চিঠি দিয়েছে পিত্রালয়ে আসার বাসনা প্রকাশ করে। মাকে দেওয়া বৃথা, পড়তে তো জানেন না। পড়ে শোনাতে হবে বাবাকেই।

তবে?

তবে আর কি, পড়ে শোনাতে বসেন জয়গোবিন্দ স্ত্রীকে কাছে ডাকিয়ে আনিয়ে।....

পরম পূজনীয়েষু—

বাবা,

আপনি ও মা আমার শত কোটি প্রণাম জানিবেন। পরে লিখি—মেয়েটাকে কি একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছেন?....কই কদাচ তো তাহাকে দেখিবার ইচ্ছা করে না?....কিন্তু জানেনই তো আপনাদের ডাকাবুকো কন্যা শুভঙ্করীর শরীরে অভিমানের বালাই নাই, তাই সে নিজেই লিখিতেছে—শরীর ভাল নাই, আপনাদের একবার দেখিতে বড় ইচ্ছা করিতেছে, যত শীঘ্র সম্ভব একবার লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিবেন।

খোকা আসে সঙ্গে পারিলে ভাল, নচেৎ বুঝিয়া-সুঝিয়া আর কাহাকেও পাঠাইবেন। খোকাকে আশীর্বাদ ও অন্যান্যদের যথাযথ সম্ভাষণ জানাই। পুনর্বার শতকোটি প্রণাম নিবেদনান্তে—

সেবিকা কন্যা শুভঙ্করী।

শুভঙ্করীর মা উদ্বিগ্নমুখে বলেন, 'ব্যাপার কি বল তো? আমার তো ভাল ঠেকছে না।'

বাপ উদ্বিগ্নভাব গোপন করে বলেন, 'কী আশ্চর্য! চিন্তার কী

আছে। হঠাৎ মন কেমন করে উতলা হয়েছে—'

'বলছ বটে! তবু আমার মন যেন কু গাইছে। খোকা না গিয়ে তুমি নিজেই যদি—'

'তাই ভাবছি-

'যোগনাথ' যে তাকে এমন করে পেড়ে ফেলে জেরায় জেরায় জেরবার করে তুলবে এ কথা স্বপ্নেও ভাবেনি নবদুর্গা।

অবশ্য ছেলেবেলা থেকেই ভবানী পাকা চোকা মেয়ে, কি হাত সে নবদুর্গাকে বলতো 'ন্যাকাচণ্ডী'। এবং পদে পদে তাকে ঠিক পথে পরিচালিত করতে উপদেশবাণী বর্ষণ করতো। তবু বোকাকরি নবদুর্গার আনুরক্তি ও বশ্যতা দেখেই খুব ভালবাসতো। সে ভালবাসায় ভাটা পড়েনি, শুধু অদর্শনে চাপা ছিল, এখন জোয়ার এলো।

আর সেই জোয়ারের মুখেই স্বল্পভাষিণী নবদুর্গাও অনেক কথা বলে ফেললো ভবানীর কাছে

তবে নিভৃত বিশ্রম্ভালাপের সুযোগ কমই জোটে, আসন্নপ্রসবা ভবানীর ধারে কাছে দু' তিনটে এঁড়ে ছেলেমেয়ে তো থাকেই। বড়টা হয়তো অন্যত্র খেলে। ওই কাচ্চা-বাচ্চাদের অবিরাম বায়নার আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে করতে কোনো মতে দুটো মন প্রাণের কথা বলে নেওয়া।

প্রথম দিকে সখী সান্নিধ্যের অধিক আগ্রহের সময় বাধা পেলে ভবানী ছেলেমেয়েগুলোকে দুমদাম পিটিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে মন্তব্য করতো, 'তুই বাবা বেশ আছিস! দিব্যি ঝাড়া হাত-পা, স্বাধীনতার সুখ। বারো দিন সাত দিক থেকে সাত জন খুলে খেতে আসছে না। এক এক সময় মনে হয় চোদ্দ জন্ম যেন কারুর ছেলেপুলে না হয়।'

কিন্তু সেই উগ্র মতবাদের আয়ু ফুরোতে দেরি হলো না। অতএব এ মন্তব্যও শুনতে পেলো নবদুর্গা 'একটা ডাণ্ডা খাওয়াও অবিশ্যি ভাল

না রে! এক আধটা কচি কাঁচা কোলে না থাকলে মেয়েমানুষকে মানায় না। এবং সঙ্গে সঙ্গে এই ঘোষণা করতে লাগলো, একচোখো বিধাতা পুরুষের খুরে দণ্ডবৎ! কাউকে এতো কাউকে শূন্য। সবল ক্ষেত্রেই এই অবিচার। আমার ঘাড়ে এতোগুলোকে না চাপিয়ে এর থেকে একটাও অন্ততঃ তোর কাছে পাঠাতে পারতেন। তা পারলেন না, তোর যে দরকার! তাই সেখানে তাঁর হাতের মুঠো বন্ধ।'

দরকার!

দরকার!

এই কথাটাই সকলের মুখে শুনতে শুনতে কান ভোঁতা হয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ 'জ্যোছনারাত' একটা ভয়ঙ্কর উলটো কথা বলে বসলো।

সেদিন পাড়ায় কাদের ছেলের আটকৌড়ে, তাই পাড়াসুদ্ধ কুচো কাঁচা ছেলেমেয়ের সেখানে আমন্ত্রণ। নেহাত দুগ্ধপোষ্যরাও ঝিয়ের কোলে অথবা ঠাকুমা পিসীর কোলে চেপে গিয়ে হাজির হয়েছে আট-কড়াই কুড়োতে।

ওই কড়াইয়ের সঙ্গে মিশানো আছে কুচো গজা, মেঠাই, রসমুণ্ডি, ছানার মুড়কি, আর পয়সা। কার ভাগ্যে কী পড়ে এই উত্তেজনায় সবাই থরথর করছে। কোলের শিশুটা পর্যন্ত হাত বাড়াচ্ছে। এই আনন্দোৎসবে নিজের সব কটাকে ও বাড়িতে চালান করে দিয়েছে ভবানী মা জেঠীর সঙ্গে।

তাই কিছুক্ষণের জন্যে মুক্তির স্বাদ পেয়ে গেছে ভবানী নামের মুখরা প্রখরা মেয়েটা। যদিও দেহের অবস্থা প্রতিকূল, তবু দশবার নবদুর্গার কাছে আসে ছুটে ছুটে।

আজ হঠাৎ নবদুর্গাকে বেশ নিরীক্ষণ করে দেখে দেখে বলে বসলো, 'তোর ব্যাপারটা কী বল তো জ্যোছনারাত। আমার তো বাপু তোকে দেখে সন্দেহ হচ্ছে।'

'সন্দ!' চমকে ওঠে নবদুর্গা, 'সন্দ আবার কী?'

'সন্দ হচ্ছে, সতীন মা া বোধ হয় তোকে বরের ধারে কাছে ঘেঁষতে দেয় না।'

'এ আবার কী কথা!' লাল হয়ে ওঠে নবদুর্গার মুখ, 'কী বলছিস যা তা? বরং নিজেই তিনি ধারে কাছে ঘেঁষেন না। সব সময় আমাকেই—'

'বললে শুনবো কেন?'

ভবানী তীক্ষ্ণ গলায় বলে, 'আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারবি না। প্রত্যক্ষ দেখছি, যেমন সোঁদাটি ছিলি তেমনি আছিস! বরে ছুঁয়েছে মনেই হচ্ছে না।'

নবদুর্গার বুকের মধ্যে ধাঁই ধাঁই করে হাতুড়ি পড়ে।

নবদুর্গার সমস্ত স্নায়ু শিরা শিথিল হয়ে আসে। তবু নবদুর্গা জোর দিয়ে বলে, 'হঠাৎ পাগল-টাগল হয়ে গেলি না কি? যা মুখে আসছে বলে চলেছিস।'

কিন্তু ভবানী এতো অল্পে ছাড়বার মেয়ে নয়। ভবানী সখীর কাছ ঘেঁষে সরে এসে তার কানে কানে কুমারী মেয়ের আর স্বামীসঙ্গপ্রাপ্তা মেয়ের লক্ষণ বিচার সম্পর্কে এমন সব কথা বলতে শুরু করে দেয় যে মূঢ় সরল নবদুর্গা লজ্জায় মুহুর্মুহু লাল হয়ে ওঠে, বিবর্ণ হয়ে যায়।

ভবানীর যুক্তি অকাট্য। ঘোষণা স্পষ্ট ঋজু দ্বিধাহীন। কারণ ভবানী ঝানু মেয়ে।

নবদুর্গার একান্ত নিভৃতে একান্ত গোপনে সংকোচ-লালিত গভীর শূন্যতার বেদনাটি যে ওই বাচাল মূর্খ অমার্জিত গ্রাম্য মেয়েটা এমন ভাবে উদঘাটিত করে ছাড়বে এ কথা যদি আগে কল্পনা করতে পারতো নবদুর্গা তবে কি সেই চাঁপদানীর লোককে এখন যাবো না বলে ফেরৎ দিয়ে সখী সন্দর্শনের আশায় বসে থাকতো!

কী নির্লজ্জ এরা!

কী নির্মম!

কী ভব্যতাহীন।····নবদুর্গার মধ্যে একটা প্রবল জলোচ্ছ্বাস যেন

ভূমিকম্পের আলোড়ন তোলে। কারণ প্রবল প্রতিবাদের মুখ নেই তার। তবু নবদুর্গা সেই আলোড়নকে সামলে নিয়ে বলে, 'তোর যা ইচ্ছে ভাব। আমি এই মুখে চাবি দিলাম।'

কিন্তু চাবির কথাটা মনে থাকলো কই?

ভবানী যখন তীক্ষ্ণ হাসি হেসে বলে, 'প্রথমটায় আমি ভেবেছিলাম, দু-দুটো মেয়েমানুষই বাজা হবে, এ কী আর হতে পারে, নির্ঘাৎ তোর কর্তাই তাই'

তখন নবদুর্গা প্রায় ঠিকরে উঠে হেসেই ফেলে বলে ওঠে, 'এ মা কী বলছিস? বেটাছেলে আবার—'

ভবানী অবশ্য এতে লজ্জিত হয় না, অতএব গলায় বলে, 'হয় বাবা হয়! পুরুষছেলেও তা হয়! তবে কেউই সে কথা মানতে রাজী হয় না, পরিবারের ঘাড়েই দোষ পড়ে। কিন্তু তোকে নিরীক্ষণ করে দেখে আমি মত বদল করেছি। নির্ঘাৎ তোর সতীন মাগী লোক দেখিয়ে বরের বে দিয়ে সতীন বরণ করে ঘরে তুলে, ছলে বলে দখলটি নিজের ভাগে রেখেছে। তুই তো চিবকেলে হাবা, তাই সতীনের দেখানো আদিখ্যেতায় মজে পড়ে আছিস। আসল দিকে দিষ্টি নেই।

নবদুর্গার পরম শ্রদ্ধা ভালবাসার জায়গায় এমন অশুচি আঘাত?

নবদুর্গা নীরবে সহ্য করবে সেটা?

ভাববে ও যা ভাবে ভাবুক গে!

নাঃ তা হতে পারে না। নবদুর্গার মধ্যে কি বিবেক বলে কোন বস্তু নেই? তা ছাড়া—বাচাল ভবানী কী এ সব কথা কেবলমাত্র নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখবে? সারা গ্রামে বলে বেড়াবে না? নিজের বরের কাছে হেসে হেসে বলবে না, নবদুর্গার জীবনের এই অদ্ভুত বঞ্চনার ইতিহাস!....তা বলতে ছাড়বে না, যতই প্রাণের সখী হোক। এক মেয়ের বঞ্চনা যন্ত্রণার কাহিনী কি অপর মেয়ে আড়াল করতে চায়? চায় না, পারে না। আহা করাতেও তার সুখ।

এমনি একরাশ চিন্তায় বিপন্ন বিচলিত, বেপথু মেয়েটা আর পারে না নিজেকে সামলে রাখতে। ব্যক্ত করে বসে এতদিনকার অব্যক্ত বেদনার ইতিহাস।

না বললে যে শুভঙ্করী ও চলে যাবেন ঘন অন্ধকারের তলায়।

কথাটা শোনার পর কিছুক্ষণ গুম্ হয়ে থেকে ভবানী ভুরু কুঁচকে বলে 'কাশীর জ্যোতিষী? বলেছে এই কথা? তাই যদি বলেছে তবে আবার ঢং করে আরও একটা বিয়ে করা কেন?'

নবদুর্গা শুকনো মুখে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে বলে, 'আগে বলেনি পরে বলেছে।'

নবদুর্গা তার জন্মভিটের এই পলেস্তারা খসা ছাতা-চোরা দেওয়ালের চেহারার মধ্যেই কি তার নিজের ভিতর ঘরের দেওয়ালের ছবি দেখতে পায়?

অথচ এই ক'দিন আগে পর্যন্তও নবদুর্গা তার সেই ঘরটার খবর জানতো না। খুব গভীর অতলে, খুব কোমল একটা সূক্ষ্ম বেদনাময় জায়গাকে সম্পূর্ণ ঢাকা দিয়ে রেখে সে তো পরম সুখেই কাটাচ্ছিল। সেই সুখটুকুকেই লালন করে জীবনটা অনায়াসেই কাটিয়ে দেওয়া যাবে, এই ছিল তার জীবন সম্বন্ধে ধারণা।

নবদুর্গা কেন মরতে সেই সুখস্বর্গ থেকে সরে এসে পৃথিবীর অন্ধকার দিকটা দেখতে বসলো।

এমনিতেই তো একটা অন্ধকারময় দিক চোখের সামনে খুলে গিয়ে মরমে মরে আছে নবদুর্গা। কাকা মুকুন্দরামের লোভ-লেলিহ হাতখানা যেন পাতাই আছে তার ভাগ্যবতী ভাইঝির কাছে।

ধার চাওয়ার বিরাম নেই।

সেই 'ধার' শব্দটা যে নিতান্তই শব্দ মাত্র, তা অবশ্য নবদুর্গার ধারণায় ছিল, কিন্তু এটা ধারণায় ছিল না, একটু আধটু করে ছোট খাটো গহনাগুলোও তার অনবরত অন্য এক পথ ধরে অদৃশ্য হতে থাকবে।....কাউকে বলা যাবে না, এমন কি পিসীকেও না। বললেই

তো সারা গ্রাম রাষ্ট্র হয়ে যাবে। ছি ছি! সে বড় লজ্জা।

অথচ লজ্জার হাত এড়ানো যাচ্ছে কই? মুকুন্দ নবদুর্গার নিজের কাকা এ কথা ভেবে একা একা লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে।....ভগবান নবদুর্গাকে কত দয়া করেছেন, তাই নবদুর্গা এই পরিবেশ থেকে মুক্তি পেয়ে গেছে।

'জ্যোছনারাতকে' যেন এখন অসহনীয় লাগছে, দেখলে ভীতি আসছে। সর্বদা মনে হচ্ছে পালাই পালাই। কিন্তু নবদুর্গাকে জব্দ করতে কোন্ ফাঁকে চৈত্র মাস পড়ে বসে আছে। আর পুরো মাসটাই না কি যাত্রা নাস্তি।

আশ্চর্য!

এমন একটা অনাসৃষ্টি নিয়ম নাকি বরাবর মেনে চলে আসছে সবাই। বছরের মধ্যে চার চারটে মাস চৈত্র পৌষ ভাদ্র কার্তিক একদম বাতিল।....কেউ কোথাও যেতে আসতে পাবে না, যাত্রা নাস্তি। কী দোষ করেছে মাসগুলো? ভগবান জানেন। ভবানী বললো ধান কাটার মাস, তাই।

ধান কাটার সঙ্গে 'যাত্রা'র কী?

প্রশ্নের উত্তর নেই।

শুধু মেনে চলো।....অতএব টেনে টেনে চলো দিনগুলো।

থেকে যাওয়ার মধ্যে একটাই শুধু ঘটনা বৈচিত্র্য ঘটলো ভাগ্যে। জ্যোছনারাতের জ্যোছনা রাতের মতই একটি মেয়ে হলো সেটকে দেখা। সবক'টা ছেলেমেয়েই ভবানীর ফর্সা-টর্সা, তবে এমন ফুটফুটেটি কেউ নয়। ক'দিন পরে দেখতে গেল। দেখে উৎফুল্ল নবদুর্গা যখন ধন্যি ধন্যি করছে ভবানী মুখ টিপে হেসে বলে ওঠে, 'তা এতই যখন পছন্দ, তুই নিয়ে যা। দান করে দিচ্ছি তোকে।'

—'ইস! বুকে হাত দিয়ে বলছিস?'

'বুকে মাথায় সব। তোর কাছে তো রাজকন্যে হয়ে মানুষ হবে রে। তা ছাড়া আমারও একটা কন্যেদায় কমবে। এই তো হয়ে পর্যন্ত

ভাবনা হচ্ছে মেয়ের কোলে 'মেয়ে' শুনেই শাশুড়ী নির্ঘাৎ তুড়িলাফ খাচ্ছেন। কর্তারও মুখ ভারী হয়ে উঠেছে। নিতে গিয়ে যখন ঢুকবো, তখন যেন চোরের অধম। কেউ ভাল করে মুখের দিকে তাকাবে না, মেয়েটা কেমন হয়েছে তা দেখবে না, মন খুলে দুটো কথা বলবে না। এ বরং তাদের মুখের ওপর শুনিয়ে দিতে পারবো মেয়ে হয়েছে শুনে তোমরা একটা পোড়া মুড়ি দিয়েও উদ্দিশ করলে না, আমিও মনের ঘেন্নায় তাকে বিলিয়ে দিয়ে এসেছি।'

এই বিলিয়ে দেওয়ার প্রস্তাবটা যে ঠাট্টা মাত্র তা বুঝতে পারলেও, মেয়ে সম্পর্কে এই অবজ্ঞা অবহেলা ধিক্কারটা যে ঠাট্টা নয় তা বুঝতে পারে নবদুর্গা। যতই সে 'সংসার' সম্পর্কে অন্যমনস্ক অনভিজ্ঞ হোক এ ধরনের কথা জ্ঞানাবধিই শুনে আসছে সে। তবু হঠাৎ নতুন করে বিষণ্ণ আর ভাবাক্রান্ত হয়ে ওঠে নবদুর্গা। শুধু মেয়ে সম্পর্কে এই লাঞ্ছনা বাক্য শুনেই নয়, অন্য একটা দিক থেকে ভেবে।

এখানে এতো অবহেলা, অথচ কোথাও কোথাও একটা মেয়েও পরম সম্পদ। চাঁপদানীর জমিদার বাড়িতে যদি কোনো একদা একটা মেয়ে সন্তানও জন্মাতো, তা' হলে নবদুর্গা নামের একটা অস্বস্তিকর অস্তিত্বকে বহন করে চলতে হতো না চাঁপদানীর মান্য মর্যাদাসম্পন্ন জমিদারকে।

দ্বিতীয়বার বিবাহের গ্লানি যে তাকে ভিতরে ভিতরে পীড়িত করে রেখেছে সেটা কি নবদুর্গার অনুভূতিতে ধরা পড়ে না? যতই অবোধ হোক, সরল হোক, নির্বোধ তো নয়।

হায়!

কাশীর জ্যোতিষী আর কয়েক বছর আগে কেন কথাটা বলেনি?

ভবানীর আঁতুড়ের দরজায় নবদুর্গার সঙ্গে পিসীও এসেছেন। তিনি হঠাৎ খরখরিয়ে বলে ওঠেন, 'পুষলে একটা মেয়ের ঢিপই বা পুষতে যাবে কেন বাছা? বামুনের ঘরে কি অনাথ অভাগা ছেলের অভাব?'

নবদুর্গা মরমে মরে যায়।

আর একবার মনে আসে নবদুর্গার, এঁরাই আমার সবচেয়ে আপন!
কী লজ্জা! কী লজ্জা!

তাড়াতাড়ি বলে, 'কী যে বলো পিসী। ও যেন সত্যি বলছে। বিলিয়ে দেবার জিনিস যেন!'

বলে পালিয়ে আসে।

এসে হিসেব করতে বসে কবে চৈত্র মাস শেষ হবে।

চৈত্র মাস অবশ্য অসতর্কে নিঃশব্দে শেষ হয়ে যাবার নয়। তার বিদায় গ্রহণ রীতিমত সমারোহময়। ঢাকে ঢোলে কাঠি পড়বে, গাজনের বাদ্য বাজবে, 'হর হর ব্যোম ব্যোম' রবে আকাশ মুখরিত হবে, 'লীলাবতী'র সঙ্গে শিবঠাকুরের বিয়ের ঘটা দেখতে ছুটবে যত পুণ্যার্থিরা, পিতৃপুরুষদের আহ্বান করে করে উত্তরপুরুষরা উৎসর্গ করবে জলভরা ঘট বৎসরের নতুন ফল, নতুন যবের ছাতু, কুমারী কন্যারা ব্রত গ্রহণ করতে বসবে 'শিবের মত পতি' পাবার এবং 'সীতার মত সতী' হবার আশায়, সধবারা ধরবে অক্ষয় স্বর্গ লাভের এবং স্বামীপুত্রের কল্যাণ কামনায় বহুবিধ ব্রত নিয়ম, সদ্য বিবাহিতারা এয়োস ক্রান্তি।

তুলসীগাছে বসবে নতুন ঝারা, মহাদেবের মাথায়ও তার অনুকরণ।

চৈত্র যাকে নিজের জায়গা ছেড়ে দিয়ে বিদায় নেবে, সে তো শুধু একটা নতুন মাস নয়, একটা নতুন বছর। তাই দিকে দিকে তার বিদায় ঘোষণা।

যাক, এতো সব কিছু করেই বিদায় নেয় চৈত্র মাস। দিন-টিন তো স্থিরও হয়ে আছে। বৈশাখের চতুর্থ দিনের অপরাহ্নকালের একটি শুভ মুহূর্তকে ধরে রাখা হয়েছে 'শুভ যাত্রা' হিসাবে।

কিন্তু নিতে আসবে কে?

জামাই?

পাগল! সে কি এমন সস্তা মানুষ যে, যে কাজটা অন্য কেউ

করতে পারে, সেই কাজের জন্যে সময় খরচা করতে বসবে?....গোটা আষ্টেক বেহারা সমেত পালকি আসবে, আসবে মানদা খুড়ীর ছেলে, আর দেউড়ির পুরানো দ্বারোয়ানের ভাইপোটা। জোয়ান ছেলে পালকির আগে আগে চলবে রুপোর মাথা দেওয়া মোটা লম্বা লাঠি নিয়ে।

তবে এতগুলো লোককে হঠাৎ মুকুন্দরামের সংসারে পাঠানোটা তো তাকে বিব্রত করা, তাই লোকগুলোকে সকাল করে খাইয়ে দাইয়ে এবং সঙ্গে জলপানি দিয়ে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

প্রায় মাস আড়াই ধরে কাকার সংসারে থাকতে থাকতে নবদুর্গা তার সোনার পশরা নিয়েও যেন ক্রমশঃ ঔজ্জ্বল্য হারাচ্ছিল, হঠাৎ যেন আবার নতুন করে ঝলসে উঠলো এই বিদায় কালের সমারোহে, গ্রাম ঝেঁটিয়ে লোক এলো নবদুর্গার পালকিতে ওঠা দেখতে।....ছেলে বুড়ো মেয়ে পুরুষ।

এমন কি সন্ধ্যে যদি পুজো হয়ে বেরোলে তবেও পথের রাস্তায় বেরিয়ে আসে।

পিসী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদেন, এমন কি কাকাও মেয়েমানুষের মতন কোঁচার খুঁটটা চোখে ঘষেন। পিসীর অলক্ষ্যে নবদুর্গা চুপিচুপি কাকার হাতে কাছে যা টাকা ছিল সেগুলো আর একগাছা মোটা সোনার গোট দিয়ে বলেছিল, 'তোমার তো কিছু করতে পারলাম না কাকা। এইটা রাখো, সময় অসময় কাজে লাগিও।'

কাকা চমকে উঠেছিল।

নিতে চায়নি।

তারপর হাউ হাউ করে কেঁদে উঠেছিল। বলেছিল হতে পারে সে গরিব অভাগা, তবু যে মেয়েকে এক ছিটে সোনা দিতে পারেনি, তার গায়ের সোনা সে নিতে পারবে না।

সংসারের যে অন্ধকার দিকটা দেখতে পেয়ে মনটা ধ্বসে গিয়েছিল,

সেই দিকটাই যেন আলোকিত হয়ে ওঠে একটি করুণ মমতায়। কী ঐশ্বর্যের মধ্যে নবদুর্গা বাস করে, আর কী অভাবের সাগরে ডুবে আছে এরা।....

কুটুম বাড়ির পাঠানো তত্ত্ব তাবাসে সংসারে সাময়িক চেকনাই দেখা দিতে পারে, তাতে তো অভাব ঘোচে না।....নবদুর্গা যদি ভবানীর ধাতুতে গড়া মেয়ে হতো, হয়তো তলে তলে বাপের বাড়ির হাল ফিরিয়ে দিতো, ভাঙা বাড়ি নতুন করে দিতে পারতো, কিন্তু নবদুর্গা সেটা ভাবতেও পারে না।

নবদুর্গা নিজেই সেই ঐশ্বর্যের সংসারে থাকে অনাধিকারিণীর ভূমিকায়। অথচ শুভঙ্করী তাকে সব সময় বলে, 'সর্বদা আমার মুখাপেক্ষীই বা থাকিস কেন ? কী দরকার কী ইচ্ছে নিজে বুঝে নায়েব-মশাইয়ের কাছে টাকাকড়ি চেয়ে পাঠাতে পারিস না ? 'নতুন বৌ' নাম দেওয়া হয়েছে বলে কি চিরকাল নতুনই থাকবি ?'

সোমনাথও বলেছেন, 'তোমার নিজস্ব দরকারের জন্যে তুমি তো কিছু জানাও না -

নবদুর্গা দুজনের কাছেই লজ্জায় লাল হয়েছে, বলেছে, 'আমার আবার কী দরকার ? দরকারের অনেক বেশীই তো হচ্ছে সব সময়।'....

'কাউকে কিছু দিতে-টিতেও ইচ্ছে হতে পারে ?'

নবদুর্গা শুভঙ্করীর কাছ ঘেঁষে বসে কৃতজ্ঞ গলায় বলেছে, 'ইচ্ছে হবার অবসর কোথা ? তুমি তো তার আগেই সব করে বসে থাক।'

এবারে এখানে এসে অবশ্য মনে হয়েছে কাকাকে মাসে মাসে কিছু দিতে পারলে ভাল হয়। কারণ এখন যেন অবস্থা আগের থেকেও খারাপ হয়ে গেছে। অথবা নবদুর্গা নামের সেই মাত্র তেরো বছরের মেয়েটার দৃষ্টিতে 'অবস্থা' জিনিসটা তার নখ দাঁত নিয়ে ধরা পড়তো না।

পালকি বেহারাদের একটানা দুর্বোধ্যধ্বনি যেন মাথার মধ্যে অবিরাম

একটা ধাক্কা মেরে চলেছে। এ ধাক্কা মনের তারে কিসের অনুভূতি এনে দিচ্ছে? সুখের না দুখের? আনন্দের না বিষাদের?

পিছনে ফেলে আসা ছবিটা যেন একটি বিষণ্ণ করুণ মুখ নিয়ে তাকিয়ে আছে মৌন অভিমানের দৃষ্টি মেলে। যেন বলতে চাইছে, জানি তুমি হয়তো আর আসবে না। কেনই বা আসবে, সেখানে তোমার কত সুখ, এখানে কী আছে?

সুখ! সুখ!

কেন নয়? অসভ্য ভবানী যাই বলুক, নবদুর্গা তার সেই অতল গভীর শূন্যতার ঘরটার কপাট বন্ধ করে রেখে সুখের স্বপ্নই তো দেখছে। সুখ তো সেইটাই। সেই গঙ্গা, সেই অনেক অনেকখানি জায়গায় সম্পদে ভরা বিরাট প্রাসাদ, সেই সমারোহময় সংসার দৃশ্য, আর সর্বোপরি সেই মানুষটা? তাকে চোখ ভরে দেখতে পাওয়াও তো পরম সুখ। তার স্নেহ কোমল ঈষৎ গম্ভীর কণ্ঠের মৃদু সম্ভাষণ, সে সুখের কি তুলনা আছে?

আর সেই দীর্ঘোন্নত বিরাট-দেহ মানুষটার রাজকীয় পালঙ্ক শয্যার একাংশে একটু স্থান পাওয়া? শুধু সেইটুকুর জন্যেই কি নিজেকে বিকিয়ে দেওয়া যায় না?

সারারাত তো তার ঘুমন্ত নিশ্বাসবায়ু ঘরের বাতাসে সঞ্চারণ করে ফেরে! তার গায়ের উত্তাপ আবিষ্ট করে রাখে, আর তার সস্নেহ কণ্ঠের সেই ডাক দাঁড়িয়ে রইলে কেন? শুয়ে পড়ো? ঘুমোও। এতো রাত যে কেন হয় তোমাদের!'

মাথার কাছে মোমের আলো, ওঁর হাতে বই।

নবদুর্গা যদি ওঁর আদেশ পালন করতে তক্ষুনি ঘুমিয়ে পড়তো, তাহলে তো টেরই পেতো না কখন সে বই হাত থেকে নামে, কখন আলো নেভে। নবদুর্গা শুধু ঘুমের ভান করে নিঃশব্দে পড়ে থাকে বলেই ওগুলো জানতে পারে।

এগুলো কি সুখ নয়? সুখের সমুদ্র।

নবদুর্গা অনেক দিনের ব্যবধানে আবার সেই সুখ-নিলয়ে পৌঁছাতে যাচ্ছে।

কিন্তু যত কাছে আসছে যে হাসি হাসি উজ্জ্বল মুখটা নবদুর্গার চোখের সামনে ভেসে উঠছে, সে তো নবদুর্গার সেই সুখের সমুদ্রের মুখ নয়।

হিসেব মতো, মানে সংসারের হিসেব মতো সে সুখ নবদুর্গার প্রতিপক্ষের। এতোদিন ধরে অবিরত যার সম্পর্কে বিদ্বেষ আর বিরাগ-বাণী শুনে এসেছে নবদুর্গা এ মুখ তার।

তবু যতই বাড়ির কাছাকাছি আসছে, নবদুর্গার বুকটা আহ্লাদে উদ্বেল হয়ে উঠছে সেই সদাপ্রসন্ন, সদাই খুশীতে উজ্জ্বল মুখটা এক্ষুণি গিয়েই দেখতে পাবে বলে।

ও একটা অভিনব বৈকি!

জগতে কতো বিচিত্র ভাবের খেলাই চলে।

নবদুর্গা নামের মেয়েটা আহ্লাদে উদ্বেলিত হচ্ছে অনেক দিন অদর্শনের পর, মেয়েমানুষ জাতটার যে সবচেয়ে শত্রু সেই সপত্নীর মুখটা এখনি দেখতে পাবে বলে।

কিন্তু কই?

কোথায় সেই চঞ্চল চোখ আর আর খুশীতে উজ্জ্বল মুখখানি? নবদুর্গা পালকি থেকে নামবার আগেই যার প্রত্যাশায় মুখ বাড়িয়েছে, কই সেই পরম আশ্রয় আর পরম অভয়ের মূর্তিটি? এই বৃহৎ সংসারের বহুবিধ ছদ্মবেশী বন্ধুর 'হিতৈষণা'র জাল থেকে যে নবদুর্গাকে আগলে রাখে।

পালকির কাছে ছুটে এসেছেন মানদা খুড়ী, বসন্ত পিসী, বিষ্টুর ঠাকুমা, এসেছে লাবণ্য, বামুনদি, মোক্ষদা ঝি।

সকলেই অভ্যর্থনার প্রতিযোগিতায় নেমে যায় এবং তারস্বরে ঘোষণা করতে থাকে, 'এই চাঁদ মুখখানি বিহনে এতদিন বাড়ি অন্ধকার ছিল, এবার আলো জ্বললো।'

এই ঘোষণার মধ্যে যে রাজনীতি তা বোঝবার সাধ্য অ শ্য নবদুর্গার নেই। নবদুর্গা কোনমতে যথাযোগ্য প্রণাম সম্ভাষণ সেরে প্রত্যাশিত দৃষ্টিকে ম্লান করে অস্পষ্ট প্রশ্ন করে, 'দিদি ?'

এ প্রশ্নে সকলেরই চোখে চোখে যেন একটা হাসির বিদ্যুৎ খেলে যায়, এবং এ খেলাটুকু অবোধ নবদুর্গারও চোখ এড়ায় না। ভয়ে নবদুর্গার হৃৎপিণ্ড হিম হয়ে আসে। তবে কি এতদিন পিত্রালয়ে বসে থাকার জন্যে দিদি রাগ করেছেন ?

আর প্রশ্ন করতে সাহসে কুলোয় না। কিন্তু তার দরকারও হয় না। ক্ষণপরেই মানদা খুড়ী ফোকলা দাঁতে হা হা করে হেসে উঠে বলে ওঠেন, 'শুনলি সবাই ? দেখলি আমার ভবিষ্যৎবাণী ফললো কিনা ? বলিনি সে মেয়ে এসেই সতীনকে দেখতে না পেলে দিদি দিদি করে হামলাবে। কোথায় গেল বলে শুধোবে। দিদি এখানে নেই গো।'

'এখেনে নেই !'

এ কী অভূতপূর্ব কথা !

চাঁপদানীর এই বাড়িটায় শুভঙ্করী নেই ? কী করে দাঁড়িয়ে আছে তবে বাড়িখানা ? কেমন করে চলছে সংসার ?

এখানে নেই। কিন্তু কোথায় আছেন ?

একটা অজানিত ভয়ে হাত পা শিথিল হয়ে আসে নবদুর্গার। এরা তো তাড়াতাড়ি বলে ফেলছে না কোথায় গেছে মানুষটা ! তীর্থে ? মা-বাপের কোন দুঃসংবাদে ? অথবা বিশেষ কোন জরুরি দরকারে কলকাতায় ? না কেউ কিছু ভাঙছে না, শুধু নবদুর্গাকে তোয়াজ করতেই ব্যস্ত !... অথচ সকলেরই চোখে মুখে যেন একটা রহস্যের ঝিলিক। তার মানে দুশ্চিন্তার কিছু নেই।

শুকিয়ে আসা গলা দিয়ে উচ্চারিত হয়, 'কোথায় গেছেন ?'

মানদা খুড়ী খরখরিয়ে বলে ওঠেন, 'গেছেন ভাল জায়গাতেই।... কেন, কী বিত্তান্ত, সে সব আর এক্ষুণি শুনে কাজ নেই মা, শুনো পরে। চৈত্তির পড়ে যাবার দুদিন আগে রওনা দিয়েছেন।'

অর্থাৎ অভয় দানের পরিবর্তে, ভয়ের গহ্বরে ফেলে দিলেন ওঁরা সদ্য আগত বেচারি নবদুর্গাকে। কোথায় রওনা দিয়েছেন তা বললেন না।

তারপর? আর একখানি অভয় মূর্তি?

যাঁর কথা জিগ্যেস করা যায় না, অথচ সমস্ত ইন্দ্রিয়, সমস্ত চেতনা সেই অব্যক্ত প্রশ্নে থরথর করতে থাকে।

না, তার কথা কেউ বলছে না।

অনেক পরে রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার আগে জানতে পারলো নবদুর্গা, হঠাৎ বিশেষ জরুরি একটা দরকারে কলকাতায় চলে যেতে হয়েছে তাঁকে।

দু'এক দিনের মধ্যেই ফিরতে পারেন, দেরিও হতে পারে।····অর্থাৎ নবদুর্গা অশোকবনে সীতার অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে। অতএব বসে আকাশ পাতাল ভাবতে থাকা ছাড়া আর কিছু করার নেই।

আকাশ-পাতাল ভেবে মরেছিলেন শুভঙ্করীর মা নীলাম্বরীও ····ইস! ঠিক এই সময়ই আবার ছোট মেয়ে ক্ষেমঙ্করী কাছে নেই! কার যেন বিয়েতে শ্বশুরবাড়ি গেছে ক্ষেমঙ্করী। অতএব চিন্তার ভাগীদার নেই। মায়েরা আছে, তাদের কাছে তো আর এ চিন্তার পশরা খুলে বলা যায় না।

জয়গোবিন্দর কাছে কোন কথা বলতে যাওয়া বৃথা। একবারের পর দুবার বলতেই তিনি বিরক্ত হয়ে বলেছেন, 'মেয়ে আসতে চেয়েছে বাপের বাড়ি, এতে এতো দুশ্চিন্তার কী আছে? অনেক দিন আসেনি, বুড়ো মা-বাপকে দেখতে ইচ্ছে করতে পাবে না? এর মধ্যে আবার 'কেন' 'কী জন্যে' 'কী হয়েছে' এত সব কথার কী আছে?'

কাজেই বসে বসে অপেক্ষা করা, কবে শুভদিন পাওয়া যাবে পঞ্জিকায়। কবে মেয়ে স্বয়ং এসে সব প্রশ্নের উত্তর দেবে।

তবে মনগড়া একটা উত্তর ঠিক করে রেখেছেন নীলাম্বরী। আর কিছু নয়, স্বামীতে আর সতীনেতে মিলে দুর্ব্যবহার করছে, টিকতে দিচ্ছে না। এসেই মায়ের কাছে উথলে কেঁদে বলে উঠবে, থাকতে পারলাম না মা। তোমার কোলেই ফিরে এলাম আবার।

কিন্তু এটা কী? মেয়ে আসার পর হাঁ হয়ে গেলেন নীলাম্বরী। এ কী অসম্ভব বার্তা?

নীলাম্বরী হাসবেন না কাঁদতে বসবেন? মেয়ে মুখে কিছু না ফাঁস করলেও তার মুখের পাণ্ডুরতায়, হাসির ক্লিষ্টতায়, আর চোখের কালিমায় সেই অসম্ভব সংবাদ বিধৃত।

নীলাম্বরী কপালে করাঘাত করে বললেন, 'ভগবানকে আমি কৃতজ্ঞতা জানাবো, না গাল দেবো মা? সেই যদি দিলেনই তো—তোমার নিজের হাতে নিজের পায়ে কুড়ুল মারার আগে দিতে পারলেন না?'

চাঁপদানীতে এ খবর রটেনি। তার আগেই চলে গেছেন শুভঙ্করী। কিন্তু এ হেন একটা ঘটনা কি রটনা হলো না বলে কারো টের পেতে বাকী থাকে?

পরিবারের সব অভিজ্ঞ অভিজ্ঞ ঝানু মহিলারা কি সত্যি বিশ্বাস করতে বসবেন, শুধু শুধুই হঠাৎ এতো শরীর খারাপ হয়ে পড়লো গিন্নীর যে বাপের ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করাটা অবশ্য প্রয়োজনীয় হয়ে উঠলো। শুধু শুধুই শরীর এতো বে-এক্তার হয়ে গেল যে মাথা ঘুরে ঘুরে শুয়ে শুয়ে পড়তে হলো শুভঙ্করী নামের সেই চির সুস্থ, অটুট স্বাস্থ্যবতী মহিলাটিকে? তাই ঘর বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হলো 'একটু শুয়ে নিতে।'

না, সংসারের সবাই ঘাসের বীচি খায় না।

তবে ঢাকে ঢোলে কাঠি, উলু দিতে মানা।

মনের সন্দেহ মুখে ব্যক্ত করে বসলে পাছে গিন্নী রেগে ওঠেন? অকালে বোধন, অসময়ে অভাবনীয় কাণ্ড। তাই চক্ষুলজ্জার দায়ে গিন্নী খবর রটনা হবার আগেই বাপের বাড়ি পিটটান দিচ্ছেন। তা

ক'দিন পিটটান দিয়ে থাকবি? ঘটনাটা যখন প্রত্যক্ষ ঘটবে? চেপে রাখতে পারবি? না বরাবর বাপের বাড়িতেই চেপে বসে থাকতে পারবি?

শুভঙ্করী বাড়ির চৌকাঠ পার হওয়া মাত্রই সমালোচনার স্রোত এইভাবে প্রবাহিত হচ্ছিল, নবদুর্গা এসে পৌছনর পর সোচ্চারে প্রবল হয়ে উঠল সেই স্রোত।

এখন আর রেখে ঢেকে বলার দায়টা কী? চলছে সদাসর্বদা—দিন রাত্তির। প্রথম প্রথম পরাণের ঠাকুমা একবার দু'বার বলতে চেষ্টা করেছিল, 'তা মানুষটায় বাড়িতে পদার্পনের সঙ্গে সঙ্গেই এ সংবাদ তার কানে তোলার দরকার কি ছিল গা? শুনতো ধীরে সুস্থে। আর শুনিয়েচো শুনিয়েচো চব্বিশ ঘণ্টা তার সামনে অত রঙ্গরস অত ব্যাখ্যানার দরকারটা কী? দেখচো তো শুনে অবদি মানুষটা সিঁটিয়ে মিটিয়ে কেমন নীলবন্ন হয়ে গেছে। আহা, চেরোদিনের ভালমানুষ মানুষটা। তোমাদের বাছা দয়া ধম্ম বলে কিছু নেই।' কিন্তু ওর কথা কতক্ষণ দাঁড়াবে?

বিষড়ের ঠানদির স্বভাবধর্ম হচ্ছে যে কেউ যে কথাই বলুক তার প্রতিবাদ করা। সে প্রতিবাদ অনেক সময় হয়তো নিজের মতবাদের বিরুদ্ধেও হয়ে যায়। যাক তাতে কী? লোকের মুখের উপর পালটা কথা শুনিয়ে দেবার মুখটাও তো কম দামী নয়।

তাই তিনি ভাঙা কোমর আর ভাঙা গলা নিয়েও খনখনিয়ে বলে ওঠেন, 'বড় গিন্নীর আসকারায় আসকারায় তোমার বড় বাড় বিহ্নি বামুনমেয়ে! এ কী লুকোছাপার কারবার যে লুকিয়ে ছাপিয়ে রাখবে? এ মাসটা ডিঙিলেই পাটুলি থেকে খবর দিতে লোক আসবে না তেল সন্দেশ নিয়ে? ত্যাখন তুমি লুকোবে ছাপাবে? আর নীলবন্নই বা হওয়া কেন? এতো হিংসে তো ভাল নয়? যে মানুষ সব্বেসব্বা সারের সার, যে এতোদিন একটা ছেলে 'আবানে' বানের জলে ভেসে যাচ্ছিল, সে কথা তো মনে পড়ছে না? যে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে

তার জন্যে দয়া ধম্ম টনটনিয়ে উঠছে।'

'বানেব জলে কেউই আসেনি মা, তাকেও ডেকে হেঁকে আনা হয়েচে। বড়বৌমা আমার মাথার মনি! তবে ন্যায় অন্যায় আমি না বলে পারবনি'—পরাণের ঠাকুমা চলে যেতে যেতে বলে, 'তোমাদের যে কখন কোন্ দিকে ঢল নাবে!' বলে চলে যায়।

'শুনলি? শুনলি তোরা আসপদ্দাবাজ মাগীর কথা? উনি আসবেন আমায় ন্যায় অন্যায় শেখাতে। বলি যে জন্যে তাঁকে ডেকে হেঁকে আনা হয়েছে, সে মুখ তিনি রাখতে পেরেছেন? আমারও হক্ কথা। কে? কে ওখানে? নাতবৌ?'

লাবণ্য মুখ বাড়িয়ে দেখে বলে, 'কেউ না বাবা, তুমি ছায়ায় ভূত দেখছো। নতুন বৌদি তো ওই কোণের ঘবে অঙ্গ ঢেলে পড়ে রযেছে দেখে এলাম। বললো পেট ব্যথা করছে। মনে মনে হাসলাম, ব্যথা তো পেট করছে না, করছে বুক।'

মানদা খুড়ী বলেন, 'দেখো, এখন ভাসুবপো আসার পর কী দিশু হয়। আজই তো আসবার কথা?'

'কথার কিছু ঠিক নেই। তটস্থ হয়ে থাকো সব সময়। এই হচ্ছে কথা।' বলে লাবণ্য মুখ ঝামটায়।

শুভঙ্করীর অনুপস্থিতি সকলকেই অবাধ বাক্-স্বাধীনতা দিয়েছে।

তাহলে?

শুভঙ্করীর সারাজীবনের জীবনপাত কবে গড়া প্রতিষ্ঠার দেউল কি আকস্মিক এই ধাক্কায় চিরতরে ভেঙে পড়ে গেল?

হয়তো গেল। কিন্তু শুভঙ্করীর কাছেও চাঁপতানীর রায়চৌধুরী বাড়ির ছবি যেন ঝাপসা হয়ে গেছে।

কী চিন্তা! কী যন্ত্রণা!

শৈশব বাল্যের ক্রীড়াভূমি, মাতৃক্রোড়ের মধুর আশ্রয়, গম্ভীর পণ্ডিত পিতার নীরব গভীর স্নেহ, কোনো কিছুই শান্তি দিতে পারছে না শুভঙ্করী নামের সেই উজ্জ্বল উচ্ছল ছটফটে মানুষটাকে।

না, প্রতিষ্ঠা বিলোপের আশঙ্কায় নয়। যন্ত্রণা লজ্জার। চিন্তা ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার।

কী করবেন শুভঙ্করী? কী করবেন?

কোন্ মুখ নিয়ে দাঁড়াবেন নবদুর্গার সামনে? অহরহ শুধু সেই মুখটাই যেন কাঁটার চাবুকের মত শুভঙ্করীকে বিদ্ধ করছে। যেন শুভঙ্করী সেই বিশ্বস্ত মানুষটার অনুপস্থিতির সুযোগে চোরের মত তার সর্বস্ব লুণ্ঠন করে নিয়ে পালিয়ে এসেছেন।

তা ছাড়া আরও একখানি মুখ? হঠাৎ এই সংবাদের সন্দেহে বিস্মিত আহত, তবু স্থির গম্ভীর! যে মুখ দিয়ে একটি মাত্রই কথা উচ্চারিত হয়েছিল, 'দোষ কারো নয় রানীবৌ, এ অমোঘ নিয়তি তোমার আমার।'

কিন্তু কী কঠোর কী নির্মম এই নিয়তি!

যে আবির্ভাব একদা আনন্দে গৌরবে মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারতো, সেই আবির্ভাবই এখন অভিশাপের মূর্তিতে এসে উদয় হলো

কী লজ্জা! কী লজ্জা! মর্মান্তিক! অসহ্য!

গৃহিণী শুভঙ্করী, যিনি অনেক দিন হলো স্বেচ্ছায় ভোগের সিংহাসন থেকে নেমে এসে ত্যাগের দুর্বাসনে স্থান নিয়েছিলেন, তাঁর এই অধঃপতনে সমস্ত পরিচিত মুখগুলোই কি ব্যঙ্গ হাসিতে কুটিল হয়ে উঠবে না?

এ চিন্তা মৃত্যুর অধিক।

তবে? তা'হলে কেন বুদ্ধিমতী শুভঙ্করী নিজেকে বাঁচাতে এখানে পালিয়ে এলেন?

চাঁপদানীর রায়চৌধুরী বাড়ির উত্তর ভাগে প্রবাহিত সেই প্রশস্ত গঙ্গাবক্ষ কি মাতৃবক্ষের চাইতে কম শীতল? কম শান্তির?

তা পালিয়ে আসার আগে সে লোভ দুর্দমনীয় হয়ে উঠেছিল বৈকি! যখন শুধু একটা ভয়ঙ্কর আশঙ্কার তালগোল পাকানো অন্ধকার মনকে কুরে কুরে খেতে শুরু করেছিল, একটা স্পষ্ট মূর্তি নিয়ে দেখা দেয়নি

দেহের গভীরে জাগেনি প্রাণের স্পন্দন, তখন—

হ্যাঁ তখন! বুঝি বা শুধু লোভই নয়, একটা তীব্র ব্যাকুল ইচ্ছা। সেই ইচ্ছাব খাতে অবিরত যুক্তি খাড়া কবে কবে চলছিলেন শুভঙ্করী—ক'দিন ধরে, দিন রাত্রিব সকাল সন্ধ্যা প্রতিটি মুহূর্ত।

নিত্য গঙ্গাস্নানে অভ্যস্ত মানুষও কি হঠাৎ একদিন পা পিছলে পড়ে যেতে পারে না? আর খুব ভালো সাঁতাব জানিয়ে লোকও দৈবাৎ স্রোতেব টানে ভেসে যেতে পারে না? এমন দু' পাঁচটা বলি তো মা গঙ্গা নিয়েই থাকেন প্রতি বছবে।

পাটুলি আসার আগের দিনও, কিসেব একটা যোগ থাকায় গঙ্গাস্নানে এসে একগলা জলে দাঁড়িয়ে মনে মনে একটা ভয়ঙ্কব সংকল্প-মন্ত্র পাঠ কবেছিলেন শুভঙ্করী. কিন্তু সে মন্ত্রে আহুতি দিতে পারেন নি।

জল থে ক মাথা তুলে তাকিয়েছিলেন দীর্ঘ দিনের সুখ-দুঃখের স্মৃতি বিজড়িত রায়চৌধুবীদের সেই বিশাল প্রাসাদটার দিকে। যাকে দেখলে গঙ্গা গর্ভ থেকে উঠেছে বলেই মনে হয়।

কেঁপে উঠেছিলেন শুভঙ্করী।

যেন ওই প্রাসাদেব অস্থিপঞ্জরের মধ্যে থেকে কারা সব অদৃশ্য তর্জনী তুলে শাসন করে উঠেছিল শুভঙ্কবীকে।....কারা ওরা? রায়চৌধুরী বংশের পূর্বপুরুষদের আতঙ্কিত আত্মারা? এই অফুরন্ত গঙ্গার সন্নিকটে অবস্থান করেও যাঁরা এক গণ্ডূষ জল বিলোপের আশঙ্কায় তৃষিত নেত্রে তাকিয়ে আছেন শেষ উত্তবপুরুষের দিকে।

হঠাৎ একবার মনের জোব করে চিন্তা কবতে চেষ্টা করেছিলেন শুভঙ্করী, এ সংস্কার তো শুধু হিন্দুদেরই। অন্য সব জাতেরা কী এ সব করে? সাহেবরা কি পূর্বপুরুষদের জলপিণ্ড দেয়? তাদের কি আত্মা নেই? কই সে আত্মাদের তো পিপাসিত হতে শোনা যায় না।

মনের জোর করে আর একবার মাথাটা জলের তলায় নামিয়ে নিলেন, হলো না। ভেসে উঠতে হলো। সাঁতার জানা থাকলে ডোবা যায় না বলে নয়। হলো না ভয়ঙ্কর একটা পাপের ভয়ে।

নইলে সেদিন তো একটা স্নানপুণ্যের যোগ ছিল।

ঘাটে সেদিন লোকে লোকারণ্য, যে যার পুণ্য সঞ্চয়ে ব্যস্ত, কে লক্ষ্য করতো কোন একটা মাথা ডুবলো আর উঠলো না। শুভঙ্করীর জীবনের এই বিপর্যয়ের কথা তখনও কেউ জানতো না, পরেও কেউ জানতে পারতো না।....

তবু মাথাটা উঠলো।

যথানির্দিষ্ট দিনে যথাকর্তব্য পালনও করলো। 'শুভযাত্রা' করে পিত্রালয় যাত্রা করলো।

এখানে অবশ্য অনেকটা সহজ।

লোকলজ্জা অমন প্রবল হয়ে দেখা দিচ্ছে না, যদিও গ্রাম ভেঙে মহিলারাও আসছেন জয়গোবিন্দর বাড়িতে একটা দ্রষ্টব্য দেখতে।

তবু তার মধ্যেই কেউ নেমন্তন্ন করে যাচ্ছেন, কেউ কেউ বা আচার আমসত্ত্ব ঝাল নুন টকের সম্ভার বহে বহে আনছেন। এবং সমস্বরে বিধাতাপুরুষের আক্কেলের সমালোচনা এবং শুভঙ্করীর দুর্মতির সমালোচনা করছেন।

তাহলেও এসব প্রায় নতুন মুখ।

এদের কাছে মুখ দেখানোর প্রশ্নটা তেমন তীব্র নয়।....

এই অন্তরালে বসে শুভঙ্করী একটি একটি করে দিনের পাতা উল্টে চলেছেন একটি তীক্ষ্ণ বেদনাময় সুখের দিনের অপেক্ষায়।...তারপর? মা গঙ্গা তো রইলেনই, আর তাঁর প্রবহমান ধারা কিছু আর চাঁপদানীর রায়চৌধুরীদের ঘাটের ধারেই সীমাবদ্ধ নয়।

কিন্তু এই নাটকের মূল নায়ক সোমনাথ রায়চৌধুরী।

তিনি কোথায়?

তিনি কি পলাতক আসামীর ভূমিকায় অকারণ তাঁর কলকাতার ছোট বাসায় বসে আছেন?

তা নইলে কই, কোথায় তাঁর কাজ-কর্মের নমুনা? যার জন্যে যখন তখন কলকাতায় চলে আসতে হয় তাঁকে।

নাঃ, এবারে আর কোন জনসমাবেশে দেখা যায়নি সোমনাথকে। ছোট্ট এই বাসাবাড়ির মধ্যেই আবদ্ধ থেকে অহরহ চিন্তার সাগরে ডুবে আছেন তিনি।

'অমোঘ নিয়তি' বলে যতই নিজেকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করুন, বিরাট একটা পাপবোধ এই চির সংহত আত্মস্থ মানুষটাকে যেন অস্থির করে তুলছে। যেন আকাশ বাতাস, ঘরের প্রতিটি ইট কাঠ তাঁকে ধিক্কার দিয়ে বলে উঠছে, মিথ্যাবাদী মিথ্যাবাদী। ঠক প্রতারক নির্লজ্জ। এখন মুখ দেখাবি কী করে? মরে প্রমাণ করবি, তুই সত্যবাদী?

একটা বেলার পর একটা বেলা আসছে, চলে যাচ্ছে, সোমনাথ চাঁপদানীতে ফিরে যাবার প্রেরণা পাচ্ছেন না।' অথচ যেদিন এসেছেন, নবদুর্গাকে আনবার ব্যবস্থা করে দিয়ে এসেছেন।

শুভঙ্করী নেই, সোমনাথ নেই, নিশ্চয়ই খুব একটা অসহায়তা বোধ করছে সে। তবু হয়তো এখনো সোমনাথ নামক 'সম্ভ্রান্ত' মানুষটার ভয়ঙ্কর প্রতারণার খবরটা টের পায়নি।

কিন্তু টের তো পাবে।

তখন সেই দীর্ঘ পল্লবাচ্ছাদিত বড় বড় চোখ দুটোয় কোন ধিক্কারের ভাষা ফুটে উঠবে?

অবশেষে মনস্থির করে ফেলে যখন যাবার তোড়জোড় করছেন সোমনাথ, তখন নায়েবমশাই প্রেরিত একটা লোক বহন করে নিয়ে আসে অভাবিত এক দুঃসংবাদ!

ছাদের আলশের ধারে দাঁড়িয়ে গঙ্গার শোভা দেখতে দেখতে অকস্মাৎ অসতর্কে ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে মুমূর্ষু অবস্থায় রয়েছে নবদুর্গা। এখন যদি সোমনাথ তাড়াতাড়ি কলকাতা থেকে সাহেব ডাক্তার নিয়ে যান—

অসতর্কে ছাদ থেকে?

সেই দেড় হাত চওড়া কার্নিশ ডিঙিয়ে অসতর্কে?

ওকি বাংলা ভাষাতেই কথা বলছে?

সোমনাথ যেন সহসা ওর ভাষাটা বুঝে উঠতে পারেন না। স্বভাব বহির্ভূত চিৎকারে ধমক দিয়ে ওঠেন, 'কী বলছ, পরিষ্কার করে বল না।'

কিন্তু পরিষ্কার করেই তো বলেছে সে।

এরপর স্তব্ধ হবার পালা সোমনাথের। শুধু মাথার মধ্যে কে যেন হাতুড়ি পিটিয়ে পিটিয়ে বলে চলে, সোমনাথ, তুমি শুধু মিথ্যাচারী প্রতারকই নও, তুমি খুনী। তুমি খুনী। তুমি যদি কাপুরুষের মত পালিয়ে এসে এখানে বসে না থাকতে, যদি সেই অবোধ সরল বিশ্বস্ত হৃদয়টার আকস্মিক আঘাতের যন্ত্রণার ক্ষতে স্নেহ সহানুভূতির প্রলেপ দিতে পারতে, এমনটা ঘটতে পারতো কী?

চরণ কবিরাজ নাকে নস্যি ঠুসে বলেন, 'আপনার কলকাতার সাহেব ডাক্তার এই গাঁইয়া চরণ কোবরেজের থেকে নতুন আর কী বললো নায়েবমশাই? আমিও ওই একই কথাই বলেছিলাম পড়ে গিয়ে মাথা কেটে রক্তপাত হলে বরং বাঁচবার কোনো আশা থাকতো। কিন্তু এ তো তা নয়, আঘাত লেগে ভিতরে রক্তক্ষরণ হয়েছে। দেখুন আপনাদের দামী চিকিৎসক কী করতে পারেন। তবে আমার অভিজ্ঞতায় বুঝছি ওইভাবে অসাড় অচৈতন্য মৃতকল্প অবস্থায় থাকতে থাকতেই এক সময় নাড়ির গতি থেমে যাবে।

তা চরণ কবিরাজের অহঙ্কারটা বিচিত্র নয়। সাহেব ডাক্তারও ওর বেশী কিছু আশ্বাস দিতে পারেনি। অবশ্য তার অধীত বিদ্যায় যতটা চেষ্টা করবার তা করছে, বৈঠকখানা বাড়িতে জামাই আদরে অবস্থান করতে করতে।

সমগ্র চাঁপদানীতে এই অভাবিত প্রসঙ্গ ছাড়া আর কোনো প্রসঙ্গ নেই। অসতর্কতা? না স্বেচ্ছাকৃত?

শুভঙ্করী?

তিনি কি এখনো পিতৃগৃহে বিশ্রাম সুখ খাচ্ছেন? নাঃ, তা হতে পারে না। সোমনাথ এসে দাঁড়াতেই প্রশ্ন করছিলেন, 'বড়বৌকে আনতে পাঠানো হয়েছে?'

শুনে সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করেছিল।

এটা তাদের কর্তব্যের অন্তর্গত ছিল না কি? কই, সে খেয়াল তো হয়নি।

অপ্রস্তুত হয়েছিলেন নায়েবমশাই। দ্রুত আনাবার ব্যবস্থা করলেন।

যেন শুভঙ্করী এসে পড়লেই এই ভয়ঙ্কর অবস্থাটার চেহারা বদলে যাবে। যেন সব ঠিক হয়ে যাবে। বাইরের সমাজে সোমনাথ রায়চৌধুরী একটা বিশেষ নাম, কিন্তু বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে অসহায় সোমনাথের ভরসা কে?..

শুভঙ্করীর সামনে অবশ্যই পরম অপরাধীর মূর্তিতেই দাঁড়াতে হবে সোমনাথকে। এ প্রশ্নের জবাব দিতে হবে, 'তুমি কোথায় ছিলে? তুমি কেন ছিলে না? কী দরকারি কাজ করছিলে তুমি কলকাতায় বসে?'

তবু সেই বিচারককেই চোখের সামনে না দেখতে পেয়ে চোখে অন্ধকার দেখছেন সোমনাথ। প্রতিটি মুহূর্ত প্রতীক্ষার মুহূর্ত হয়ে দেখা দিচ্ছে।

নবদুর্গার নিথর নিস্পন্দ দেহটাকে একতলারই একটা ঘরে সরু পালঙ্কের উপর শুইয়ে রাখা হয়েছে।

ভাবলেশশূন্য মুখ।

যেন পৃথিবীর এক অবিশ্বাস্য বিশ্বাসঘাতকতায় পাথর হয়ে গেছে।

ওই পাথরের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে থাকতে পাচ্ছেন না সোমনাথ। পায়চারি করছেন, ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে।

একবার একবার পিছন দালানের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গঙ্গার ধারের সিঁড়ির চাতালে এসে দাঁড়াচ্ছেন। আর ওই কূলপ্লাবিনী গঙ্গার স্রোতের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ হঠাৎ অবাক্ হয়ে ভাবছেন জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে গিয়ে মৃত্যুকেই যদি বেছে নিতে বসেছিল নবদুর্গা, তো এই সর্বসন্তাপহারিণীর কোলে আশ্রয় না নিয়ে অমন অদ্ভুত বিকৃত পন্থা বেছে নিতে গেল কেন?

তবে কি সত্যিই অসতর্কতা?

চোখ তুলে ছাদের আলশে আর চওড়া কার্নিশের দিকে তাকিয়ে দেখে মাথা নীচু করেছেন। হয় না। এ চেষ্টা ছাড়া হতে পারে না।

তার মানে সারা সংসার আর গ্রামসুদ্ধ সকলের চোখে মুখে যে সন্দেহ ঘনীভূত, সেটাই সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হবে।

আবার চলে আসেন। সেই নিথর দেহ আর ভাবশূন্য মুখের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলেন, 'নবদুর্গা, তোমায় আমি বোধহীন অনুভূতিহীন শিশুতুল্য সরল ভাবতাম! তুমি আমার সেই ভুল ভাবনার এমন তীব্র তীক্ষ্ণ জবাব দেবে তা তো কোনোদিন বুঝতে দাওনি।.

এখন তোমাকে আমার চেয়ে অনেক বড় মনে হচ্ছে। অনেক পরিণত। তুমি যেন আমায় দুয়ো দিয়ে জিতে চলে গেলে। কিন্তু একবারের জন্যে তোমার চৈতন্যের জগতে ফিরে না এলে তো চলবে না। একবার আমাকে ক্ষমা চাইবার অবসব দাও।'

ঈশ্বরকে ডাকতে গেলেই গৃহদেবতা বীরেশ্বর শিবকে মনে পড়ে যায়। আশৈশবের অথবা পুর্বপুরুষের রক্তধারায় সঞ্চিত সংস্কাবে 'বীরেশ্বর'ই ঈশ্বরের প্রত্যক্ষমূর্তি। কিন্তু স্মরণই করেছেন সোমনাথ চিরকাল, পূজো করেছেন, প্রার্থনা জানাননি কখনো। অভীষ্ট পূরণের জন্য প্রার্থনা। আজ সোমনাথ তাও করছেন। বলছেন, বীরেশ্বর, চিরকাল ঈশ্বরের উপলব্ধি তোমার মধ্য দিয়েই, সেই তোমার কাছে আজ নতজানু হয়ে প্রার্থনা করছি, একবারের জন্যে ওর জ্ঞান ফিরিয়ে দাও। ওর কাছে আমায় স্বীকারোক্তি করতে দাও।'

এই গভীর সংহত প্রার্থনার পরই আবার ছুটে আসছেন কবরেজ মশাইয়ের কাছে। গলা গম্ভীর হলেও বক্তব্যে অধীরতা, 'কবিরাজ মশাই কোনো পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছেন ?'

মুমূর্ষুর প্রতি সর্বদা লক্ষ্য রাখার সুবিধার জন্য চরণ এইখানেই অবস্থান করছেন, সোমনাথের এই অধীর প্রশ্নে বিস্মিত হচ্ছেন। এ অধীরতা সোমনাথের চিরদিনের স্বভাবের সঙ্গে খাপ খায় না।

তবু তো কবিরাজ টের পাচ্ছেন না। বৈঠকখানা বাড়িতে সাহেব

ডাক্তারের কাছে গিয়েও ব্যাকুলতা প্রকাশ করছেন সোমনাথ, 'এক বারের জন্যে জ্ঞান ফিরিয়ে আনা যায় না ডাক্তার? মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য?'

বিদেশীর কাছে বুঝি চক্ষুলজ্জা কম, তাই সে ব্যাকুলতার মধ্যে আবেগের তীব্রতা।

'মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য?'

ডাক্তারের নীলচে চোখে গভীর দৃষ্টির গাঢ় ছায়া, 'মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য? কী চাও তুমি বাবু? শেষ সময় কোন ক্ষমা প্রার্থনা করতে চাও?'

'ডাক্তার! তোমার অনুমান ঠিক। ভয়ানক দরকার আমার—'

'তোমার দরকারের হিসেবে ঈশ্বর চলবেন না বাবু। ঈশ্বর তোমার জমিদারীর প্রজা নয়।'

'কিন্তু আমরা তো তাঁর প্রজা ডাক্তার, আমাদের কাতর প্রার্থনায় কান দেবেন না?'

'উচিত মনে করলে দেন। আমরা ডাক্তাররাও প্রতিটি কেসে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাই। যেন চেষ্টা সফল হয়। একটা কথা বলতে চাই বাবু। আমার ধারণা তোমার স্ত্রীর এটা আকস্মিক দুর্ঘটনা নয়, আত্মহত্যা।'

'ডাক্তার!'

নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ সোমনাথ বিধর্মী ম্লেচ্ছের দুগ্ধশুভ্র ভারী হাতের থাবাটায় আবেগকম্পিত হাত রাখেন, 'তোমার ধারণাটা সঠিক কিনা, শুধু সেইটুকু জানবার জন্যেও তোমার মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য ওর জ্ঞান ফিরিয়ে দিতে হবে। তোমার অধীত সমস্ত বিদ্যা প্রয়োগ করে, প্রাণপণ চেষ্টায়।'

খবরটা শুনেই সেই যে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন শুভঙ্করী, এই দীর্ঘ পথ সেই ভাবেই এসেছেন। গাড়ির চালককে তাড়া লাগাননি,

পথসঙ্গীকে একটি প্রশ্ন করেননি।....আনতে গিয়েছিল নায়েবমশাইয়ের ভাইপো, আর জগ খুড়ো।...তিনিই নাকি ওই 'ভয়ঙ্কর পতনে'র প্রত্যক্ষদর্শক। সেই প্রত্যক্ষ দর্শনের গৌরবে মহোৎসাহে বলতে শুরু করেছিলেন, 'আমি তখন ঠাকুরবাড়ি থেকে পেন্নাম সেরে সবে ওদিক থেকে ঘুরে আসছি। হঠাৎ ছাদ থেকে—ও, ভাবলে এখনো গায়ে কাঁটা দেয়। চোখের সামনে—'

শুভঙ্করীর হাত নেড়ে নিষেধ করেছিলেন।

অথচ শুভঙ্করীর এতাবৎকালের বিশাল সাম্রাজ্যের প্রজাবৃন্দ ও সকলে এই তিন দিন ধরে অবিরত কথা মক্স করে চলেছে, কী ভাবে নিজেকে কাঠগড়ার বাইরে রেখে ঘটনাটা বিবৃত করা যায়।

প্রত্যেকেরই তো ধারণা শুভঙ্করী এসেই জনে জনে সবাইকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাবেন। 'কোথায় ছিল সবাই....অন্ধ হয়ে বসেছিল কিনা, এবং কী ব্যবহার করা হয়েছিল ছোট গিন্নীর সঙ্গে' ইত্যাদি কূট প্রশ্নে।

মানদা খুড়ী দোষ চাপাচ্ছেন রিষড়ের ঠানদির ওপর, তিনি চাপাচ্ছেন লাবণ্যের ওপর।

এখন গলার স্বর চাপা, তাই আরো কেমন ফ্যাসফেসে, 'তুই হারামজাদিই তো বললি ওখানে কেউ ছেল না, আমি নাকি ছায়ায় ভূত দেখি।....নতুন বৌ পেট ব্যথা করছে বলে অঙ্গ ঢেলে শুয়ে আছে।....গতর নেড়ে যদি একবার ছুটে পেছু পেছু দেখতে যেতিস, তালে তো এই ভয়ানক দুর্ঘটনাটি ঘটতো না। এখন মহারানী এসে হাতে মাথা কাটুক সকলের। ভেতরে ভেতরে 'সতীন মলো আপদ গেল' ভাবলেও মুখে তো তড়পাবে। আর ওই যে ঘর শত্তুর বিভীষণ বামুন মেয়েটি আছেন, তিনি কি আর ছেড়ে কথা কইবেন? নিজে শুয়ো হতে আমাদের নামে সাতখানা করে লাগাবেন। যাক মরুক গে, বিদেয় করে দেয় তো নবদ্বীপে পড়ে থাকবো। ভিক্ষে করলেও একবেলা একমুঠো অন্ন জুটবে।'

শুভঙ্করীর সেই কলকল্লোলময়ী সম্রাজ্ঞী মূর্তিটাই মনে পড়ছে

সকলের, এ মূর্তি তাদের অপরিচিত। দীর্ঘ দু' আড়াই মাস কাল তাঁর ওপর দিয়ে শারীরিক এবং মানসিক যে বিপর্যয় চলছে, এরা তার হিসেব কষেনি। পিত্রালয় বাসের ইতিহাস তো প্রায় অনশনের ইতিহাস।

আগে কে এগিয়ে যাবে এই প্রতিযোগিতায় যারা দৌড়োদৌড়ি করছিল, তারা থমকে গেল। গাড়ি থেকে ধীর পায়ে নেমে এলেন যিনি তিনি কি শুভঙ্করী না তার ছায়ামূর্তি?

তিনি ছায়ামূর্তি সদৃশ কি না সেটা টের না পেলেও তাঁর চোখের সামনের এই চির পরিচিত যে ছায়া হয়ে গেছে, সেটা বোঝা যেতো তাঁর দু'চোখের দিকে তেমন করে তাকিয়ে দেখলে, কিন্তু কে তাকাবে সাহস করে?

সোমনাথই কি পারতেন?

কে জানে পারতেন কি না, কিন্তু শুভঙ্করীর ছায়ামূর্তি যখন মৃত্যু পথযাত্রিণীর ঘরের দরজার কাছে এসে ছায়া ফেললো, তখন সোমনাথ তিন দিন তিন রাত্রির পর হঠাৎ একটু খুলে যাওয়া দুটি চোখের দিকে তাকিয়ে ডেকে চলেছেন, 'নতুন বৌ, নতুন বৌ, একবার ভাল করে তাকাও, আমার একটা কথা শুনে যাও!...ক্ষমা চাই না, শুধু তোমার কাছে স্বীকার করতে চাই, আমি মিথ্যাবাদী, ঠক প্রতারক। আমি এ যাবৎ তোমায় একটা বানানো কথা বলে ঠকিয়ে এসেছি—'

সাহেব ডাক্তার জবাব দিয়ে চলে গেছে।

খাটের পাশে চরণ কবিরাজ জলচৌকিতে বসে আছেন নাড়ি ধরে, বলতে চেষ্টা করছেন, 'এ সময়ে এমন উতলা হয়ো না বাবা, নেভার আগের প্রদীপ— নাম শোনাও, তারকব্রহ্ম নাম শোনাও।'

কিন্তু সে চেষ্টা সফল হচ্ছে না।

শুভঙ্করী কাছে এসে দাঁড়িয়ে ধীর স্বরে বলেন, 'কবিরাজমশাই, আপনাদের সব বিদ্যে ফতুর?'

কবিরাজ হতাশ অসহায় দৃষ্টি তুলে তাকান।

শুভঙ্করী খাটের ধারে বসে পড়েন। ভাঙা গলায় প্রায় আর্তনাদের মত ডেকে ওঠেন, 'নবু! এতো নিষ্ঠুর তুই? এতো সর্বনেশে বুদ্ধি কোথায় লুকিয়ে রেখেছিলি এতোদিন?'

হঠাৎ যেন একটা বিদ্যুতের শিখা জ্বলে ওঠে। আধবোজা চোখ দুটো চমকে তাকায়।

'দিদি!'

'না না, দিদি বলে আর ডাকতে হবে না,' ধৈর্যচ্যুতা শুভঙ্করী বিধ্বস্ত গলায় বলে ওঠেন, 'মনে করতাম, আমায় বুঝি খুব ভালবাসিস! এতো বড় শাস্তিটা দিতে ইচ্ছে হলো আমায়? আমি যে হিসেব ঠিক করে রেখেছিলাম তোর ওপর সব বোঝা চাপিয়ে দিয়ে মা গঙ্গার কোলে—'

রোগিণীর মৃদু কণ্ঠ, অথবা কণ্ঠও নয়, ঠোঁট দুটো অস্ফুটে উচ্চারণ করে, 'মাপ—'

শুভঙ্করীকে ঘরে ঢুকতে দেখে সোমনাথ চুপ করে গিয়েছিলেন, হয়তো সেই আবেগমথিত ব্যাকুল কণ্ঠকে সামলে নিচ্ছিলেন, তখন শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে রোগিণীর কানের কাছে মুখ এনে বলেন, 'মাপ তুমিই করবে নতুন বৌ! তোমাকেই করতে হবে। শোনো, শুনে যাও— আমি তোমায় ঠকিয়েছিলাম। কাশীর জ্যোতিষীর গল্প মিথ্যা গল্প -'

মৃত্যুদূতের রথে উঠেও কি কারো মুখে হাসি ফুটতে দেখা যায়? বহুদর্শী চরণ কবিরাজ তাঁর দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতায় দেখেছেন কখনো? অথচ দেখলেন। দেখতে পেলেন। শুনতে পেলেন, 'জানি।'

নাটকটা তাঁর দুর্বোধ্য, কিন্তু সংলাপগুলো শুনতে পাচ্ছেন, ধরতে চেষ্টা করছেন, নাটকের অর্থ ধরতে পারছেন না। দেখলেন, রোগিণী কিছু বলতে চাইছে।

নিদানের বিধান মকরধ্বজের নুড়িটা খল থেকে তুলে জিভে ঠেকিয়ে দেবার চেষ্টা করলেন।

দীপশিখা শেষবারের মত দপ করে ওঠে। সেটা দেখেছেন কবিরাজ

তাঁর দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতায়।

তাই নুড়িটা নামিয়ে রেখে ইশারায় সোমনাথকে বলেন, 'শোনো, কী বলতে চায়—'

সোমনাথ নীচু হয়ে শুনতে চেষ্টা করেন।

কিন্তু কী আশ্চর্য! এ কোন্ কথা বলতে চাইছে নবদুর্গা? এ কোন্ জগতের কথা? অথচ স্পষ্ট শোনা গেল, 'গদির তলায়—'

'নবু, নবু, নতুন বৌ, কী বলছ? বলো বলো, গদির তলায় কী?'

কিন্তু নাঃ, আর কোনো পরিচিত জগতের ভাষা আদায় করা গেল না সেই বদ্ধ দুই ওষ্ঠাধর থেকে। যে অদৃশ্য দূত রথ নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল সে আর অপেক্ষা করতে রাজী হলো না।

তবু দুটো ব্যাকুল গলা উচ্চারণ করে চলে, 'নবু, নবদুর্গা, নতুন বৌ, গদির তলায় কী?'

কবিরাজ নিজের হাতে ধরা রোগিণীর মনিবন্ধটা হাত থেকে নামিয়ে রেখে গভীর পরিতাপের গলায় বলেন, 'থাক বাবা, এখন আর ও সব কথা কেন? হয়তো গহনা কি চাবি-টাবির কথা বলতে চাইছিলেন। ছেড়ে দাও। নাম শোনাও, আত্মা বহুদূর অবধি যেতে যেতে ফিরে তাকায় তারকব্রহ্ম নামের প্রত্যাশায়। নারায়ণ! নারায়ণ!'

চাঁপদানীর রায়চৌধুরী বাড়ির দোতলার সেই গঙ্গার কোল ঘেঁষা বারান্দার ধারের সেই ঘর তার চিরপরিচিত চেহারা নিয়ে বিদ্যমান, শুধু আজ আর সেদিনের সেই শীতের কনকনে হাওয়া নয়, বৈশাখের অপরাহ্নের উথাল পাথাল হাওয়া। সে হাওয়া যেন ঘরের জিনিসকে তোলপাড় করছে।

আর তোলপাড় করা বুক নিয়ে শুধু মাটিতে বসে আছেন শুভঙ্করী। শুভঙ্করীর হাতে একখানা কয়েক লাইন লেখা চোঁতা বালির কাগজ। এ লেখা নবদুর্গার।

নবদুর্গাকে লেখাপড়া শেখানোর জন্যে শুভঙ্করী বরাবরই চেষ্টা চালিয়ে এসেছেন, চেষ্টা চালিয়েছেন হাতের লেখা ভাল করাবার, তাই তার জন্যে আনিয়ে রাখতেন খাগের কলমের গোছা আর গোছা গোছা এই বালির কাগজ।

কিন্তু লাজুক নবদুর্গা লজ্জার জ্বালাতেই বেশী এগোতে পারেনি। যা করবে সে তো লোকের অসাক্ষাতে। ক্রমশঃ শুভঙ্করীও হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন, রোজ পড়া দেওয়া নেওয়ার চক্র থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন নবদুর্গাকে। এখন দেখা যাচ্চে শুভঙ্করীব চেষ্টার কিছু ফল ফলেছিল, তাই এই বালিব কাগজের গায়ে তার একমুঠো ফসল রেখে গেছে নবদুর্গা।

দেখে মনে হচ্ছে কাগজের লেখাটা বোধহয় পড়া হয়ে গেছে. হয়তো বার বারই হয়েছে। তবু শুভঙ্করী সেটা ভাঁজ করে ফেলেননি. হাতেই ধবে আছেন বিছিয়ে, যেমন খোলা বিছানো ছিল—ওই উঁচু পালঙ্কটার পুরু গদির তলায়।

পালঙ্কের নীচেব পাথরের চৌকিটাব উপর সোমনাথ বসে দু'হাতে মুখ ঢেকে।

বিকেলের আলো শুভঙ্করীর শীর্ণ পাণ্ডুর মুখে এসে পড়ায় যেন আরো শীর্ণ পাণ্ডুব দেখাচ্ছে, শুভঙ্করীর চিরদিনের পানে রাঙা টুকটুকে ঠোঁট বিবর্ণ ফ্যাকাশে। সেই ফ্যাকাশে ঠোঁট দুটো নড়ে ওঠে, তারপর তেমনি ফ্যাকাশে গলায় প্রশ্ন করেন শুভঙ্করী, 'আজ তোমায় একটা কথা জিজ্ঞেস করবো—কাশীর জ্যোতিষীর গল্পটা কি? কী প্রতারণা করেছিলে তুমি ওর সঙ্গে?'

সোমনাথ মাথা তুলে তাকাল।

চোখ দুটো লাল লাল। গত ক'দিন অনেক ঝক্কি গেছে শরীরটার উপর দিয়ে। আজ ছুটি। আজ সব স্তব্ধ।

সোমনাথ আস্তে বলেন, 'আমি মিথ্যা করে বানিয়ে বলেছিলাম

ওকে, কাশীব এক জ্যোতিষী আমায বলেছে, সন্তান জন্মালে, জন্মেব সঙ্গে সঙ্গেই আমাব মৃত্যু হবে।'

শুভঙ্কবী কেঁপে ওঠেন, চমকে ওঠেন, প্রায আর্তস্ববে বলে ওঠেন, 'মিথ্যে বানিয়ে? না সত্যি?'

'সত্যি নয রানীবৌ—' ক্লান্ত বিধ্বস্ত রুদ্ধ কণ্ঠ, 'বানিযে বলেছিলাম। কোনো জ্যোতিষীব সঙ্গে কোনো দিনই আমাব—'

শুভঙ্কবী বিদীর্ণ গলায বলেন, 'কেন? কেন বলছিলে এমন অদ্ভুত কথা?'

সোমনাথ যেন অসহায দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখেন তাব বানীবৌয়েব দিকে। তাবপব বলেন, 'কেন, বুঝতে পাবছো না?'

আস্তে মাথা নাড়েন শুভঙ্কবী।

বুঝতে পাবছেন না, সত্যিই বুঝতে পাবছেন না। এবকম একটা অর্থহীন অবিশ্বাস্য কথা কি বোঝা যায়?

সোমনাথ আবাব হাত দুটো রুক্ষ এলোমেলো চুলেব মধ্যে ঢুকিয়ে মাথাটা চেপে বলেন, 'আমি ওকে কোনোদিনই গ্রহণ কবতে পাবিনি বানীবৌ' অথচ অবহেলাব দুঃখ দিতে মাযা হযেছে। তাই ওকে সান্ত্বনা দিতে একটা গল্প বচনা কবে—'

শুভঙ্কবী ছিটকে উঠে দাঁড়ান।

আর্তনাদেব মত বলে ওঠেন, 'কোনোদিন ওকে গ্রহণ কবোনি? কী ভয়ানক কথা বলছো তুমি? কী নিদারুণ কথা!'

সোমনাথেব কাছ থেকে কোনো সাড়া আসে না।

শুভঙ্কবী আবাব বসে পড়ে কেঁদে ফেলেন, 'কী নিষ্ঠুব তুমি গো? আব আব তুমি কি বক্ত মাংসেব মানুষ নও? পাথবেব ঠাকুব?'

সোমনাথ মুখ তুলে অদ্ভুত একটু হেসে বলেন, 'এখন তাই মনে হচ্ছে বটে।'

'কিন্তু কেন এমন কাজ কবেছিলে গো?'

শুভঙ্কবী সোমনাথেব খুব কাছেই বসে, সোমনাথ একটা হাত

বাড়িয়ে ওঁর পিঠের ওপর রেখে আরো আস্তে বলেন, 'করেছিলাম—পাছে তোমার অহঙ্কার খর্ব হয়ে যায়, তুমি তোমার জীবনখানা নিয়ে যে পাশার পণ ধরেছিলে, পাছে তাতে হেরে যাও, তাই—'

'শুধু এই জন্যে ? শুধু এই জন্যে এতোবড় অধর্মটা করেছ তুমি ? একটা প্রাণ—'

সোমনাথ ক্লান্ত গলায় বলেন, 'আমার জীবনটাই অভিশপ্ত রানীবৌ। ঠিক করে বলতে পারো এর উলটো হলে অন্য একটা প্রাণ হারিয়ে ফেলতাম কিনা ?'

কেঁপে ওঠেন শুভঙ্করী। প্রতিবাদ করতে পারেন না।

চিরকালের দুরন্ত অভিমানিনী ! যে অভিমানের বহিপ্রর্কাশ ছিল না। শুধু যে ব্যক্তি ধরতে পারে সেই একমাত্র পারে ! সবাই জানতো শুভঙ্করীর মান অভিমানের বালাই নেই।

এখন আর শুভঙ্করীর কণ্ঠে অভিযোগের সুর ফোটো না। বিষণ্ণ গলায় বলেন, 'তোমার মনে পড়ে ছেলেবেলায় তুমি আমায় ক্ষ্যাপাতে, শুভঙ্করী না ভয়ঙ্করী বলে। খুব ঠিক কথা বলতে।'

সোমনাথের গভীর গম্ভীর কণ্ঠ থেকে একটি স্নেহকোমল শব্দ উচ্চারিত হয়, 'ছিঃ।'

অনেকক্ষণ দু'জনেই নীরব।

শুধু জাহ্নবীর গুঞ্জন-ধ্বনির অবিশ্রান্ত সুর যেন শত কালের কত শত নিরুদ্ধ কথা বয়ে চলেছে।

অনেকক্ষণ পরে শুভঙ্করী হাত বাড়িয়ে কাগজখানা এগিয়ে ধরে বলেন, 'তোমার কাছে রাখো। মনে রেখো, শুধু তুলে রেখে দেবার জন্যে নয়। একথা তার বুকের রক্ত দিয়ে লেখা।'

সোমনাথ কাগজটা নেন। আর একবার চোখের সামনে ধরেন। বালির কাগজের উপর খাগের কলমে অপটু হাতের লেখা, তবু অক্ষরগুলি বড় বড় গোটা গোটা পরিষ্কার। অবশ্য বানান ভুলের সীমা নেই, যতি চিহ্নের বালাই নেই তবু বক্তব্য বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না।

শুদ্ধ করলে এই দাঁড়ায়—

শতকোটি প্রণামান্তে—

পরে জানাই, আপনি তো মস্ত জ্ঞানী গুণী পণ্ডিত, আপনি ইচ্ছা করিলে সব করিতে পারেন। তাই বলি, আপনি দেশের সমাজে এই ব্যবস্থা করুন, যাহাতে এমন নিয়ম প্রচার হয়—স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় পুরুষ লোকও মাত্র একবার বিবাহ করিতে পারিবেক। তাহাতে স্ত্রীলোক পুরুষলোক উভয়েরই দুঃখ দূর হইবেক। উভয়েই ভগবানের সন্তান। তবে এমন বিপরীত ব্যবস্থায় কাজ কী? অধিক কি লিখিব, নিজগুণে সব কথা বুঝিয়া লইবেন।

আপনি অনেক দয়ালু, তাই এতো কথা বলিতে ভরসা পাইলাম। দোষ ঘটিলে মাপ করিবেন। ইতি

চরণাশ্রিতা দাসী

নবদুর্গা।

কাগজখানা হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন সোমনাথ, তারপর একটি গভীর নিঃশ্বাস ফেলে সেটি ভাঁজ করে হাতের মুঠোয় রেখে একটু ক্ষুব্ধ হাসি হেসে বললেন, 'আইন প্রণয়নের ভার যদি সোমনাথ রায়চৌধুরীর হাতে থাকতো রানীবৌ, তো সে তার জীবনের প্রারম্ভেই এই আইনটা প্রণয়ন করে পাস করিয়ে রাখতো।'

এই ক্ষুব্ধ হাসির মধ্যে যে সোমনাথ রায়চৌধুরীর আযৌবনের যন্ত্রণার ইতিহাস বিধৃত, সেটা চোখ এড়ায় না শুভঙ্করীর। তবু তিনি দৃঢ় স্বরে বলেন, 'এক কালের ভুল পরের কাল শোধরায়। একদিনে হবে না, অনেক দিনে হবে।'

সোমনাথ বলেন, 'সমাজের মজ্জায় মজ্জায় এই লজ্জাস্কর প্রথার শিকড়।'

শুভঙ্করী বলেন, 'তবু চেষ্টা তো করবে। করতেই হবে যে।'

তা চেষ্টা করেছিল বৈকি সোমনাথ। তাঁর বাকী জীবনটা তো শুধু

ওই কাজেই ব্যয় করেছেন। ব্যয় করেছেন পিতৃপুরুষের সঞ্চিত সমস্ত অর্থ। দেশের নারীমুক্তি আন্দোলনের যথার্থ ইতিহাস যদি কোনদিন লেখা হয়, তো সে ইতিহাসে 'অবলাবান্ধব সমিতি'র প্রতিষ্ঠাতা সোমনাথ রায়চৌধুরীর নাম খোদাই হয়ে না থাকলে অসম্পূর্ণ হবে সে ইতিহাস।

সোমনাথ রায়চৌধুরীর জীবনের ধ্যান জ্ঞান ধ্রুব লক্ষ্যই ছিল পুরুষের বহুবিবাহ বন্ধ ও মাত্র 'এক বিবাহের অধিকার আইন বিল' আন্দোলন।

কিন্তু সে আইন কি এক যুগে হয়েছে? সেই ধ্রুব লক্ষ্যের লক্ষ্যে পৌঁছুতে কত দিন লেগেছে দেশের? কত মাস বছর কতগুলো যুগ? কত কত দিন বালবিধবার দলের আশেপাশে ভিড় করে থেকেছে পতি-পরিত্যক্তারা। সহায় সম্বলহীন সংসারের গলগ্রহ পরগাছা! অথচ কত তুচ্ছ তুচ্ছ কারণে সেই পরিত্যাগ। কারণ অপর পক্ষে পরিত্যাজ্য হলে নতুন গ্রহণের সুবিধার দ্বার অবারিত। বহুদিনে অবশেষে সমাজ স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে, মেয়েলোক পুরুষলোক উভয়েই একই ঈশ্বরের সৃষ্ট জীব।

মনে মনে প্রাণে স্বীকার করেছে কি না কে জানে! হয়তো শুধু পৃথিবীকে দেখাবার জন্যে 'প্রগতির' ছাপ আঁকা একটা রঙিন জামা গায়ে দিয়ে বেড়াচ্ছে সে, আর তার অন্তরালে অগণিত নিরুপায় দীর্ঘশ্বাস বাতাসকে ভারাক্রান্ত করে চলেছে।

তবু সমাজ অনড় হয়ে বসেও থাকে না।

কারণ মাঝে মাঝেই যে সেখানে আবির্ভাব ঘটে সোমনাথ রায়-চৌধুরীদের, যারা বালির কাগজের গায়ে খাগের কলমে লেখা আবেদন পত্রগুলির দিকে তাকিয়ে দেখে মমতার চোখে, আত্মধিক্কারের চোখে। আর চেষ্টা করে চলে।

———